দীনেশচন্দ্র সেন



বঙ্গভাষা ও সাহিত্য



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

প্রথম খণ্ড

[দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ]

দীনেশচন্দ্র সেন

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
—নিধুবাবু

সম্পাদনা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BANGABHASA O SAHITYA (PRATHAM KHANDA)
Dineshchandra Sen
Edited by
Asitkumar Bandyopadhyay

প্রকাশ কাল—আগষ্ট, ১৯৮৬ (নবম সংস্করণ)
(পর্ষদ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ)

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
অমিয় ভট্টাচার্য

মূল্য : বত্রিশ টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychoudhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resources Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ পত্র

অশেষ-গুণসম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংস প্রজারঞ্জক
স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্ম্মণ বাহাদুরের

কর-কমলে—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ
এই সামান্য পুস্তক
উৎসর্গ
করিলাম

গ্রন্থকার

নবম সংস্করণের ভূমিকা

দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর নবম সংস্করণ সম্পাদনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না। তাঁহারা ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের মাদকরসে বুঁদ হইয়া শ্বেতদ্বীপবাসিনী শ্বেতভুজা ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। ভারত-ভারতী বা বঙ্গ-ভারতীর প্রতি তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ ছিল না—অজ্ঞতাই তাহার প্রধান কারণ। বোধ হয় তাহার সঙ্গে কিছুটা হীনমন্যতাও মিশিয়া গিয়াছিল। অনুমান ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধান বিলাসে'[১] সর্বপ্রথম পুরাতন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণী ও তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হালহেডের *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পুরাতন বাংলা কাব্য হইতে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। অবশ্য পুস্তকটি 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' বলিয়া তাহাতে বাঙালিদের কোন উপকার হয় নাই। ১৮০২ সালে উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুর মিশন হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে লিখনপঠনক্ষম বাঙালি-সমাজে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু কাব্যকবিতা ধীরে ধীরে পরিচিত হইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতায় দেশীয়দের ছাপাখানা স্থাপিত হইল, এবং ১৮১৫ সালের পর পুরাতন বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু (যথা—অন্নদামঙ্গল, চৈতন্যজীবনী কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী) গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল।

১৮১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণে' বলা হইয়াছে যে, ১৮১০-১৮১৯ সাল, অর্থাৎ দেশীয়দের বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার পর হইতে নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রায় দশ হাজার

---

১. 'করুণানিধান বিলাসে' উল্লিখিত নির্দেশ অনুসারে মনে হয়, ইহা বাংলা ১২২০-২১ সনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। লঙ্‌ সাহেবের *Return* অনুসারে ইহা ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] অবশ্য বলাই বাহুল্য ইহা সমগ্র পুস্তকের মুদ্রিত সংখ্যা। 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি প্রথম পর্বের বাংলা সাময়িকপত্রে নূতন পুস্তক প্রকাশের যে বিজ্ঞপ্তি থাকিত, তাহাতে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যকবিতার বেশ কিছু নমুনা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে রামমোহন সমাজ, ধর্ম ও আচারবিচার লইয়া পুস্তিকা রচনা আরম্ভ করিলে ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের ধুম পড়িয়া গেল। কিন্তু তখনও কেহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই।

হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র এবং এ-দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি ভাষার প্রথম সফল লেখক ও কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ রেভাঃ লঙ সাহেব সম্পাদিত ১৮৩০ সালের (জানুয়ারি ২) *Literary Gazette*-এ 'On Bengali Works and Writers' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের পাণ্ডববিজয়, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল,[৩] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল[৪] ও বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ করিয়া শেষোক্ত কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ছত্রের ইংরেজি অনুবাদও সংযোজিত করেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাল ধরিয়া আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে নবপ্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ ও সমালোচনা বাহির হইত। সেই তালিকায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য থাকিত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম তাঁহার মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ কবিওয়ালা, পাঁচালীকার, আখড়াই গান, টপ্‌পা গান, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধ ও উক্ত কবি-গায়কদের গানের নমুনাও মুদ্রিত করেন। বাংলা ১২৬০ সালের আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৬১ সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত দুই-এক মাস অন্তর রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ এবং তাঁহাদের রচনার উদ্ধৃতি ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের কবিওয়ালা পর্বের ইতিহাস আলোচনার

২. ১৮৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উল্লিখিত হইয়াছিল, ১৮১৪ সালের পর হইতে কলিকাতায় বাংলা পুস্তক অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইতে থাকে।

৩. কাশীপ্রসাদ ভুল করিয়া মুকুন্দরামকে গোবিন্দানন্দ বলিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য—সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০

৪. কাশীপ্রসাদ ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলিয়াছিলেন।

পূর্বসূচনা করেন। তাহার কিছু পরে ১৮৫৫ সালে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের ক্ষুদ্র জীবনী ('কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত') প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রথম কবিচরিত রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁহার পরে প্রকাশিত হয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২)। তখনও বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) প্রকাশিত হয় নাই। রঙ্গলাল বীঠন সোসাইটিতে পুরাতন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন তাহা হইতে সেকালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যাইবে।[৫]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (প্রথম খণ্ড) ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় সর্বপ্রথম কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক কালের মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বর গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। হরিমোহন প্রসঙ্গক্রমে সনাতন গোস্বামী, জীবগোস্বামী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রায়শেখর, গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি নিধুবাবু, রঘুনাথ গোস্বামী, দাশু রায়, গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান, রামমোহন ও অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখ করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তিনি মধুসূদন, রঙ্গলাল প্রভৃতি তাঁহার সমকালীন কবিদের পরিচয় দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। ইহা প্রকাশিত হইলে রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পূর্বেই এই পর্বের ধারাবাহিক কাহিনী জানা যাইত। হরিমোহনের পরে ১৮৭১ সালে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। যদিও এটির আকার অতি ক্ষুদ্র, তবু ইহাতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, হিন্দীর সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জীবগোস্বামী, নরহরিদাস, বৃন্দাবনদাস, শেখর রায়, সনাতন গোস্বামী, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, রামপ্রসাদ,

৫. কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় হরচন্দ্র দত্ত বীঠন সোসাইটিতে ***Bengali Poetry*** শীর্ষক এক বক্তৃতায় পুরাতন বাংলা কাব্যের তীব্র নিন্দা করেন (১ এপ্রিল, ১৮৫২)। কৈলাসচন্দ্র বসুও তাঁহাকে সমর্থন করিয়া অশ্লীলতার অপরাধে ভারতচন্দ্রকে আক্রমণ করেন এবং ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অতিনিকৃষ্টতা ঘোষণা করেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া রঙ্গলাল সোসাইটির আর-এক অধিবেশনে (১৩ মে, ১৮৫২) 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধে' ভারতচন্দ্রকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তাহাই 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয় (১৮৫২)।

ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কবিওয়ালা (রামবসু, হরু ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী) সম্বন্ধে সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া তাহার পর আধুনিক কাল (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) আলোচনা করিতে গিয়া মহেন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্ত, উইলিয়ম কেরী ও শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ, রামমোহন ও তত্ত্ববোধিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশেষে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের পরিচয় দিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকটিকে প্রায় তাঁহার সমকালীন করিয়া তুলিয়াছেন। উপাদান হিসাবে তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', *Calcutta Review, West Minister Review* প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ ও পুস্তক সমালোচনা হইতেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পুস্তিকাটি আকারে ক্ষুদ্র, ইহাতে ঐতিহাসিক কালক্রম, পৌর্বাপর্য ও অন্যান্য তথ্য নিশ্ছিদ্র না হইলেও এবং সাহিত্য-বিচারঘটিত মতামত নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের হইলেও, এই পুস্তিকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙালি লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের যুবকগণ সম্ভবতঃ ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকিবেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরেজি প্রবন্ধের ('Bengali Literature') উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত প্রবন্ধ ১৮৭১ সালের *Calcutta Review*-এ প্রকাশিত হয়।[৬] প্রবন্ধটি নাতিদীর্ঘ হইলেও উল্লেখযোগ্য।

৬. ১৮৭১ সালের *The Calcutta Review* (*No. 104*)-এ বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ একখানি পুস্তকের (১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত') এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত মাসিকপত্রের ('মিত্রপ্রকাশ' ১৮৭০) সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত হয়। প্রথমে উক্ত প্রবন্ধে লেখকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছিল না। তিনি এই প্রবন্ধে নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় নিজ নাম প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশ্য অনেক সময়ে রিভ্যুর অনেক সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হইত না। পরে প্রকাশিত *Selections from the The Calcutta Review*-এ উক্ত প্রবন্ধের লেখকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ প্রবন্ধটি উক্ত সঙ্কলনে মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের অনুমান, যে-কারণে *The Calcutta Review*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হয় নাই, সেই একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি উক্ত সঙ্কলনে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই।

ইংরেজিতে রচিত এই প্রবন্ধ ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের (উনবিংশ শতাব্দী) বাংলা সাহিত্য বিদ্বজ্জনসমাজে যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিল। তাহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হইলে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থটি প্রথম ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিল। বোধ হয় পুঁথিভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইহাই প্রথম উদ্যম। ন্যায়রত্ন সম্ভবতঃ তাঁহার শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উপাদান সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পুত্র গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকখানি প্রণয়ন সম্পর্কে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থ-ব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" পুরাতন 'স্কুলের' লেখক ও পুরাতন শিক্ষা ও মানসিকতায় ললিত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন আশ্চর্য কুশলতা ও উদারতার সঙ্গে মধ্যযুগ ও তাঁহার সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ইতিহাসকারের গৌরব লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং আদিযুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস ও শিল্পকলার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই ইতিহাস তিনটি উপচ্ছেদে বিভক্ত : (ক) আদ্যকাল অর্থাৎ প্রাক্‌চৈতন্য পর্ব। এই অংশে প্রধানতঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের পরিচয় ও তাঁহাদের কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ আছে। (খ) মধ্যকাল অর্থাৎ চৈতন্যযুগ হইতে প্রাগ্‌ভারতচন্দ্রের কাল। এই অংশে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী, শ্রীচৈতন্য-জীবনীকাব্য (বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া

হইয়াছে। (গ) ইদানীন্তন কাল—ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালা, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও গদ্য পুস্তকের মুদ্রণ এবং রামমোহন হইতে রামগতির সমকালীন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকের সমালোচনামূলক পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। প্রয়োজন স্থলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা ও প্রয়োগের ভুল ধরিয়াছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহার সমালোচনা ও মতামত একটু রক্ষণশীল হইলেও সাহিত্যের ইতিহাস যে সাহিত্যের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ, তাহা তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শ তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিবার সময় প্রাচীন কবি-মহাকবিদের প্রতি অতিভক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব-বুদ্ধি-প্রভাবিত বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁহাদের গুণাগুণ আলোচনা করিয়াছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্নও কিয়দংশে সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে তিনি হিন্দু-সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন বলিয়া একালের পাঠক তাঁহার মতামতে রক্ষণশীলতার অনুচিত প্রভাব লক্ষ্য করিয়া হয়তো অপ্রসন্ন হইবেন। 'কপালকুণ্ডলা'র সমাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার এই মন্তব্যে একালের পাঠক-পাঠিকারা কৌতুক বোধ করিতে পারেন: "স্ত্রীজাতির সর্বাপেক্ষা গুণ যে পতিগতপ্রাণতা, তাহা তাঁহার (অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার) কিছুমাত্র ছিল না—সুতরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না।" এইরূপ দুই-চারিটি মন্তব্য আমাদের নিকট অযৌক্তিক মনে হইতে পারে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনার গৌরব পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের প্রাপ্য। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণে তাঁহার পুত্র আধুনিক কালের ইতিহাস আর-একটু আগাইয়া আনেন।

ইহার পরে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal*; ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে লেখকের নামের ইংরেজি আদ্যক্ষরসহ (*Ar Cy Dae*) প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ও ইতিহাসে সমপারঙ্গম রমেশচন্দ্র সম্ভবতঃ ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য এই পুস্তকে পুরাতন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। সমাজ, সংস্কৃতি

ও ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিকায় পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত এই ইতিহাসগ্রন্থ একদা উচ্চতর মহলে প্রচারিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র অদ্ভুত দক্ষতায় তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশরেখা দেখাইয়াছেন। তাঁহার আলোচনার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বাভাবিক রসবোধ। অবশ্য একথাও সত্য যে, তিনি কোনো নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন নাই অথবা পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন পুঁথি-পত্রের সন্ধান লন নাই। তথাপি বুদ্ধিদীপ্ত ও রসদৃষ্টিসমন্বিত সাহিত্যের ইতিহাসকাররূপে তাঁহার অভিমত ও সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিকতা এখনও স্বীকার করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আরো কয়েকজন বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্রাকার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' (১৮৭৮) এবং গঙ্গাচরণ সরকারের (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা) 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' (১৮৭৯)। এই সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' (বাংলা ১২৮৮ সালে প্রকাশিত) পুস্তিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী) মর্মকথা সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পরে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছয় বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) প্রকাশ করিলেন।[৭] গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার অল্পকালের মধ্যে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিল এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ঐতিহাসিকরূপে বঙ্গভাষাভাষী-সমাজে পরিচিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই এই গ্রন্থের সাতটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার এই গ্রন্থ পড়িয়াই শিক্ষিত বাঙালিসমাজ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার অন্যান্য বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁহার যশোরাশি উজ্জ্বলতর হইল। তাঁহার পরে একাধিক ঐতিহাসিক নব নব

---

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা' শীর্ষক নিবন্ধ-সংকলনে ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় রচিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধ হইতে অনেক চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন।

দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও (ড. ডুসান জ্বাভিটেল) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকায় বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের প্রতি পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছেন, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় সাগরপারের পণ্ডিতগণও অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্য আজ শুধু বাঙালির সাহিত্য নহে, এ-সাহিত্য বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের পক্ষে ইহা শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। যিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করিয়া বাঙালির সংস্কৃতি-সাহিত্য-ভাষাকে দেশে-বিদেশে সম্মানার্হ করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই দীনেশচন্দ্র সেনের প্রতি বঙ্গভাষানুরাগী পাঠক, গবেষক, ছাত্র সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন।

পরিশেষে ধন্যবাদের পালা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থের প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন। পর্ষদের প্রাক্তন প্রধান প্রশাসক শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু হোতা মহাশয় উদ্যোগী হইয়া আমাকে এই গ্রন্থের নবম সংস্করণ সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করেন। পর্ষদের বাংলা-উপ-সমিতির সদস্যগণও আমাকে এই কর্মে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পর্ষদের বর্তমান প্রধান প্রশাসক ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরীও পুস্তক প্রকাশনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল। দীনেশচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার রচনার কোথাও কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অষ্টম সংস্করণের অবিকল অনুসরণ করা হইয়াছে। অষ্টম সংস্করণে সংযোজিত অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন রচিত ভূমিকা, গ্রন্থকারের জীবনী এবং গ্রন্থশেষে সংযুক্ত ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের 'পরিশিষ্ট'টিও গৃহীত হইল, প্রয়োজনবিধায় মৎকৃত নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট মুদ্রিত হইল। তাহাতে সংক্ষেপে দীনেশচন্দ্রের কোন কোন সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করা গিয়াছে।

মুদ্রাকর কর্তৃপক্ষের সদাসতর্ক দৃষ্টির ফলে গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত হইল। শব্দসূচী সঙ্কলন ও বিন্যাসে অধ্যাপক ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষে 'জিজ্ঞাসা'র প্রকাশক প্রয়াত শ্রীশচন্দ্র কুণ্ডের স্মৃতির প্রতি

শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তিনি উদ্যোগী হইয়া আমাদের সঙ্গে পূর্ণসহযোগিতা করিয়াছিলেন, ফলে প্রকাশঘটিত নানা সমস্যার সুচারু সমাধান হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহৃদয় আনুকূল্য না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আরো বিলম্ব হইয়া যাইত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
১৩৯২ ॥ ১৯৮৫

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অদ্য ছয় বৎসর হইল, একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত-পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের অধ্যাপক পণ্ডিত ৺চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণবকবিগণের গীতি, কবি-কঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাসক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল ও অপর কয়েকখানি বটতলার ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃ. অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার পিস্ এসোসিয়েসন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে "বিদ্যাসাগর-পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত করিয়া "বিদ্যাসাগর-পদক" আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব-কৃত 'মৃগলুব্ধের' একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে যে সব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করাল দংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? প্রত্যেক বৎসর কীট, অগ্নি ও শিশুগণ কর্ত্তৃক উহারা নষ্ট হইতেছে। যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় চিন্তা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বর ডাক্তার হরন্‌লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন;

এই স্থত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয় ; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উদ্ধার করিতে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত) মহাভারত, ছুটিখাঁর (শ্রীকরণ নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি আর অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতকদিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন ; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলাওল কৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানি ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* পল্লীগ্রামের হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত ; আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই ; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃপ্রত্যাবর্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি। একদিন রাত্রি ১০টার সময় ত্রিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথ হারাইয়া ফেলি ; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবসতি

* ১৩০১ সনের শ্রাবণে "পরাগলী মহাভরত", ভাদ্রে "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম", আশ্বিনে "মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম", অগ্রহায়ণে "ছুটিখাঁর মহাভারত", পৌষে "কৃষ্ণকমল গোস্বামী" মাঘে "মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" এবং ১৩০১ সনের জ্যৈষ্ঠে "দুইজন প্রাচীন কবি", ভাদ্র ও আশ্বিনে "ভূকৈলাসের রাজকবি" ও চৈত্রে "পরাগলী মহাভারত সম্বন্ধীয়" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জঙ্গলের পথে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল যে ভাবে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা সেই দিনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বর্ম্মণ ও আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। কিন্তু এই সব বহুদর্শিতার মধ্যে সুখের কথা না আছে, এমন নয়; পাহাড়-বেষ্টিত দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘন শ্যামপত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের ন্যায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল পুকুরের জলে ঝাপ্টা-বাতাসে নির্ম্মল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে সপত্র পদ্মফুলগুলি এক একবার ডুবিয়া যাইতেছে ও কিঞ্চিৎ পরে সুন্দরীগণের ন্যায় মুখ দেখাইতেছে। দূর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ভূসংলগ্ন মেঘপংক্তির ন্যায় পাহাড়-রাজি বিরাজিত; পল্লীললনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, পল্লী-কৃষকগণের সরল কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি, এই সব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে।

এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষায় উৎপত্তি, বিভক্তি-চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; ছাপা পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুস্তকেরই অধিক আলোচনা প্রয়োজন হইয়াছে। ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দ্বারা দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাম্রকূটপত্র-সমষ্টির ন্যায় পুঁথির পাঠোদ্ধার করা সুকঠিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উল্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় বৎসর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতে মন উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও বিষয়কর্ম্ম করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই, আমার অনুপযুক্ততাহেতু যে সমস্ত দোষ রহিয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

পুস্তক রচনার সময় আমি অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও উৎসাহ

পাইয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিব শুনিয়া তিনি আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'সাহিত্যে' কবিকৃষ্ণরাম শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই ত্রিপুরায় বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণবসাহিত্যের আর কোনরূপ চর্চ্চা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইত কিনা সন্দেহ; কিন্তু হুগলী বদনগঞ্জনিবাসী পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন করিয়াছি, অগৌণে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন ৬৫ বৎসর, কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট্ট মৈনানিবাসী গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অযাচিতভাবে আমার নিকট পত্র লিখিয়া পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি আমার কল্পনায় দেবমূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল—পর-উপকারব্রতের সুধা তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমার জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ী দেবী—এই তিন কবির পুঁথি আমি তাঁহারই অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, তাঁহার কৃতজ্ঞতা-ঋণ আজীবন বহন করিব। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় আমাকে নানারূপ পুস্তকাদি ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন। তিনি ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' আমার এই পুস্তক-রচনার উদ্যমের বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া আমার অকিঞ্চিৎকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্নেহেরই বেশী পরিচয় দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ খৃ. অব্দের ১২ মার্চ্চ তারিখের 'হোপ' পত্রিকার সম্পাদক আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। ঐ সনের ১৭ই অগষ্টের 'হিতবাদীতে', ১৩০০ সালের ৩২শে আষাঢ়ের 'অনুসন্ধানে' এবং সেই সালের ২০শে বৈশাখের দৈনিক 'সমাচার-চন্দ্রিকায়' আমার উদ্যমের উৎসাহবর্দ্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সালের শ্রাবণের পরিষদ্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন।

১৩০১ সনের মাঘ মাসের ও ১৩০৫ সনের কার্ত্তিক মাসের পরিষদ্ পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ খৃ. অব্দের ৬ই মার্চ্চের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় আমার পুস্তক-সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহসূচক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া পরম শ্রদ্ধেয় সুকবি বরদাচরণ মিত্র, বি. সি. এস. মহোদয়, প্রিয় সুহৃদ্ 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'দাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবনচরিতপ্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা পিস এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী প্রবোধপ্রকাশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-গৌরব কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তক রচনাকালে আমাকে যে অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাইয়াছেন তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। বঙ্গসাহিত্যের জন্য এখনও তাঁহার পূর্ণ উদ্যম, আমার সংগৃহীত সকল-গুলি পুঁথিই তিনি সাহিত্যসমালোচনী-সভা হইতে মুদ্রিত করিবেন, ইহা তাঁহার সঙ্কল্প; এইজন্য তিনি আমাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে নানারূপে উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচনা সময়ে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কলেজে অধ্যয়ন-কালে যখন সভামণ্ডপে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম, তখন তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ মূর্ত্তি র‍্যাফেল-অঙ্কিত একখানা গ্রীক দেবতার ছবির ন্যায় বোধ হইত, আমার চক্ষে এখন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই এক বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে সহৃদয়তার অভাব নাই। আমার উপযুক্ততার এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি সৎকর্ম্মের রবে মাত্র আহূত হইয়া সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় সম্বন্ধে আমি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ত্রিপুরার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও ত্রিপুরার রাজ্যের পলিটিকাল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত আর. টি. গ্রীয়ার সাহেব আমার আবেদন সমর্থন করিয়া পত্র লিখেন। কিন্তু সেই আবেদন পত্রের উপর হুকুম হইতে একটু গৌণ হওয়াতে আমি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের নিকট আর একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। তিনি আমার পুস্তকের সমস্ত ব্যয়

বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পুস্তকের প্রূফ দেখার ভার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে শোভাবাজারের রাজাবাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নূতন লেখক সম্প্রদায়ের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের ভাগিনেয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বর্ম্মণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই খণ্ডের সমস্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দানশীলতা বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ। আমার এই সামান্য পুস্তক তাঁহার পবিত্র নামের সঙ্গে সংগ্রথিত করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই দানপ্রাপ্তি-বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারি বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাধারমণ ঘোষ, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি আমার সহাধ্যায়ী অশ্বিনীকুমার বসু ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজমোহন মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকপ্রণয়নকালে নানা গ্রন্থেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করার স্থান নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা ও রমেশচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস., মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাস পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

এই পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও

বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির উদ্ধারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; আশা করা যায়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজ্ঞাত কাব্য সুপরিচিত হইবে। বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীনকালে দুএকজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য অতি বিরাট্—লূতাতন্তুজড়িত, জীর্ণ, গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণব-গ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান-চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে। আমার এই পুস্তক ভাষার ভাবী ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব। পুস্তক আকারে বৃহৎ হইলে, এইজন্য তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পদ্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্যচরিত্র এবং দ্বিজ দুর্গাদাস প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ১৩০৩ সালের বৈশাখের পরিষদ্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'গৌরীমঙ্গল' নামক একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিবরণ পূর্ব্বে অবগত না থাকায় উহা উল্লেখ করি নাই। এই পুস্তক ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খৃ. অব্দে) পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ইহার কবিত্ব মোটামুটি বেশ সুন্দর, কিন্তু আমরা এই কাব্যের কবিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত নহি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যরূপ ফুলের বনে গৌরীমঙ্গলরূপ একটি সামান্য সেউতি ফুল অদৃশ্য হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই ; কিন্তু এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের সামান্যরূপ ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা আবশ্যক মনে করি। সেই অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল : "সত্যযুগ বেদ অর্থ জানি মুনিগণ। সেইমত চালাইল সংসারের জন॥ ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল। তেকারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল॥ অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে নারিল॥ স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হৈল॥ মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণ॥ বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে॥ বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচণ॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্যমঙ্গল কৈল

বৈষ্ণব বিজ্ঞান। বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল॥ মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা॥ অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥ চোর চক্রবর্ত্তী কীর্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্তি পয়ার রচিল॥ দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল॥ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কিরীটমঙ্গল আদি হইল সকল॥ এ সকল গ্রন্থ দেখি মনে আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল॥" এখন দেখা যাইতেছে, রাধাবল্লভ প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ, শিবরাম গোস্বামীকৃত 'ভক্তিলতা', চোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান', গঙ্গানারায়ণকৃত 'ভবানীমঙ্গল' এবং 'কিরীটমঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সেগুলি বিদ্যমান ছিল, অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া অসম্ভব নহে। প্রবন্ধ-লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী নিত্যানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "গত চৈত্রের 'সাহিত্যে' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়খানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।" (পরিষদ্ পত্রিকা ১৩০৩; বৈশাখ, ৫১ পৃ.)। আমরা এই পুস্তকেও নিত্যানন্দ কবির উল্লেখ করি নাই, কিন্তু নিত্যানন্দ ঘোষ নামক এক কবির ভণিতাযুক্ত আদিপর্ব্বের অনেকাংশ আমরা পাইয়াছিলাম, সেই অংশের একটি স্থলের ভণিতা এইরূপ; "কাম্য করি যে শুনিল ভারত পাঁচালী। সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী॥ নিত্যানন্দ ঘোষ বলে শুন সর্ব্বজন। আগে এই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবরণ॥" এই মহাভারতখানি একশত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত ও ইহার অধিকাংশ স্থল সঞ্জয়রচিত। ত্রিপুরা সদরের নিকটবর্ত্তী রাজপাড়া নামক গ্রামে এক ধোপার বাড়ীতে আমরা এই পুঁথি পাইয়াছিলাম। আমি ও এসিয়াটিক্ সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের জন্য ধোপাকে ২৫ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে পৈত্রিক পুঁথি দিতে স্বীকার করে নাই; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে এই পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। নজির লুপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে যে নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা আর আমি ব্যবহার করি নাই। পূর্ব্বোক্ত

নিত্যানন্দ ঘোষ, গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত নিত্যানন্দ হইতে পারেন।† আমরা এই পুস্তকে যেসব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈষধ, অনন্তরাম প্রণীত ক্রিয়াযোগসার, দ্বিজ কংসারি প্রণীত পরীক্ষিৎ-সংবাদ, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত (পরাগলী) মহাভারত, জাতক-সংবাদ, রামেশ্বর নন্দীর অসম্পূর্ণ মহাভারত, ইন্দ্রদ্যুম্নচরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সঞ্জয়কৃত মহাভারত, ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা, গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব, শ্রীকরণ নন্দী প্রণীত (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত) অশ্বমেধ পর্ব্ব, প্রভৃতি পুস্তক বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এই নিমিত্ত উৎসুক পাঠকবৃন্দের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত অংশের নিম্নে পত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া গ্রন্থভাগে উল্লিখিত অপরাপর পুঁথির কতকগুলি আমার নিকট আছে, তদ্ব্যতীত অন্যগুলি কোথায় আছে, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমরা বলিতে পারিব। পুস্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুঁথিদৃষ্টে আলোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার, পাঠকেরও কৌতুহল নিবৃত্তির পথ নিতান্ত অসুবিধাজনক হয়। যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর, তাহা কীর্ত্তিস্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পর্য্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতির পক্ষে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

পুস্তক রচনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তক সমাধা করিয়া যন্ত্রস্থ করিতে পারি নাই। কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও ছাপাইতে দিয়াছি, এইজন্য ছাপা হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছে। পুস্তক লেখা শেষ না করিয়া ছাপাইতে দেওয়ার কতকগুলি দোষ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান এই—পুস্তকের আদ্যন্ত সুশৃঙ্খল করিতে পারি নাই। প্রথম হইতে তৃতীয়

---

† এবার নিত্যানন্দ ঘোষের সমস্ত মহাভারত বাহির হইয়া পড়িয়াছে; আমরা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের মহাভারতেরই অন্যতম আদর্শ। দ্বিতীয় সংস্করণ।

অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি, এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোট ও পশ্চাতের অধ্যায়গুলি অতি বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপক্রমণিকার অন্তর্ব্বর্তী করিলে বোধ হয় এই দোষ বর্জিত হইতে পারিত। অন্যান্য যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা প্রথম সংস্করণে একরূপ অপরিহার্য। জগৎরাম রায়ের কাল সম্বন্ধে আমরা ৫০৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমরা জগৎরামের কাব্য দেখি নাই, 'দাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদ্বিবরণ সংকলন করিয়াছি। বলরামবাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তকে উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৮৯২ খৃ. অব্দের মে মাসের 'দাসী'তে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়, বলরামবাবুর নির্দ্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন। আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে; তদনুসারে জগৎরাম রায় ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে) রামায়ণ রচনা করেন। 'তা'পর পুস্তক 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম'—অর্থ তারপর দুর্গাপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল—নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়, এইজন্য ১৭১২ শককে সম্বৎ নির্দ্দেশ করিয়া কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবাবু দেখাইয়াছেন, 'তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থে 'তাহার অপর পুস্তকের নাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি', সুতরাং দুর্গাপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সত্যবাবু স্বীয় মত সুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন।

১৬৮ পৃষ্ঠায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক রচনা শেষ হয়, কিন্তু মুসলমান লেখকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৪৮৯ খৃ. অব্দে হুসেনসাহ গৌড়ের সম্রাট হন, অথচ আমরা "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান" পদের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে হুসেন সাহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এসম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক গোল রহিয়া গেল। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি। এরূপ হইতে পারে পুস্তক শেষ হওয়ার ৯।১০ বৎসর পরে কবি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থশেষে তাহা জুড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক এই মত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়

একরূপ উদাসীন আছেন। আয়েম্বিক্ ও ট্রকেয়িক প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিত্বে প্রীত যুবকগণ অবিরত পয়ার ও দীর্ঘছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন; প্যারাডাইস লষ্ট কিংবা টাস্কের অবতরণিকায় যাঁহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সুখী, তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 'লম্বস্থূল কলেবর' ইত্যাদিরূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা জুলিয়েট ও এণ্ড্রেমেকি প্রভৃতি নামের পক্ষপাতী, কিন্তু বেহুলা, লহনা, কানেড়া প্রভৃতি সেকেলে নাম শুনিয়া প্রীতি বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে কতকটা ধৈর্য্য ও ক্ষমা চাই; আমরা সাহসসহকারে বলিতে পারি, পয়ার ছন্দ ও গণেশ বন্দনা উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না, অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এই স্থলে মোক্ষমূলের এই কয়েকটি বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি: "যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বনশূন্য হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। যখন জার্ম্মেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রাচীন সাহিত্যপাঠে ইঁহাদের ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।"

কুমিল্লা
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি উৎকট শিরোরোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুই বৎসরকাল উত্থান-শক্তি-রহিত ও শয্যাশায়ী হইয়া এখন কিঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিয়াছি।

পাঁচ বৎসরকাল আমি একরূপ অকর্ম্মণ্য ও জীবিকা অর্জ্জনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া যার পর নাই আর্থিক অভাবে পতিত হইয়াছি। বঙ্গভাষার জন্য আমি যে সামান্য শ্রম স্বীকার করিয়াছি, তাহার ফলে আমার আপৎকালে আমি যে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়।

আমার এই অবস্থায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামতি ছোটলাট বাহাদুর শ্রীযুক্ত উডবরণ ও রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড কার্জ্জন আমার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হইয়া আমায় মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

পরম পণ্ডিত সহৃদয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ সাহেবের কৃপার কথা আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা দ্বারা তিনি পণ্ডিত সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া অন্য কোন বিদেশী পণ্ডিত মহাত্মা গ্রীয়ারসনের মত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তদনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার আদি সঙ্গীত মাণিকচাঁদের গান ইনি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ইঁহার সংগ্রহ অসীম অধ্যবসায়ের ফল। সম্প্রতি ইনি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই কার্য্য সমাহিত হইলে ইঁহার জীবনের অনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। আমার আপৎকালে এই মহাত্মা যেরূপ সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত স্ক্রাইন সাহেব আমার পুস্তকের প্রতি যে আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যাভেজ

সাহেব আমার বৃত্তি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, সি. এস., শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই. সি. এস., মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহোদয়-গণের নিকট আমি দুঃসময়ে বিবিধ আনুকূল্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরজীবন ঋণবদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী, এল. এম. এস., শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার, এম. ডি., শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., মহাশয়েরা আমার পীড়ার সময়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ৬০০ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সরকারী বিদ্যালয়সমূহের জন্য ৭০খানি গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন এবং পূর্ব্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় তাঁহার অধীন বিদ্যালয়সমূহে এক একখানি পুস্তক ক্রয়ের জন্য সার্কুলার প্রচার করেন। সেই সার্কুলারের ফলে প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়া যায়। বর্ষমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যক হয়; কিন্তু অর্থাভাবে আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই।

চারি বৎসরকাল অতীত হইল, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবাসী রামকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলা হইতে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনে। এই ব্যক্তি পুস্তক সংগ্রহ-কার্য্যে বিশেষরূপ দক্ষ দেখিয়া আমি ইহাকে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অধীনে পুঁথি সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিই। আমার যা অবস্থা, তাহাতে এই সকল পুঁথি কিনিবার শক্তি আমার নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নগেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বেই অনেক প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামকুমারকে নিযুক্ত করিয়া ইহার দ্বারা তিনি প্রায় ৫০০ শত পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারকল্পে নগেন্দ্রবাবু যেরূপ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাঁহার

নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ১০০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে, ইহার জন্য তাঁহার শুধু অর্থব্যয় নহে, বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির এই অমূল্য পুস্তকাধারটি নগেন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লাইব্রেরীর পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের ভীতি জন্মিয়াছে। এই পুঁথি-গুলির অতি নগণ্য অংশও এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার এই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি গভর্নমেণ্টের লাইবেরী কিংবা কোন অর্থশালী সাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত। অন্ততঃ এমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির হস্তগত থাকিলেও চলিতে পারে, যে স্থল হইতে ইহাদের নিলামে বিক্রয় হইবার আশঙ্কা অল্প। এই পুঁথিগুলির একখানি নষ্ট হইলে তৎস্থল পূরণ হওয়া দুষ্কর। নগেন্দ্রবাবুকে ইহাদের অধিকারের লোভ ছাড়িয়া দিতে প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয়। আমরা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই পুঁথিগুলিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, আশা করি সুহৃদ্বর তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। এই পুস্তকগুলি হইতে আমি বর্ত্তমান সংস্করণে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে সকল পুঁথি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে আমি তাহাদের অধিকাংশের ন্যূনাধিক বিবরণ প্রদান করিয়াছি। গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত পুঁথিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পুস্তকশেষে প্রদত্ত হইল। এরূপ গ্রন্থে সমস্ত পুঁথিরই উল্লেখ তত আবশ্যক নহে, এজন্য সামান্য সংখ্যক পুঁথির উল্লেখ করি নাই। এবার এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব সংস্করণের আয়তনের অন্যূন এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়া গেল। একটি বিস্তৃত বর্ণনানুযায়ী অনুক্রমণিকা সর্ব্বশেষে প্রদত্ত হইল। এই অনুক্রমণিকাটি এবং গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে সন্নিবিষ্ট সূচীপত্র আমার প্রিয় বন্ধু সুলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, বি. এ. মহাশয় প্রস্তুত করিয়া আমার চির-কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অধ্যায়াংশগুলি পুস্তকের পূর্ব্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র সূচিকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনাদি ব্যাপারে আমাকে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। তথাপি প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহা করিয়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয়া এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে

১০।১৫ দিন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই। ফরিদপুর থাকা কালে আমি নিজ হাতে লিখিতে একান্ত অক্ষম ছিলাম। আমি বলিয়া যাইতাম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার নামক জনৈক বঙ্গভাষানুরাগী উৎসাহী যুবক স্নেহ-পরবশ হইয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমি এজন্য একান্ত ঋণী।

আমার এরূপ সঙ্গতি নাই যে প্রুফ্ ইত্যাদি সংশোধনের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি, সুতরাং প্রেস হইতেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি আমাকে প্রুফ্ দেখিবার জন্য বহু প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বন্ধুবর্গ প্রুফ্ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে তাঁহাদের সাহায্য পাওয়ার সুবিধা ঘটে নাই, এ অবস্থায় ভুল থাকিবার নিতান্ত আশঙ্কা, কিন্তু পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া ছাপাইবার শক্তি এবং অর্থবল আমার নাই। আমার ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব, আমি তদতিরিক্ত শ্রম করিয়া অনেক সময় পীড়া বৃদ্ধি করিয়াছি, এসম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব, পাঠকবর্গের নিকট আমি বিচারাধীন রহিলাম।

অতঃপর চিত্রের কথা। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয়ের অনুরোধে বীরভূম ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত এইচ. এম্. প্যারিশ মহোদয় আমার পুস্তকের জন্য চণ্ডীদাসের ভিটা, বাশুলীদেবীর মন্দির এবং বাশুলীদেবীর ফটোগ্রাফ তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভিটার দুইখানি ছবি, একখানি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং অপরখানি উত্তর-পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য। ভিটার পরিসর অতি বৃহৎ এবং উহার চতুর্দ্দিক্ ঘন তরুরাজি ও গৃহসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত।* বাশুলীদেবীর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিতে সাহেব মহোদয়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্দির-স্বত্বাধিকারিগণ অনেক অনুরোধের পর সন্ধ্যাকালে দেবীমূর্ত্তিটি বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি এই মূর্ত্তির নিকটে যাইতে পারেন নাই, দূর হইতে ফটোগ্রাফটি তুলিতে হইয়াছে, মূর্ত্তিটি অতি ক্ষুদ্র, এজন্য চিত্রখানি ছোট

* শ্রীযুক্ত প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন—"The bhita I found difficult to photograph even with a wide angle lens as it is large and closely surronded with houses or trees"

হইয়াছে।† দেবীর পূর্ব্বতন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিন বৎসর হইল সেই স্থানে যে নূতন মন্দির উত্থিত হইয়াছে, এ ফটোগ্রাফখানি সেই নূতন মন্দিরের।

গৌরাঙ্গ সমাজ চৈতন্যপ্রভুর যে ছবি বিক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল তৈলচিত্র মহারাজা নন্দকুমারের বংশধর রাজকুমারগণের বাড়ী বহরমপুর কুঞ্জঘাটায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীনিবাসের বংশধর বৈষ্ণবকুলতিলক, পদামৃতসমুদ্র-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারকে প্রদান করেন। এই তৈলচিত্রখানি বড় সুন্দর এবং প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। আমি নিজে অর্থব্যয় করিয়া কুঞ্জঘাটা হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়া আনিয়াছি। গৌরাঙ্গ সমাজের ছবিতে চৈতন্যপ্রভুর কপালে এবং নাসাগ্র ভাগে যে তিলক ও চক্ষুপ্রান্তে যে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত নেগেটিভ এবং ফটোগ্রাফে তাহা পাই নাই, সুতরাং গৌরাঙ্গ সমাজের ছবির সঙ্গে আমার ছবির একটুকু পার্থক্য আছে। এই ফটোগ্রাফখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে ফরিদপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অনারেবল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় আমাকে সাহায্য করেন। এজন্য আমি উভয়ের নিকটই কৃতজ্ঞ। 'দক্ষিণরায়' দেবের প্রতিমূর্ত্তি আমি বহু চেষ্টা করিয়া হাওড়া খুরুট-পঞ্চাননতলার উক্তদেবের একটি প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ আঢ্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্য আমার অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিত্র আছে, এই সংবাদ জানিয়া বৃন্দাবনবাসী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পর্য্যন্ত প্রত্যর্পিত হয় নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেই ছবিখানি সম্বন্ধে অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন: "হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত বংশীয় ৺জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার যথারীতি সেবা পূজা হয়, প্রেরিত ছবি

† "The image was brought outside for me to photograph very late in the evening and I had to take it without pre-arrangement. I was quite unprepared for such a very small image and could not get close enough to it for a larger picture or screen the wall behind it. A very strong wind, too, was blowing at the time. This negative could be cut down and enlarged."

সেই প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি হইতে গৃহীত।" জয়ানন্দের হস্তলিপি আমি শ্রীযুক্তকালিদাস নাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা কবির খসড়ালেখার প্রতিলিপি। সেই খসড়ায় দেখা যায়, কবির কোন একটি পংক্তি মনোনীত না হওয়াতে সে পংক্তি সংশোধন করিয়া তিনি অপর এক ছত্র লিখিয়াছেন, সে ছত্রটিও ভাল না লাগাতে আর এক ছত্র দ্বারা উহা সংশোধন করিয়াছেন, এইরূপ উপর্য্যুপরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্ব্বশেষ মনোনীত হইয়াছে, তাহা স্বীয় পদরাশির অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও স্থানে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ সালে লিখিত একখানি প্রাচীন চৈতন্য-ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রাপ্ত সংকীর্ত্তনের যে তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল, তাহা রামকুমার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'দাসী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মর্ম্মানুসারে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত কবি জগৎরাম রায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেশ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে, আমরা এখনও এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই। সুতরাং পুস্তকের সে অংশটির পরিবর্ত্তন করিলাম না।

এবারেও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে কতক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথম সংস্করণের ৩৭০ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় আমরা লিখিয়াছি স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবণিক বংশীয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় এবং ভিষকপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম. এ, মহাশয়দ্বয় আমাকে কতকগুলি প্রমাণ নিদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, কবি উমাপতি ধর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত-মল্লিক-কৃত রত্নপ্রভা গ্রন্থে ইহা স্পষ্টরূপ উল্লিখিত আছে এবং জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত পিঞ্জারী গ্রামে এখনও উমাপতি ধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পিঞ্জারী গ্রাম অতি প্রাচীন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন এই গ্রামখানি জনৈক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া যে তাম্রফলক প্রচারিত করেন, তাহা কয়েক বৎসর হইল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে। উমাপতি ধর বাঙ্গালাভাষার কবি নহেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চর্চ্চা আমাদের বিষয়বহির্ভূত।

পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কোন বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া

যায় নাই। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিকৃতপাঠবিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে :

"নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র শ্রীপতি নহে ভট্ট বিশারদ॥ মধুকুল্যগোত্র হইল গাই গুণাকর। শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎ কাহেস্তের ঘর॥ নরহরি তনএ জে নরসিংহ পিতা। মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ চোদ্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন। মহাজন সহিত পথেত দরশন॥ শিশু-রূপেতে গোঁসাই হাতেতে করি বাঁশী। আলিঙ্গন দিয়া বলে যার মুখে হাঁসি॥ গোবিন্দের আসা মোর সেই সে কারণ। প্রণাম করিল মুঞি ভজিয়া চরণ॥ সকল স্বজন প্রভু তোমার কারণে। কি করিতে পারি আমি তোমা বিদ্যমানে॥ গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি। কোকিলের নিকটে জেন কাক করে ধ্বনি॥ শঙ্খের নিকটে সামুকের কিবা শোভা। সুমেরু নিকটে যেরূপ উলুতোপার প্রভা॥ অমৃত নিকটে ইক্ষুকের কিবা কাজ। নক্ষত্র নিকটে যেন শোভে খদ্যোতরাজ॥ দুগ্ধের নিকটে ঘোলের কাজ নাই। ক্ষীরোদ নিকটে যেন শোভে গড়খাই॥ যদিবা অশুদ্ধ হয় আমার বচন। পণ্ডিতের মুখে তাহা করিবা শ্রবণ॥"

এই বিবরণটি সুকবি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিখানিতে পদ্মাপুরাণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

উপসংহার কালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানারূপ বিপদের মধ্যে, ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুও অন্যতম বলিয়া গণ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুশয্যার এক প্রান্তে আমার এই সামান্য পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এবার যাঁহাদের নিকট পারিবারিক অভাবমোচনার্থ এবং পুস্তকের জন্য সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশের নিতান্ত অমত হওয়াতে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য এই নূতন সংস্করণের ৭০ কপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১ **শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন**

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের বিশেষ গৌরব করিবার বিষয়, জে. লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ। এই বিখ্যাত পুস্তকখানি সমগ্রভাবে এবারকার সংস্করণে পরিশিষ্টস্বরূপ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পত্র সংখ্যা প্রায় ১১০। এই ক্যাটালোগে ১৮০০ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪০০ প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণী আছে। মিঃ জে. লঙ্ সাহেব ৫নং কাশীতলা হইতে এই পুস্তক-বিবরণী প্রকাশ করেন। তাহার প্রকাশক ছিলেন স্যাণ্ডার্স কোন্স্ এণ্ড কোং। বিবরণীটির বিশেষত্ব এই যে তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বহু পুস্তকের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ভূতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অভিধান, দর্শন, মস্তিষ্কতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, জরীপ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পুস্তকের উল্লেখ এবং বিবরণী দেওয়া আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এইরূপ বিবিধ বিষয়ের পরিভাষা বাঙ্গালা ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছিল। এখন আমরা এইরূপ পরিভাষার জন্য হাতড়াইয়া মরিতেছি; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে সম্প্রতি এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতির পরিভাষা আদৌ সৃষ্ট হইতে পারে কি না। লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগে যে সমস্ত পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সকলগুলি অবশ্য নির্দ্দোষ নহে। ৭০। ৮০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা কতকটা জটিল ও অমার্জ্জিত নিশ্চয়ই ছিল এবং পরিভাষাগুলির মধ্যেও অনেক বিসদৃশ ও উদ্ভট রকমের শব্দ রচিত হইয়াছিল। অশুভক্ষণে মেকলে সাহেব বাঙ্গালা শিক্ষার ধারা বদলাইয়া দিলেন; তিনি এবং তাঁহার সহকারীরা বিধিবদ্ধ করিলেন যে অঙ্কশাস্ত্র হইতে শব্দশাস্ত্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় আমাদের ইংরাজীতে পড়িতে হইবে। এইভাবে যে স্রোতটি চলিয়া আসিতেছিল, তাঁহার মুখ ইঁহারা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে আমরা বঙ্গভাষায় শুধুই সাহিত্য—বিশেষভাবে—কবিতার আরাধনা করিতেছি এবং অপরাপর সমস্ত বিষয় ইংরাজী ভাষায় শিখিতে যাইয়া একদিকে ভাষা আয়ত্ত করিবার দুরূহ চেষ্টা—অপর দিকে বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জনের শ্রান্তি দ্বারা জীবনের অর্দ্ধেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। যে সময় আমাদের ভাষায় এই পরিভাষা আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে জাপানেও এইরূপ চেষ্টা

শুরু হইয়া তাহা কিরূপ কল্পতরুর ন্যায় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে কোন বিষয়-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষা আপনি সৃষ্ট হইয়া থাকে। বই লিখিত হইবার পূর্ব্বে পরিভাষা রচনা করায় কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য রামেন্দ্রবাবু ও যোগেশ রায় প্রভৃতি লেখকদের চেষ্টা এ বিষয়ে কতকটা অসাময়িক হইয়াছে। যে বিষয় পড়িতে হইবে—সেই বিষয়ের জ্ঞান হইবার জন্য পরকীয় ভাষায় সেই বিষয়ের পরিভাষা শিখিতে হইতেছে। ইহাতে যে কতটা অতিরিক্ত শ্রম করিতে হইতেছে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এই ভাবে কতটা যে ব্যর্থশ্রম করিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজী ভাষার সমর্থকগণ বলেন, (১) বাঙ্গালা ভাষায় বহু বিষয়ক পুস্তকাদির রচনার উপযুক্ত পরিভাষা নাই। —লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ তুড়ি দিয়া এই যুক্তিকে উড়াইয়া দিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা অবাধে হইতেছিল এখন বঙ্গভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধির যুগে তাহা হইতে পারিবে না এ যুক্তি অসার। বস্তুতঃ পরিভাষা সৃষ্টির যে পরম হিতকর প্রচেষ্টা হইতেছিল, তাহা মেকলে সাহেবের বিধি গলা টিপিয়া না মারিলে এতদিনে আমাদের ভাষা নানা বিষয়ক বিশুদ্ধ পরিভাষায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া অপরাপর ভাষার সমকক্ষতা করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে তজ্জন্য যদি পরভাষা চর্চ্চার সঙ্গে একটা বিষম লড়াই করিতে হয় তবে সেই বিষয়ে কখনই মৌলিকতা জন্মিতে পারে না। এজন্যই ক্রাইন সাহেব লিখিয়াছেন: "মেকলে সাহেবের বিধির দ্বারা যদি বাঙ্গালা ভাষার এই ঘোর অনিষ্ট না হইত, তবে বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতা দেখাইতে পারিতেছেন না এ কলঙ্ক কবে ঘুচিয়া যাইত। এখন ইঁহারা যে শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহার দশমাংশ যদি তাঁহারা স্বীয় ভাষায় জন্য প্রয়োগ করিতেন—তবে বাঙ্গালা ভাষায় আমরা নানারূপ মৌলিক গ্রন্থ দেখিতে পাইতাম।"

ইংরাজী সমর্থকগণের (২) যুক্তি এই যে অপরাপর বিষয় ইংরাজীতে না পড়িলে আমাদের ইংরাজীর জ্ঞান সেরূপ সম্পূর্ণ হইবে না এবং ইংরাজী বিদ্যার্জ্জনে ভয়ানক বিঘ্ন হইবে।—যেন ইংরাজি শিক্ষা করাই আমাদের জাতির একমাত্র লক্ষ্য! ইংরাজের প্রতিবাসী ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাও ত ইংরাজী শিখিয়া থাকেন। আমাদেরই কি শুধু ইংরাজী বিদ্যা জপতপ ও একমাত্র আরাধনার বিষয় করিতে হইবে? ইংরাজ-শাসন ইংরাজীর

উপরে এইরূপ অকথ্যভাবে জোর দিয়া যে আমাদিগকে নানা দিক হইতে কতটা লাঞ্ছিত করিতেছে, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, যদি জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটেরা ভালরূপ বাঙ্গালা শিখিতেন তাহা হইলে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী, প্রত্যেক প্রার্থীর আবেদন-নিবেদন, প্রত্যেক উকীলের বক্তৃতা ইংরাজীতে করার জন্য শাসন-যন্ত্র এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। দু'একটি ইংরাজ যে দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা তদ্দেশের ভাষা শিখিবেন না, অথচ শত শত লোককে এজন্য ইংরাজী লইয়া কুস্তি করিতে হইবে এবং মতরজ্জং ও ইণ্টারপ্রেটার এক গোষ্ঠী নিযুক্ত করিয়া সেই দু'একটি সাহেবের অজ্ঞানতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেশের অর্থ অজস্র ব্যয় করিতে হইবে! অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা শুধু আমাদের বিষয়কর্ম্মের জন্য নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ঐক্য সংস্থাপনের জন্যও আমাদের এই ভাষা শিক্ষা করা একরূপ অপরিহার্য্য। কিন্তু চলনসই বিদ্যায় যেখানে কাজ হইতে পারে, সেখানে ইংরাজের উচ্চারণ ভঙ্গি, ইংরাজের হাসি, ইংরাজের কাশি, ইংরাজী ইতিহাসের খুঁটিনাটি, এ সমস্তই ঠিক ইংরাজের মত আমাদের নির্দ্দোষভাবে শিখিতে হইবে, এটা কি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নয়? সেকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে জীবন কাটিয়া যাইত, কিন্তু যে সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ব্যাকরণ দরকার, ব্যাকরণ পড়ায় অত্যধিক সময় ব্যয় করার পরে সেই সাহিত্য পড়িবারই অবসর অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের ইংরাজী পড়ার দৌরাত্ম্য প্রায় সেই ব্যাকরণ পড়ার দৌরাত্ম্যের মত হইয়াছে।

এই যে ১৪০০ পুস্তকের বিবরণ লঙ্‌ সাহেব দিয়াছেন তাহার মধ্যে এখন ১৪ খানি পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বড় বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছি, কিন্তু পুরাতন ছাপা বইগুলি আবর্জ্জনার মত ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছি। আশা করি এবার এই ক্যাটালোগের প্রকাশের পরে এই পুস্তকগুলির যতটা পারা যায় ততটা সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যমশীল যুবকেরা চেষ্টিত হইবেন। এখনও হয়ত কতকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু চার পাঁচ বৎসর পরে তাহা অসম্ভব হইবে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ১৮৫৫ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের কোন তালিকা নাই। আশা করি আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালায় আবার শীঘ্রই নূতন করিয়া

পরিভাষা গড়িতে হইবে। সেই সময়ে এই সকল পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন সম্পত্তি ও সমৃদ্ধিকে আমরা চিরদিনই উপেক্ষা করিয়া স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিতেছি এবং দেশপ্রাণতার বড়াই করিতেছি। মূল কথা প্রকৃত স্বদেশপ্রাণতা এখনও এদেশে জন্মায় নাই। দু'একজন ক্ষণজন্মা চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ বসুকে বাদ দিলে অধিকাংশ স্বদেশহিতৈষীদের প্রচেষ্টা একটা হুজুক মাত্র। ইংরাজী ইতিহাসের একটা নকলবাজী করিয়া আমরা জগজ্জয়ী পরমকর্ম্মীদিগের কেবল বাগাড়ম্বরপূর্ণ একটা অভিনয় করিতেছি মাত্র।

লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ এখন অতীব দুষ্প্রাপ্য। একশত টাকা দিলেও একখানি মিলিবে কি না সন্দেহ। স্বতন্ত্র ছাপা হইলেও এরূপ সাধারণের অনধিগম্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের মূল্য প্রতি খণ্ড চার পাঁচ টাকার নীচে হইত না। আমরা এবার পুস্তকের মূল্য মাত্র ১৲ টাকা বাড়াইলাম। পূর্ব্ব সংস্করণের মূল্য পাঁচ টাকা ছিল, এবার ২০০ পৃষ্ঠা বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্য মাত্র ৬৲ টাকা হইল।

লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ ছাড়া আরো অনেক নূতন বিষয় এই সংস্করণের অন্তর্গত করা হইল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ, রামরাম বসুর নব তথ্যপূর্ণ জীবনী এবং অপরাপর বহু বিষয় এবার নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। বহু ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত পরিশিষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় এই নব সংস্করণের নিকট চতুর্থ সংস্করণও একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বিগত সংস্করণের বহি এবার অচল হইল, কারণ বর্ত্তমান সংস্করণের জন্য আমাদিগকে অশেষ শ্রম স্বীকার ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এবার পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের একখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য অনেক প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া এই প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার কর্ম্মচারী শ্রীমান নিশিরঞ্জন দাস এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তকের প্রথমাংশ সংশোধনাদি কার্য্যে আমি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

৭নং বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

এবারও পুস্তকখানির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে, ফলে অনেক তত্ত্বের নব আবিষ্কার হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীন পল্লীগাথার আবিষ্কার একটি গুরুতর ঘটনা। বঙ্গে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের আশ্চর্য্য বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে; এই ধর্ম্ম হাওয়া হইতে উদ্ভূত হয় নাই,—নরনারীর কিরূপ দুশ্চর তপস্যা দ্বারা বঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আমরা পল্লীগীতিকাগুলি হইতে জানিতে পারি। বাঙ্গালীর চিত্ত এরূপ কোমল কিরূপে হইল, কিরূপে বাঙ্গালীর দুটি চক্ষু এরূপ সজল নিত্যবর্ষণশীল "শাওণ ঘনে" পরিণত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে এদেশকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল,—তাঁহার ভগবৎ প্রেমের তপস্যার বেদী কিভাবে প্রস্তুত হইল, এই পল্লীসাহিত্য হইতে তাহা জানা যায়। মহাপ্রভু সেই দুশ্চর তপস্যার ফল। এদেশে আর্য্যশাস্ত্রের অনাবিল শুদ্ধি ও তপঃপ্রভাব এবং বঙ্গীয় জনসাধারণের অপূর্ব্ব প্রেম একত্র মিশিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল; পল্লীসাহিত্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গ ছুঁইতে সচেষ্ট হইয়াছিল,—মহাপ্রভুর আবির্ভাবে—বাঙ্গলার মাটি প্রকৃতই স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। পল্লীসাহিত্য পাঠে দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী কবিরা বৈষ্ণব কবিদের ভিতরকার উপাদান গড়িয়া দিয়াছিলেন—সেই উপাদানে চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তিধর্ম্ম ও প্রেমের বৈকুণ্ঠের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন; এদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের মনের সে উপাদান নাই। সুতরাং চৈতন্য ধর্ম্মের সুধাস্বাদ বাঙ্গলার বাহিরে শীঘ্র উপলব্ধি হইবে না।

আমি এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল সংশোধন করিয়াছি। চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, কবিকঙ্কণ ও চন্দ্রাবতীর কাব্য হইতে অনেক নূতন তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছি এবং অপরাপর অনেক বিষয়ে পুস্তকখানির কলেবর পরিবর্ত্তন ও শ্রীবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এক কথার পঞ্চম সংস্করণে ও ষষ্ঠ সংস্করণে অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থকারের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই নূতন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই বৃহৎ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেও দীর্ঘকালব্যাপী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এক মহা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিল। এইজন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও সাফল্যের সহিত অভীপ্সিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এই সময় একদিন সরস্বতী প্রেসের অফিসগৃহে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের নিকট আমি কথাচ্ছলে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই পুস্তক মুদ্রণের সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণের সাগ্রহ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বাংলার জাতীয় সম্পদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্যম প্রগতিশীল গ্রন্থব্যবসায়ীর উপযুক্তই হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণের ন্যায় নূতন সংস্করণেরও সমস্ত প্রুফ আমি আদ্যন্ত সংশোধন করিয়াছি। তাড়াতাড়ি ছাপাইতে গিয়া পূর্ব্ব-সংস্করণে যে-সকল ভুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, এইবার সেগুলি অনেকটা সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে এই পুস্তকে যাহা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, মূলের সহিত মিলাইয়া সেই সকল অংশ যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ণাশুদ্ধি বা তজ্জাতীয় অন্যান্য ভুল হইতে নূতন সংস্করণটিকে মুক্ত করিবার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাত্র ২।১ স্থলে পুস্তকের অন্যান্য অংশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যৎসামান্য পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকারের মতের উপর কোথাও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ মাত্র একটি জায়গায় একটি ক্ষুদ্র পাদটীকা যোগ করা হইয়াছে, ইহাও পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিলে ভাল হইত। বর্ত্তমান সংস্করণ যে পূর্ব্ববর্তী সংস্করণেরই প্রায় অবিকল পুনর্মুদ্রণ, ইহা স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্যই উপরিউক্ত সামান্য পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের কথা উল্লেখ করিলাম। মুদ্রণের পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম.

এ., ডি. লিট. (প্যারিস) মহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত 'পরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণের শেষভাগে সংযোজিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যেসকল ভুল প্রমাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কোন কোনটির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগিতা সত্ত্বেও আমার অসাবধানতা বা অজ্ঞতা বশতঃ যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে তজ্জন্য সমস্ত দায়িত্ব অঙ্গীকার করিয়া পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরিশিষ্টের কোন কোন স্থলে যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অবশ্য গ্রন্থকারের স্বকীয় মত রূপে গ্রহণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া অনেকে যাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, গ্রন্থকার স্বয়ং সে সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের নূতন সংস্করণের জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে পরিশিষ্ট লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশিত হইলে তাঁহার সর্ব্বশেষ অভিমতের সহিত পাঠকগণের পরিচয় ঘটিবে।

গ্রন্থকারের দেহত্যাগের পর যে দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও তৎসম্পর্কিত কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে যে কয়েকটি গ্রন্থ, নিবন্ধ এবং প্রাচীন পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ছাত্র ও অন্যান্য পাঠকগণের কাছে সেগুলি সুপরিচিত, এইজন্য পরিশিষ্টে সেগুলির উল্লেখ অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যে দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা, এবং পক্ষপাতিত্বদোষশূন্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় নূতন নূতন মতবাদের সত্যতা বা ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, আমাদের ধৈর্য্য সহকারে তাহার অপেক্ষাধীন হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। পরিশিষ্টে একটি আবশ্যক তথ্যের উল্লেখ করা হয় নাই। গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত শুশুনিয়া-লিপিকে বাংলার প্রাচীনতম লিপি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত মৌর্য্যযুগের যে-লিপি পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা শুশুনিয়া লিপি হইতে অন্যূন পাঁচ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন এবং এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে অতীতযুগের যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীনতম (Epigraphia Indica, Vol. XXI)। দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত বাণগড়ে খৃঃ পূঃ ১ম এবং খৃঃ ১ম, ২য়, ও ৩য়

শতাব্দীর লিপিরও কিছু নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন (Excavations at Bangarh, Asutosh Musuem, Memoir No I, University of Calcutta)। এই সঙ্গে গ্রন্থের ১ ও ২ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত পাদটীকার প্রতিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই পাদটিকায় সেন্সস রিপোর্ট হইতে যে-সকল তথ্য সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহা কথঞ্চিৎ পূর্ণাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী দুইটি সেন্সস রিপোর্টের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। ১৯৩১ সনের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৫১,০৮৮,৮৮৪ এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩৮,০৮,১০০ জনের ভাষা বাংলা। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ, প্রতি দশ হাজারে বাংলা দেশে ৯,২২৬ জন, আসামে ৪,২৮৯ এবং বিহার ও ওড়িষ্যায় ৪৫৮ জনের ভাষা বাংলা। আর ভারতবর্ষে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ২,০৪১ জন পাশ্চাত্য হিন্দী, ৭৯৭ বিহারী, ৫৭ আসামী, ১,৫২৫ বাংলা, ৭৫২ তেলেগু, ৫৮২ তামিল, ৩১৯ ওড়িয়া, ৩১০ গুজরাটী, ৫৯৬ মারাঠি এবং ২২৪ জন প্রাচ্য হিন্দী ভাষা কথনশীল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১৫ জনের মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৪১ সনের রিপোর্ট অনুসারে বাংলার লোকসংখ্যা ৬১,৪৬০,৩৭৭।

দুঃখের বিষয় নূতন সংস্করণে বহু চিত্রই বর্জ্জন করা হইয়াছে। এই চিত্রগুলি গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম ও কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অনুসন্ধানের ফলে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চিত্রগুলির কোন কোনটি অন্যান্য লেখক তাঁহাদের পুস্তকে প্রকাশ করিলেও গ্রন্থকারের নিজগ্রন্থে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইল না বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমাদের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও অনিবার্য্যকারণে গ্রন্থপ্রকাশ বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থের মূলভাগ কয়েকমাস পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শব্দসূচী, সূচীপত্র ও অবশিষ্টাংশ প্রস্তুত করিতেই বাকী সময় লাগিয়াছে। নূতন সংস্করণের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় নূতন করিয়া সূচীপত্র ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের পৌত্রী কুমারী জয়শ্রী সেন, পৌত্র শ্রীমান্ নবেন্দু সেন ও তৃতীয় পুত্রবধূ শ্রীমতী বেলা দেবী শ্রদ্ধার সহিত এই পরিশ্রমসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি. আর. এস. দুই একটি পৃষ্ঠার প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বিপিন বিহারী ত্রিবেদীর সাহায্যে চাঁদকবির রচনা হইতে উদ্ধৃত অংশ সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সরস্বতী লাইব্রেরীর প্রাক্তন কর্ম্মী শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি. এস-সি., বি. টি.র নিকট যে সৌজন্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি, তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

বিনয়চন্দ্র সেন।

গ্রন্থকারের জীবনী

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে ৬ই নভেম্বর তারিখে (শকাব্দ ১৭৮৮, ১৭ই কার্ত্তিক) শুক্রবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বগ্‌জুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার প্রপিতামহ ৺রাজচন্দ্র সেন বৈদ্যজাতির অন্যতম মূলকেন্দ্র খুলনা জেলাস্থিত পয়োগ্রাম ত্যাগ করিয়া ঢাকা জেলায় সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। অল্পবয়সে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে, ইঁহার বিধবা পত্নী রঘুনাথ ও রমানাথ—এই দুইটি পুত্রসন্তান সহ পিতা ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে উক্ত গ্রামে অবস্থান করেন। রঘুনাথের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের পিতা। অল্পকালের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বৈদ্যবংশের যশঃ ও প্রতিপত্তি সুয়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনাথ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি কবিরাজী ব্যবসায়ের সহিত স্বগৃহে একটি মথ্‌তব স্থাপন করেন। গ্রামের বহু তরুণ বালক তাঁহার কাছে ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রঘুনাথের ভ্রাতা রমানাথ পুলিশ বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি খুব ভাল ছবি আঁকিতে পারিতেন বলিয়া গ্রামে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার অঙ্কিত ছবি গ্রামস্থ বহু গৃহে সম্মানের সহিত রক্ষিত হইত। দীনেশচন্দ্র ইঁহার স্বহস্তলিখিত 'কামিনীকুমার' নামধেয় পুস্তকের পুঁথির কথা আত্মজীবনী 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুঁথির অক্ষর মুদ্রিত অক্ষরের ন্যায় নিখুঁত ও সুন্দর—ইহাতে রমানাথ-অঙ্কিত বহু ললিতচিত্র সংযোজিত ছিল। ইনি তন্ত্রাচারে দীক্ষিত ছিলেন। একদা গভীর নিশীথে শ্মশানে শবাসীন হইয়া যোগাভ্যাস কালে রমানাথ সহসা চেতনাহীন হইয়া পড়েন—পরে তাঁহার আর জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই। রমানাথের চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা যেরূপ এই বংশের ললিতকলা-অনুশীলনের পরিচায়ক, দীনেশচন্দ্রের পিতামহ রঘুনাথের বৃক্ষ-বাটিকা রচনায় বিশেষ আগ্রহ সেইরূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কার্য্য তিনি কেবল অবসর-বিনোদনের উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। ভাল ভাল ফুল ও ফলের গাছের দিকে ইঁহার যেরূপ দৃষ্টি ছিল, সচরাচর তাহা দেখা যাইত না। বহু চেষ্টায় ইনি যে বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহার খ্যাতি এখনও গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়।

দীনেশচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সুয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবে মাতৃহীন হন। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে ইনি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও সরকারী উকিল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সীর কন্যা রূপলতা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা পিতার মধ্যস্থতবে সম্পন্ন হইলে ইনি ঢাকা সহরে আসিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্র রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার মতবাদে আকৃষ্ট ও অনুরাগী হন। ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ইনি ঢাকায় প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। ইনি সরস্বতীকে আবাহন করিয়া সাহিত্যিকজীবনের প্রারম্ভ সূচনা করিয়াছিলেন। সরস্বতী বিষয়ক কবিতা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি হিন্দুর বিগ্রহ পূজা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার লিখিত 'সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটক' প্রকাশিত হয়—এই গ্রন্থে ইনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিগ্রহোপাসনার ব্যর্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সহিত সকলের ঐক্য না থাকিলেও, সমসাময়িক বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্রের যে বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ঐ বৎসর তাঁহার অপর গ্রন্থ 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের আত্মজীবনী হইতে জানা যায় যে ইনি দিনাজপুর জেলার একখানা নাতিক্ষুদ্র ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা মুদ্রিত হয় নাই। সেকালে "ইংলিশম্যান" প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ইনি ব্রজসুন্দর মিত্র ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান সহায়ক ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে ঈশ্বরচন্দ্রের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা শুনা যাইত। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার গ্রাহক হইবার সময় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দীনেশচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুগণের মধ্যে "সদ্ভাবশতকের" কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও "সীতার বনবাসের" কবি হরিশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

শুধু বক্তা ও লেখক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন নাই। ইনি প্রথমে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

নিযুক্ত হন এবং বহু-প্রশংসিত যোগ্যতার সহিত অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই বিদ্যালয়টি ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচালনায় জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। 'স্ট্যাটুটারী' সিভিলিয়ান 'কেদারনাথ রায়, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রশেখর কালী, গৌহাটী কোর্টের উকিল অম্বিকাচরণ সেন, বাঁকীপুরের উকিল ব্রজেন্দ্র-কুমার দাস ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ইঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার দাস ও হরিমোহন চক্রবর্ত্তী আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া পরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় হন।

দীনেশচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পরে ঈশ্বরচন্দ্র কমিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাণিকগঞ্জের কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি সরকারী উকিলের পদলাভ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিকগঞ্জ সাবডিভিসন হইতে কতকগুলি বড় বড় গ্রাম পৃথক হইয়া যাওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হইল। শেষ জীবনে ইঁহাকে অর্থকষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ভাদ্র দীর্ঘকাল 'বহুমূত্র' রোগে ভুগিয়া ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে দেহত্যাগ করেন।

দীনেশচন্দ্র অল্পবয়সে তিনটি প্রধান বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিগ্রহপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নিজের ছেলেটিকে তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। মাতা রূপলতা শাস্ত্রীয় পূজা অর্চ্চনায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও নিজগৃহে তিনি বৎসর ভরিয়া হিন্দুর সমস্ত পূজা-পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি প্রাণপণে একমাত্র পুত্রটিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বিবাহের পরে কয়েক বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন ও অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়কার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে গিয়া দীনেশচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে (ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, ৪২—৪৩ পৃ.) পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "আমার পিতা শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়াও তাঁহার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বশুরের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইয়া একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। তিনি কোন ঠাকুর দেবতার নিকট মাথা নোয়াইতেন না, কোন যাত্রা বা কবিগানের আসরে উপস্থিত হইতেন না, কোন পূজা বা উৎসবে যোগ দিতেন না। কবির

দলে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া গাইত, খেম্‌টা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাৎ করিয়া দিত। সেই আসর কখনও ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া যাইত ; কথকতা ও কীর্ত্তন শুনিয়া লোকেরা যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিত ; তখন এমনই দান ছিল ! কিন্তু আবার কখনও অতি কদর্য্য বিকৃত রুচির গান— —যাহার নাম ছিল "লাল" তাহা ছেলে ও বুড়োতে একত্র হইয়া শুনিত। ভোলা ময়রা ও গোপাল উড়ের কথা কে না শুনিয়াছে ? এই তো যুগ ! শিক্ষিত আধুনিকতন্ত্রী যুবকেরা কবি ও যাত্রার প্রতি যেরূপ বিমুখ ছিলেন, কীর্ত্তন ও কথকতার প্রতিও সেইরূপ বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা এ সমাজের ভালমন্দ উভয়ের দিকে চাহিতেন না ; আত্মনিষ্ঠ, স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংশয়,— ভাবের শুষ্ক এক ব্রহ্মডাঙ্গায় বসিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন। আমার মাতুলেরা আমার পিতাকে আমোদ উৎসবের আসরে টানিয়া আনিতে পারিতেন না, তাঁহাদের চেষ্টার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে অর্গল বন্ধ করিয়া ফেলিতেন।" অন্যত্র (পৃ. ৫০) তিনি লিখিয়াছেন : "তিনি সর্ব্বদাই থিওডোর পার্কারের কথা লইয়া থাকিতেন, মক্কেলের কাজের দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার আদর্শ জীবন ছিল সচ্চরিত্র দরিদ্রের জীবন। বড় লোকদিগের ব্যভিচার-দুষ্ট সংসর্গ তিনি ঘৃণা করিতেন।" পারিবারিক ক্ষেত্রে এই ধর্ম্মসংঘর্ষ কিরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৮৫) : "বাবা আমাকে কাছে বসাইয়া উপাসনাপদ্ধতি শিখাইতেন। ঠাকুর দেবতা যে কিছুই নয়, তাহা বুঝাইতেন, 'একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর—তাঁহার রূপ নাই। ছেলেরা যেমন পুতুল লইয়া ভাবে ইহারাই,—কাঠ, পাথর ও মৃন্ময় বিগ্রহ লইয়া তেমনই লোকে ভাবে ইহারাই দেবতা। ছেলেরা যেমন পুতুলের বিয়ে দেয় ইঁহারা তেমনিই পুরাণ রচনা করিয়া এই সকল কাঠ পাথরের মূর্ত্তিসমূহের জন্ম হইতে সুরু করিয়া বিবাহাদি সমস্ত বিষয়ে গল্প রচনা করিয়া পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' পিতা যখন একা আমায় লইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তখন মা হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত উপদেশ ওলট পালট করিয়া দিয়া পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন।"

দীনেশচন্দ্রের মাতামহ গোকুল মুন্সীর প্রাসাদোপম গৃহের সাড়ম্বরে যাত্রা, কথকতা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু অনুষ্ঠানের তরঙ্গ নিত্য প্রবাহিত হইত। এই সব ব্যাপারের মধ্যে অনেক কিছু দেখা যাইত যাহা নব শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চক্ষে রুচিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু দীনেশচন্দ্র

উত্তরকালে বঙ্গসাহিত্য ও সমাজের যে চিত্র তাঁহার বহু গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন, শৈশব ও বাল্যের এই অভিজ্ঞতা এই সকল অনুষ্ঠানের বাস্তব রূপ অনুভব করিবার পক্ষে তাঁহাকে সুযোগ দিয়াছিল বলিয়া তাহার একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে।

পাঠ্যাবস্থায় দীনেশচন্দ্র খৃষ্টান মিশনারীদের গণ্ডীর মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ "এপিফ্যানী"তে প্রকাশিত হইবার সময় এই পত্রিকার সম্পাদক স্মিথ সাহেব তাঁহার সহিত ঢাকায় আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার চ্যাপলেন ইলিয়ট সাহেব দীনেশচন্দ্রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে, প্রধান বিশপ ঢাকায় উপস্থিত হইলে ইঁহার সহিত দীনেশচন্দ্রকে পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় দীনেশচন্দ্রের শৈশব শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি বিধবা ভগিনী দিগ্বসনী দেবীর সাহায্যে সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে তিনি এই ভগিনীর কাছে বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন; ইঁহার মুখে পুরাণের গল্প ও ব্যাখ্যা শোনা শিশু দীনেশচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। দিগ্বসনী দেবী বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করিতে ভালবাসিতেন, শৈশবে ইঁহার মুখে দীনেশচন্দ্র বৈষ্ণব গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যা শেষ করিয়া দীনেশচন্দ্র মাণিকগঞ্জে চলিয়া আসেন এবং স্থানীয় "মাইনর" স্কুলে ভর্তি হন। কিছুকালের জন্য পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—পরে ওকালতি ব্যবসা করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার কাছে দীনেশচন্দ্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং ইনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গান তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। "মাইনর" স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে প্রসন্ন গুহ, শশী নিয়োগী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বে ১২ বৎসর বয়সে তিনি কুমিল্লা কালেক্টরেটের হেড ক্লার্ক উমানাথ সেন মহাশয়ের সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের উদ্বোধন হয় মাত্র ৭ বৎসর বয়সে।

তাঁহার প্রথম কবিতা "সরস্বতী স্তব" এই বয়সে রচিত হয়। ইহাব পর তিনি প্রায়ই কবিতা লিখিতেন। এই সময়ে নান্নার হইতে প্রকাশিত "ভারত সুহৃদ্" পত্রিকায় তাঁহার রচিত "জলদ" নামক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। "মাইনর" স্কুলে অধ্যয়নকালে দীনেশচন্দ্র গভীর উৎসাহের সহিত বঙ্কিম, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের গ্রন্থরাজি পাঠ করিতেন। এই সময় কবি দীনেশ বসুর "কবিকাহিনী" তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজি সাহিত্যের দিকে তাঁহার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। যে সময়ে তিনি বঙ্কিম, হেমচন্দ্রের লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন সেই সময়ে বায়রণের "চাইল্ড হেরল্ড," "ডন জুয়ান" তাঁহার কবিকল্পনাকে অনুপ্রেরণা দান করিতেছিল। মাত্র ১০ বৎসর বয়সে একজন সহাধ্যায়ীর সহিত আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে তিনি যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে (১৩৫ পৃ.): "দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া—জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ বলিল, 'আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ঘুরিবে, আমরা বড় জামিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।' আমি বলিলাম, 'আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়েঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়েঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন।' তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন, বাল্যকালের এই সঙ্কল্প তখনও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। এই সময়ে তিনি একটি নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে কার সাধ্য?'

মাঝখানে একবার তাঁহার বাগ্মী হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পর ইনি প্রায়ই দাসোড়া গ্রামের খালের পারে সন্ধ্যাকালে একা একা বেড়াইয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিতেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল কুমিল্লা এণ্ট্রান্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ লেখক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ইহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। "ছুছুন্দরী বধ" প্রণেতা জগদ্বন্ধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান এবং "গৌরপদতরঙ্গিণী" সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

দীনেশচন্দ্র ইহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং ইঁহার কাছে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনা করিয়া কাটাইতেন। নানা কারণে দীনেশচন্দ্র কুমিল্লা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল" হইতে ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তৎপর ঢাকা কলেজে "ইণ্টারমিডিয়েট" ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এল্. এ. (বর্ত্তমান কালের আই. এ. পরীক্ষার তুল্য) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

দীনেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে—পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় লেখক ও কবিদিগের রচনা পাঠে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। গণিত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার মোটেই প্রীতি ছিল না। সেই সময়ে এল্. এ. পরীক্ষায় Physics, Chemistry প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ও পাঠ করিতে হইত। পরীক্ষার দুইচারিদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিষয়ের বইগুলির অধিকাংশই তাঁহার পড়া থাকিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করা কিংবা তাহাতে কোনও প্রকার কৃতিত্ব দেখাইবার আগ্রহ তাঁহার কখনই ছিল না। কিন্তু দিবারাত্র বন্ধু মহলের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর ও উৎসাহপূর্ণ আলোচনায় তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। বাকী সময় কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়া, পাঠ্যপুস্তক হইতে বহুদূরে তিনি নিজেকে সরাইয়া রাখিতেন। ঢাকায় এই আলোচনাকেন্দ্রের যাঁহারা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ৺রামদয়াল মজুমদারের নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার, এম. এ. পি. আর. এস্. মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শিক্ষিত মহলে সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রর অনন্যসাধারণ অধিকার দেখিয়া তিনি তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং একবার আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "your little head is full of conceit." (তোমার ছোট মাথাটি অহমিকায় ভর্ত্তি)। দীনেশচন্দ্র নির্ভীক আত্মবিশ্বাসের সহিত তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেন এবং ছাত্রাবস্থায়ও কাহারও প্রভাবে নিজের মতামতকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। এইজন্যই অধ্যাপক মহাশয় এইপ্রকার উক্তি করিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজে এল. এ. পড়িবার সময় তাঁহার লেখা ইংরাজি প্রবন্ধ "Epiphany" কাগজে প্রকাশিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যিক অক্ষয় সরকারের সম্পাদিত "নবজীবন" পত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের "পূজার কুসুম" নামক কবিতা

প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়িবার সময় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল। কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি হবিগঞ্জ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া পত্নীসহ গ্রাম ত্যাগ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'Private' ছাত্ররূপে তিনি ইংরাজিতে 'অনার্স' সহ বি. এ. পাশ করেন। পরে হবিগঞ্জ স্কুল ত্যাগ করিয়া ইনি কুমিল্লায় শম্ভুনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং এইস্থানে কিছুকাল কার্য্য করিয়া স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" নামক একটি কবিতার পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার অল্পবয়সের অপর রচনা 'রেখা' কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি।

১৮৯১ খৃ. অ. হইতে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বাংলার সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ বৎসর তাঁহার লিখিত তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি 'জন্মভূমিতে' কালিদাস ও সেক্সপীয়র সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় জন্মান্তর বাদ বিষয়ে এবং তৃতীয়টি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৮৯১ খৃ. অ. ইনি এক মাসের জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকা কলেজে পাঠকালে দীনেশচন্দ্র মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের একখানি পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন; সেই সঙ্গে ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ফরাসী, জার্মানী ও রাসিয়ান সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকগণের গ্রন্থাবলীও যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুমিল্লায় অবস্থানকালে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে Peace Association হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দানের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি উক্ত রৌপ্যপদকটি লাভ করেন। "মৃগলুব্ধ" নামক গ্রন্থের একখানি প্রাচীন পুঁথি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার হাতে আসিলে

সর্ব্বপ্রথম পুঁথি সংগ্রহের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রায় ১০০ খানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতাস্থিত Asiatic Societyর সেক্রেটারী হর্নলি সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ইঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথি সংগ্রহ-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে তাঁহার নিকট কিছুকাল অবস্থানের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইনি মধ্যে মধ্যে ২।১ মাস গিয়া দীনেশচন্দ্রের সহিত একত্র পুঁথি সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় দীনেশচন্দ্র স্বয়ং বিভিন্ন পল্লী হইতে অসংখ্য পুরাতন গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের কথা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণয়নের পূর্ব্বে তাঁহার এই অসীম পরিশ্রম ও অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারের বৃত্তান্ত তাঁহার এই পুস্তকের ভূমিকা হইতে অবগত হওয়া যায়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়নকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালে তিনি 'নবজীবন', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতির পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কুমিল্লার সিভিলিয়ান বরদা মিত্র সেই সময়ে স্থানীয় সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। ইঁহার সহিত দীনেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়। তাঁহার অপরাপর শিক্ষিত ও পদস্থ বন্ধুগণের মধ্যে প্রকাশচন্দ্র সিংহ, "ত্রিপুরার ইতিহাস" লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা স্কুলের হেডপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত শর্ম্মার কথা দীনেশচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠে বৈষ্ণব সঙ্গীত শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ইঁহাদের সাহায্যে তিনি কুমিল্লায় সাহিত্যিক আসর জমাইয়া রাখিতেন। অর্থ উপার্জ্জনের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তৎকালীন কুমিল্লা জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর দীননাথ সেনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করিবার মত যে কিছু আছে এবং তাহারও যে একখানি ইতিহাস লেখা যাইতে পারে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে এই ধারণা মোটেই ছিল না। দীননাথবাবু তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং একখানা ইংরাজীতে বই লিখিলে যাহাতে উহা পাঠ্য হয় এবং বহু অর্থ উপায়ের সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে—এই প্রলোভনজনক প্রস্তাব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সঙ্কল্পচ্যুত না

হইয়া কঠোর সাধনা, গভীর অনুরাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পর তিনি ম্যাজিস্ট্রেট গ্রীয়ার সাহেবের পরিচয়পত্রসহ ত্রিপুরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ইঁহার অর্থানুকূল্যে ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হওয়ামাত্র দীনেশচন্দ্রের নাম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং শিক্ষিত সমাজ তাঁহার এই গ্রন্থ জাতীয় সম্পদরূপে গ্রহণ করিলেন। এই পুস্তক লিখিতে গিয়া তাঁহাকে যে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে তিনি সহসা দুরারোগ্য মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং স্থির হইয়াছিল যে দীনেশচন্দ্র উহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এই ভয়াবহ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘকালের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীটে মাতুলগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ ও অন্যান্য সাহেবের সাহায্যে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি বিশেষ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহাকে আজীবন একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর কিছুকালের জন্য তিনি ফরিদপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্যামপুকুর স্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণয়নের পর দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে অভিনন্দনপূর্ণ পত্র লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানের সূচনা হইতে যাঁহাদের আন্তরিক সাহচর্য্য ও সর্ব্ববিধ উৎসাহ দান তাঁহার পরম প্রীতিদায়ক হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত (ডক্টর) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত দীনেশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় হয়। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ

হইতে তিনি বাগবাজারস্থিত নিজগৃহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গালা ১৩১০ সনে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) দীনেশচন্দ্রের "রামায়ণী কথা" পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার লিখিত 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'জড়ভরত, 'ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ' প্রভৃতি 'পৌরাণিক' সাহিত্যমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি 'রীডার' নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা 'History of Bengali Language and Literature' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস লেখকের খ্যাতি এতকাল প্রধানতঃ বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রসমূহে তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী ও আমেরিকার বহু পত্রিকায় তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশীয় বহু মনীষী এই মত প্রকাশ করিলেন যে অন্য কোন ভারতীয় লেখক দেশীয় সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে এই প্রকার উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহিত এই সূত্রে তাঁহার যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ গভীর অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছিলেন তাহা একত্র প্রকাশিত হইলে বৃহৎ আকার ধারণ করিবে।

'History of Bengali Language and Literature' প্রকাশিত হইবার পর পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহার পর দীনেশচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তি "Typical Selections from old Bengali Literature" দীর্ঘ ইংরাজি ভূমিকাসহ দুই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। যে সময় দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তৎপূর্ব্বে "ভারতী" ও "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা পরিচালনায় তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করিতেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেনেটের" সদস্যপদে মনোনীত হন এবং বিশ বৎসরকাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুনর্ব্বার

'রীডার' নিযুক্ত হইয়া তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে 'Mediæval Vaishnava Literature' নামক গ্রন্থ এবং পরে রামতনু লাহিড়ী ফেলোরূপে 'Chaitanya and his Companions', 'Folk literature of Bengal', Bengali Ramayanas', 'Glimpses of Bengal', 'Chaitanya and his Age', 'Bengali Prose Style, প্রভৃতি ইংরাজি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব রসসাহিত্যের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কতকগুলি নূতন ধরণের পুস্তক রচনা করেন। ইহাদের নাম, 'রাগরঙ্গ,' 'রাখালের রাজগী', 'মুক্তাচুরি,' 'কানুপরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা', 'সুবল সখার কাণ্ড', 'ভয়ভাঙ্গা'। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের পাঠোপযোগী দুইখানি মৌলিক গল্পের পুস্তক—'সাঁঝের ভোগ' ও 'বৈশাখী' এবং 'নীলমাণিক', 'ওপারের আলো,' 'চাকুরীর বিড়ম্বনা', 'আলোকে আঁধারে' এই চারখানি উপন্যাস এবং মেয়েদের জন্য 'গৃহশ্রী' ও 'গায়ে হলুদ' এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ 'বৈদিক ভারত' ও 'সরল বাঙ্গালা সাহিত্য' এই সময়কার রচনা। দীনেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'তিনবন্ধু' কলিকাতায় আগমনের ২।৩ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। উপরিলিখিত ইংরাজি গ্রন্থগুলির মধ্যে 'Chaitanya and his Age' এর ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এবং Mediæval Vaishnava Literature এর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়নের জন্য নূতন বিভাগ খোলা হয়। এই নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও তৎসংযুক্ত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের পরামর্শ ও সর্ব্ববিধ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই এই বিভাগের কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "রামতনু লাহিড়ী" ও ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াও দীনেশচন্দ্র এক মুহূর্ত্তও তাঁহার গবেষণা ও লেখনী-পরিচালনা বন্ধ করেন নাই। মৈমনসিং জেলা হইতে প্রকাশিত "সৌরভ" পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি পল্লীগীতিকার বিক্ষিপ্ত পদ ও তৎসম্বন্ধীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে'র লিখিত দুএকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইনি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং স্যার আশুতোষের সাহায্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে,

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এবং কবি জসীমউদ্দীনকে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত পল্লীগীতিকা সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের সংগৃহীত বহু পল্লীগীতিকা একত্র করিয়া তৎসম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ৮ খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি পাশ্চাত্য জগতের হাতে পৌছিলে বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের ভূয়সী প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। গীতিকাগুলি সম্বন্ধে এক প্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক লিখিয়াছেন ঃ "মেটারলিঙ্কের নাটকে ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি একেবারে নিখুঁত।" পল্লীগীতিকা সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্রের চেষ্টায় বাঙ্গালা গভর্নমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ও ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড দীনেশচন্দ্রের 'Eastern Bengal Ballads' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোঁলার ভগিনী দীনেশচন্দ্রের এই পুস্তকগুলি হইতে কয়েকটি পল্লীগীতিকা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দীনেশচন্দ্রের ভূমিকাসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীনেশচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "বৃহৎ বঙ্গ" পুস্তক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের পত্রসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এই গ্রন্থে প্রাচীনতম কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য, কলাশিল্প, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের একটি বিস্তৃত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজি কি বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার এইরূপ বিস্তৃত ইতিহাস আর লিখিতে হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গের বহু অখ্যাত পল্লী হইতে শুধু যে অসংখ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বাঙ্গালার শিল্পচর্য্যার পরিচায়ক বহু প্রাচীন নিদর্শন একত্র করিয়া স্বগৃহে একটি 'মিউজিয়ম' স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপ স্বয়ং এই 'মিউজিয়ম' দেখিয়া প্রীত হইলে দীনেশচন্দ্র ইহার অধিকাংশ তাঁহাকে উপহার দেন। সম্ভবতঃ এই উপকরণগুলি লইয়া ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় একটি বৃহৎ 'মিউজিয়ম' স্থাপিত হইবে। দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী, মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ "আশুতোষ মিউজিয়মে"

দান করিয়াছেন। 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রণয়নের পর "শ্যামল ও কজ্জল" (ঐতিহাসিক উপন্যাস), 'কিশোর গৌরাঙ্গ' (নাটক) ও 'পদাবলী মাধুর্য্য' প্রকাশিত হয়। 'পুরাতনী' (মুসলিম নারীচিত্র) তাঁহার এই সময়কার রচনা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'রীডার'রূপে আহূত হইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যে মুসলমানের অবদান সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি দুইখানি পুস্তক লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রথমখানি পল্লীসাহিত্য সম্বন্ধে—ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু এখনও মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'বাংলার পুরনারী'। এই বইখানির শেষ পৃষ্ঠার প্রুফ তিনি যে দিন দ্বিপ্রহরে সংশোধন করিলেন সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁহার পীড়ার সূচনা হইল এবং এই পীড়া দশদিন স্থায়ী হইয়া তাঁহার জীবননাশ করিল। মৃত্যুর দুই মাস পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত শিশুদের জন্য একটি অসম্পূর্ণ রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বহু মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে তাঁহার অসংখ্য পুস্তক ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলে কতিপয় গ্রন্থের সৃষ্টি হইতে পারে। উপরে যে সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ বাকী আছে। তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' মৌলিক গবেষণামূলক ভূমিকাসহ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। 'সুকথা' নামক পুস্তকে তাঁহার লিখিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং বা অপরের সহযোগিতায় তিনি 'হরিলীলা', 'গোপীচন্দ্রের গান', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী,' 'গোবিন্দদাসের কড়্চা,' 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতি প্রাচীন রচনা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্যার আশুতোষের জীবনী—"আশুতোষ স্মৃতিকথা" এবং পরীক্ষার্থী-দিগের সুবিধার জন্য "ভাষা প্রবেশিকা" ও "রচনা প্রবেশিকা" (ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়) প্রণয়ন করেন।

আর একটি পুস্তক 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' (১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনের বহু কথা লিখিত আছে এবং পারিপার্শ্বিক বহু ঘটনা, আন্দোলন ও বন্ধুবর্গ আত্মীয়স্বজনের কথা ইহার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দীনেশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

হইলে এই পুস্তক ও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'Asiatic Review' পত্রিকায় তাঁহার যে জীবনী বাহির হইয়াছিল তাহা অপরিহার্য্য।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব প্রিন্স অফ ওয়েলস্ (ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ অষ্টম এডোয়ার্ড) যখন ভারত পরিভ্রমণ করেন, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ও তৎসঙ্গে যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে "ডক্টর" উপাধি দিয়াছিলেন —দীনেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই উপলক্ষ্যে 'Doctor of Literature' (ডি. লিট) উপাধি লাভ করেন। গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননী সভার মহামহোপাধ্যায়গণের নিকট হইতে তিনি 'কবিশেখর' এবং ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে 'প্রত্নতত্ত্বভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী" পদক প্রদান করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যখন দীনেশচন্দ্র 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' প্রধান সভাপতিরূপে রাঁচিতে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন হইতে 'রক্ত আমাশয়' রোগের উৎকট উপসর্গ দেখা দেয়। এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুদিনের পুরাতন ব্যাধি 'বহুমূত্র'ও তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং ২০শে নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সন্ধ্যা ৭॥০টার সময়ে তিনি বেহালাস্থিত 'রূপেশ্বর' ভবনে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছয় পুত্র, চারি কন্যা এবং বহু পৌত্র পৌত্রী ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ

অষ্টম অধ্যায় ঃ

নবম অধ্যায় ঃ



দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬—১৯৩৯

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সৌজন্যে

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ বৎসরেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

বঙ্গভাষা[১] কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্ম্মবীর কি কর্ম্মবীরের আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ কি শতাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন; কিন্তু ভাষার উৎপত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কোন কোন লেখক এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য বলিয়াছেন, **'১০০০ বৎসর হইল, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের স্বষ্টি হইয়াছে।'** ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহাত খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের কথা। বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৯৩০ শকের হাতের লেখা একখানি কাশীখণ্ড আমরা দেখিয়াছি।

---

১. শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ সাহেব ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাসমূহের (লোকসংখ্যা-সমেত) নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শ্রেণী :
- সিন্ধী (২,৫৯০,০০০)
- কাশ্মীরী (৪,০৯০,০০০)
- পশ্চিম পাঞ্জাবী (৩,০০০,০০০)

খ। মধ্য-ভারতীয় শ্রেণী :

(অ) পশ্চিমাংশ—
- পূর্ব্ব পাঞ্জাবী (১৪,৭২০,০০০)
- গুজরাতী (১১,০৬০,০০০)
- রাজপুতানী (১৩,১৫০,০০০)
- হিন্দী (৩৫,৮২০,০০০)

(আ) উত্তরাংশ—
- মধ্যবর্ত্তী (পাহাড়ী ১,১৫০,০০০)
- নেপালী (৩,০২০,০০০)

গ। পূর্ব্ব-ভারতীয় শ্রেণী :

(অ) পূর্ব্বমধ্য—
- বৈশবারী (২০,০০০,০০০)
- বিহারী (৩০,০০০,০০৫)

(আ) দক্ষিণাংশ—
- মরাঠী (১৮,৯৩০,০০০)

(ই) পূর্ব্বাংশ—
- বাঙ্গালা (৪১,৩৪০,০০০)
- আসামী (১,৪৪০ ০০০)
- উড়িয়া (৯,০১০,০০০)

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষাকথনশীল লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২০৯,৩২০,০০০।

—এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ বেঙ্গল জারন্যাল্ নং ৬৪,১৮৯৫।

উহার অক্ষর 'কুটিল' অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি। সেনরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে ঐরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; উহা ন্যূনাধিক ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সকল লিপিমালার পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব, বঙ্গাক্ষরমালা ও তাহাদের আদি জননী ব্রাহ্মীলিপি বহু প্রাচীন। তাহাদের আদি খুঁজিতে যাইয়া ইতিহাসের অনধিগম্য গোমুখীর গহ্বর হইতে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ভারতীয় অক্ষরসম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

ভারতবর্ষীয় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর গ্রীকদিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত। সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য শাব্দিক সূত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে না বলিয়া, অনেকেই উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর ফিনিসিয়ান্ অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, অশোকলিপির সহিত ফিনিসিয়ান্ অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। টেলর্ প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত বলেন, ভারতবর্ষীয় লিপি সেবিয় (Sabaean) লিপির অনুরূপ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; সুতরাং

ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরের ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে ভারতবর্ষের প্রচলিত আর্য্যভাষাসমূহের নিম্নলিখিত তালিকা দিতেছি:—

পূর্ব্বভারতীয়—বাঙ্গালা	…৪৯২৯৪০৯৯	মধ্যভারতীয়—প্রাচ্য হিন্দী	… ১৩৯৯৫২৮
উড়িয়া	…১০১৪৩১৫৬	পাশ্চাত্য হিন্দী	… ৯৬৭১৪৩৬৯
আসামী	…১৭২৭৩২৮	রাজস্থানী	… ১২৬৮০৫৬২
বেহারী	…৭৩৩১	গুজরাতী	… ৯৫৫২০০০
		পাঞ্জাবী	… ১৬২৩৩৫৯৬
		ভিলী	… ১৮৫৬১১৭
উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়—পাশ্চাত্য		পার্ব্বতীয় শাখা	১৯১৮০০০
পাঞ্জাবী	৫৬৫২২৬৪	জিপ্সি ভাষাসমূহ	১৫০০০
সিন্ধী	৩৩৭১৭০৮		
পশ্চিম ভারতীয়—ইরাণী শাখা	১৯৮১০০০	বাঙ্গালা-ভাষা—পুরুষের সংখ্যা	২৫২৩৯৪৭৬,
দার্দ্দি শাখা—সিনা	২৮০০০	স্ত্রীলোকের সংখ্যা	২৪০৫৪৬২৩।
কাশ্মীরী	১২৬৮০০০	ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষাকথনশীল	
দক্ষিণ ভারতীয় মরাঠী	১৮৭৯৮০০০	লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত	২২৯৫৬০৫৫৫।

তাহা হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এজন্য এই অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। টেলর্ সাহেব স্বয়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি বলেন, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয়ত ওমান্, হাড্রাম, অর্‌মা, সেবা কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পারে। টেলরের মতে দক্ষিণ সেমিটিক্ প্রদেশে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম, কিন্তু ওয়েবার ও বুহ্‌লারের মতে উত্তর সেমেটিক্ প্রদেশ হইতে উহা উদ্ভূত হইয়াছে, উক্ত প্রদেশান্তর্গত মোয়াবের রাজা মেশার প্রস্তরলিপি এবং সিঞ্জিরিলি ও এসেরিয়া রাজ্যের কতকগুলি উৎকীর্ণ লিপির সঙ্গে তাঁহারা ব্রাহ্মীলিপির বিশেষ সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তর সেমিটিক্ প্রদেশের এই লিপিমালা ৮৫০ খৃঃ পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত। কানিংহাম এবং টমাস্ এই মতের বিরোধী; তাঁহারা বলেন, সেমিটিক্ বা ফিনিসিয়লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইয়া থাকে। অশোকলিপির অতি সামান্য অংশ ঐ রীতিতে লিখিত। কিন্তু সমস্ত ভারতীয় লিপি বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হয়। অশোকলিপিরও এই নিয়ম; সামান্য কয়েক স্থানে যদি অন্যরূপ রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ নিয়মের বাদ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ইহা প্রমাণিত না হইবে, যে কোনও পূর্ব্বতন সময়ে ব্রাহ্মী বা অশোকলিপির দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হওয়ার রীতি বিদ্যমান ছিল, সে পর্য্যন্ত উহা সেমিটিক্ বা ফিনিসিয়লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এরূপ স্বীকার করা যাইবে না। এই মত বুহ্‌লার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত এরাণের একটি উৎকীর্ণ লিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মীলিপি পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। তিনি অশোকলিপির অনেকগুলি অক্ষর যে উল্টাভাবে লিখিত আছে—তাহা তাঁহার অনুশাসন হইতে দেখাইয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর ছাড়া ও অশোক অনুশাসনের সংযুক্ত অক্ষরের অনেকগুলিই যে দক্ষিণ হইতে বামে গতির শেষ নিদর্শন তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। সিংহলের অনেক ব্রাহ্মীলিপিতে এরূপ প্রাচীন ধারার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এক সময়ে যে ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষে উল্টা দিকে লিখিত হইত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; টমাস্ ও কানিংহামের বিরুদ্ধযুক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িল,—তাহা আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশই এখন

বুহ্‌লারের মতাবলম্বী, অর্থাৎ ভারতীয় লিপি উত্তর সেমিটিক্ দেশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এই মতও যে সমীচীন নহে, তাহা আমরা পরে প্রতিপন্ন করিব।

অধ্যাপক ডসন্, টমাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় অক্ষরমালার জন্য অন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহে। ডসন্ লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাঁহাদের নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা সংখ্যাবোধক-চিহ্ন গঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্য-সাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" কানিংহাম্ সাহেবও এই মতাবলম্বী। তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের অক্ষর মিসর-দেশীয় চিত্রাক্ষরের ন্যায় একই প্রণালীতে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তদনুসারে তিনি—



... (পালির 'খ') ... খননের যন্ত্র (কোদাল) হইতে,
... (অন্তঃস্থ 'য') ... যব হইতে,
... ('দ') ... দন্ত হইতে,
... ('প') ... পাণিতল হইতে,
... ('ব') ... বীণা হইতে,
... ('ল') ... লাঙ্গল হইতে,
... ('হ') ... হস্ত হইতে,
... ('শ') ... শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে,

এইভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা দ্রব্যবিশেষ হইতে অনুকৃত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের ঐতিহাসিক মূল্য কি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে কিছু কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বলেন, ভারতীয় লিপিমালা বিদেশ হইতে আনীত, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এতদ্দেশের প্রাচীনতম লিপি (অশোকলিপি) এত সুন্দর

ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব।

ও সুগঠিত[১] যে, উহা যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভারতীয় আদিম লিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোকলিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্যই রহিয়া যাইত; কারণ, আদিম লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুগঠিত অশোকলিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে সূচিত রহিয়াছে। সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভাষাবিজ্ঞানের উপযোগী নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অশোকলিপির প্রারম্ভ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞানের অনুযায়ী নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ। এই পূর্ব্বোক্ত পরিণতিপ্রাপ্তির আরম্ভসূচক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমালা গ্রহণ পূর্ব্বক উহা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, অশোকলিপি নানা দূরবর্ত্তী প্রদেশে একই প্রকার দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশপ্রচলিত লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ হইত।

উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম স্থানে পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন কীর্ত্তির উপর এরূপ

১. "The elaborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientific excellence. Bold, simple, grand, complete—the characters are easy to remember, facile to read and difficult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of Sanrkrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artificial alphabets which have been proposed by modern phonologists excel it in delicacy, ingenuity, exactitude and comprehensiveness."

Isaac Taylor, *The Alphabet*, Vol. II, p. 289.

অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। সহসা কোন রাষ্ট্রবিপ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌরব চিহ্ন নষ্ট হয়, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ; অন্ততঃ সেরূপ আকস্মিক উৎপীড়নে দেশের সমস্ত কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও হিউএনসাঙ্ যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কয়টি এখন বর্ত্তমান ? কাশীর ১০০ ফিট উচ্চ ধাতুনির্ম্মিত শিববিগ্রহ এখন কোথায় ? এখন আমাদের তীর্থগুলির প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিম্বদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি। ভারতের সর্ব্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রুতপূর্ব্ব নীরব অত্যাচারের কাহিনী অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রন্থোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্যরূপ প্রমাণ এদেশে স্বভাবতঃই বিরল হইবার কথা।

কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। ভারতবর্ষের শৈলে ও গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যন্ত অধিক অনুসন্ধান হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, সুতরাং দেশে দেশে উৎকীর্ণ অনুশাসনের প্রচার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এভাবে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা এই সময়েই নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ এই ভাবের অনুশাসনপ্রচার আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ দেশে যুধিষ্ঠিরের পর অশোকের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই প্রস্তরানুশাসন ভিন্ন তদানীন্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই চিহ্নগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় অবশেষ, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী ৮৪,০০০ অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমান কালে তন্মধ্যে প্রায় ৪০ খানি পাওয়া গিয়াছে। সেই ৪০ খানির মধ্যেও যে ধ্বংসক্রিয়া সূচিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তরানুশাসনে কতক অংশ কর্ত্তিত করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তন্মধ্যে স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্রস্তরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত

নিদর্শন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। পাঞ্জাবে হারাপ্পা ও সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদরো নামক স্থানে কিছুকাল যাবৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহুবিধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। এগুলি যে কত প্রাচীন, পণ্ডিতগণ এখনও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তবে ইহাদের তারিখ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৪।৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গিয়া পড়িবে, তাহা অনেকে অনুমান করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল প্রাচীন দ্রব্যের মধ্যে কতগুলি 'তীরমুখ' চিত্রলিপিও পাওয়া যাইতেছে। য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় লিপিতত্ত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠকে'র নিকটবর্ত্তী পথের উপর এক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'ঐ লিপি মগধরাজ জরাসন্ধের সমসাময়িক হইতে পারে; উহা চিত্রলিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যবর্ত্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতর লিপি।' (আধুনিক কোন প্রত্নতাত্ত্বিকই এই মত গ্রহণ করেন নাই।) বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলবস্তুর অতি সান্নিধ্যে পিপারাও গ্রামে মিঃ পেপী একটি স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিশিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত প্রস্তরপাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উক্ত উপহার মহা সমারোহের সহিত শ্যামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার তারিখ মৌর্য্যযুগেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সাঁচীর স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সহিত উৎকীর্ণ-লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই লিপি বুদ্ধ-নির্ব্বাণের একশত বৎসরের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অশোক-অনুশাসনে দুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয়; সাহবাজগঢ়ি ও মান্সেরা অনুশাসনে খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে; উহার গতি দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। অপর সমস্ত দেশীয় অনুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজশিল্পিগণ কর্তৃক খোদিত অক্ষরে রাজধানীর গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই; কেবল লোকের বোধ সৌকর্য্যার্থ অনুশাসনের ভাষা দেশভেদে কিছু ভিন্ন করা হইয়াছে। অশোকের ন্যায় প্রতাপান্বিত রাজা রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর

যে অধীনস্থ জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। নানারূপ প্রাদেশিক অক্ষর বর্ত্তমান থাকিলেও দেবনাগরী এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অনুশাসনে নানাস্থানে একরূপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই দেশে অন্য লিপি প্রচলিত ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবার পদ্ধতি ও দূরত্বসূচক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস্ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা তূলা দিয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ললিতবিস্তরে ভারতীয় নানা লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাধ্যায়ে 'লিপি', 'গ্রন্থ' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় এবং 'যবনানী' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্র আর্য্যলিপির সত্তাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'কাণ্ড', 'পটল' (যাহাদের অর্থ পুস্তকাধ্যায়) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারত ও মনুসংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানারূপ প্রমাণ রহিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেদের ১০,৮০০ পংক্তি দোষাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং যজুর্ব্বেদে পরার্দ্ধ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—উপনিষদ প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে "অক্ষর" শব্দ বর্ণমালার অঙ্গীয় অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে ১/২ বুঝাইতে অর্দ্ধ, ১/৪ বুঝাইতে পদ, ৩/৪ বুঝাইতে ত্রিপাদ, ১/৮ বুঝাইতে শফ এবং ১/১৬ বুঝাইতে কলা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উক্ত বেদে (৬,৬৯,৮) ইন্দ্র এবং বিষ্ণু একস্থলে সমবেত চেষ্টায় ১০০ সংখ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছেন। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে অষ্টকর্ণী গাভীর উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ মালিকত্ব বুঝাইবার জন্য গরুর কাণে সংখ্যাবাচক চিহ্ন মুদ্রিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণে দিবসকে ১৫ মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ১৫ ক্ষিপ্রে, প্রত্যেক ক্ষিপ্রকে ১৫ এতর্হিতে, প্রত্যেক এতর্হিকে ১৫ ইদানিকে এবং প্রত্যেক ইদানিকে ১৫ প্রাণে বিভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং এইভাবে দিবস কাল ৭৫৯,৩৭৫ ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। লেখার পদ্ধতি না থাকিলে এরূপ জটিল গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলিতে গদ্যরচনারও অভাব নাই। আমরা এই সকল কারণে

আর্য্যলিপির মৌলিকতা সম্বন্ধে কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না। ভারতীয় লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলর ১৮৯৯ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসের 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্রোশাঙ্ক-চিহ্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; অথচ তাঁহারা সমস্ত অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন নাই, এ যুক্তি বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়।

ঋগ্বেদ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের প্রাচীন। এই সময়নির্দ্দেশ খুব ঠিক নহে। বেদ বহু প্রাচীন, কিন্তু আমরা যথাসম্ভব অল্প করিয়া ধরিলাম; কোনও সেমিটিক লিপি এত প্রাচীন নহে। যাঁহারা লিপির আদিভূমি বলিয়া ইজিপ্টকে বরণ করিয়া লইতে প্রয়াসী, তাঁহাদের যুক্তিতর্কও এখন টিকিবে না। সম্প্রতি মিঃ যাজদানি নিজামরাজ্যের অন্তর্গত রায়গড় হইতে কতকগুলি মৃত্তিকাপাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে অক্ষর-চিহ্ন বিদ্যমান। মিঃ ব্রুস্ ফুট মান্দ্রাজ মিউজিয়াম হইতে সেইরূপ চিহ্নযুক্ত আরও কতকগুলি পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সমস্ত পাত্র মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত পাত্রে ১৩১টি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ যাজদানি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেগুলি অক্ষর এবং শুধু মালিকত্ব বুঝাইবার চিহ্ন নহে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মীলিপির মত কতকগুলি অক্ষর আছে। এই পাত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি মেগালিথিক্ যুগের, তাহা খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরের ন্যূনকালের নহে, অপরগুলি নিওলিথিক্ যুগের —তাহাদের বয়ঃক্রম অন্যূন ৩০০০ খৃঃ পূঃ। আসাম হইতেও এইরূপ প্রাচীন অক্ষরমালার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারতীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত তৃতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ফিনিসিয়া ও আরব উপকূলে ভারতীয় লিপির আদি খুঁজিবার চেষ্টার পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভূপ্রোথিত ঐতিহাসিক খনি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইজিপ্ট অতি প্রাচীন দেশ, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা কত প্রাচীন তাহার শেষ মীমাংসা হইতে এখনও বাকী আছে, ইহা নিশ্চিত। যে অক্ষর আজ আমরা অবহেলায় লিখিয়া যাইতেছি তাহা ঐতিহাসিক যুগের নয়; তাহা ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের, তাহা কোন্ বৃক্ষবল্কলে বা প্রস্তরে বা শিলায় প্রথম উৎকীর্ণ হইয়াছিল কে বলিবে? মানুষের স্মৃতিশক্তি

যেখানে পরাজয় পাইয়াছে বা পরাজয়ের আশঙ্কা করিয়াছে, সেখানে স্মারক সংকেতের প্রয়োজন হইয়াছে। অথবা চিহ্নদ্বারা প্রিয়জনকে কোন সন্ধান দিতে চাহিয়া কে কবে কোথায় কি ভাবে তাহা উৎকীর্ণ করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় কি? তাহা খৃষ্টের বহুপূর্ব্বে, বৌদ্ধজাতক এবং জরোস্থাক্রর বহুপূর্ব্বে, এই লুপ্ত কাহিনীর পরিষ্কার ইতিহাস কোথাও নাই; অনুমান এখন এমন জায়গায় দাঁড়াইয়াছে যে ভারতীয় লিপির মৌলিকত্বের দাবী আমরা এক কথায় ছাড়িয়া দিতে পারি না।

লিপিমালার পরিবর্ত্তন, প্রাচীন বঙ্গলিপি।

আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকের অনুশাসনে যে অক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রাহ্মীলিপির এক বিশেষ পরিণত অবস্থা সূচিত করিতেছে। সুতরাং মৌর্য্য-যুগের বহুপূর্ব্বে যে এই লিপির প্রচলন ছিল, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কেবল অশোক-অনুশাসন হইতেই স্থানভেদে মৌর্য্যাক্ষরের ৩।৪টি বিভিন্ন শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লিপিগত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। মৌর্য্যযুগের পরে কুষাণযুগে ভারতীয় লিপির অনেক পরিবর্তন হয়। লিপিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গুপ্তযুগের প্রভাব সামান্য নহে; গুপ্তরাজগণের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতে তিনটি বিভিন্ন লিপিভাগের প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত মধ্য এসিয়া হইতেও গুপ্তলিপির এক স্বতন্ত্র ধারার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কাশগড় হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ বাওয়ার পুঁথির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে উত্তর ভারতের পূর্ব্বাংশে যে লিপি ব্যবহৃত হইত কালক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের রূপ ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ হইতে পূর্ব্বদেশীয় লিপির প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—ইহার প্রমাণ সমসাময়িক বহু অনুশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বাক্ষরও দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়,—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য। প্রতীচ্য অক্ষর ক্রমশঃ নাগরীর সহিত মিশিয়া বিবিধ প্রাদেশিক লিপির সৃষ্টি করিল, প্রাচ্য

অক্ষর নাগরীর প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত থাকিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক ধারা বঙ্গলিপির ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বুহ্‌লর সাহেবের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্বভারতীয় নাগরী লিপি হইতে ক্রমশঃ বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মত খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতর রূপ খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ রচিত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গুপ্তযুগের প্রথমভাগে প্রাচ্য অক্ষরের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার পরিচয় এই লিপিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের মতে গুপ্তকালের ইহাই প্রাচীনতম অনুশাসন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রাচ্য অক্ষর হইতেই আমাদের বঙ্গলিপির উৎপত্তি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত বিজিত আর্য্যাবর্ত্তের রাজাদিগের মধ্যে চন্দ্রবর্ম্মা নামধেয় এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। এই চন্দ্রবর্ম্মা ও শুশুনিয়া শিলালিপির মহারাজ চন্দবর্ম্মা যদি একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে শেষোক্ত শিলালিপি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল।[১] সম্ভবতঃ ইহা হরিষেণ প্রশস্তি হইতেও প্রাচীন। বাঙ্গালায় এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ ও দিনাজপুর জেলাস্থ দামোদরপুর গ্রাম হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের কয়েকখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি হইতে গুপ্তরাজগণের সময়ের বঙ্গদেশে ব্যবহৃত প্রাচ্য অক্ষরের নমুনা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মগধের রাজা আদিত্য সেনের সাহপুর ও আফসড় অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া পালরাজগণের লেখমালায় এই প্রাচ্যলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস খোদিত আছে। কাশীখণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ১০০৮ খৃষ্টাব্দে লেখা। তৎপরবর্ত্তী যুগে বঙ্গীয় লিপিকলার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, সেনরাজগণের তাম্রশাসন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি, অশোকচল্লের গয়া-অনুশাসন, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত নেপাল হইতে প্রাপ্ত বোধিচর্য্যাবতারের পুঁথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

১. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, ৪৬৯ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থশালায় রক্ষিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের উপরই আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। কেম্ব্রিজ নগরে যে পুঁথিগুলি রক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি ১১৯৮—১২০০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। শ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই পুঁথি তিনটি নকল করিয়াছিলেন, ইহাদের একখানিতে মগধের পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালদেবের রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে, এই পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অপরাপর স্থলের লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের (১২৯৫ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

১১৭০ (৫১ লসং) খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচল্ল মহারাজের শিলালিপি (বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত) এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে দামোদর রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনে আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন রূপ বিদ্যমান। প্রাচীন লিপিমালার প্রতিরূপ এই অধ্যায় শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

গুপ্তবংশের অবনতির পর 'গুপ্তলিপি'র প্রতীচ্য শাখা হইতে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের উত্তর পার্শ্বে 'সারদা' অক্ষরের উদ্ভব হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে 'সারদা' ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'সারদা' অক্ষর হইতে বর্ত্তমান 'কাশ্মীরী', 'গুরুমুখী' ও 'সিন্ধী' অক্ষরের উৎপত্তি। বর্ত্তমান সময়েও কাঙ্গরা ও তন্নিকটবর্ত্তী উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই যুগে প্রচলিত মধ্যভারতীয় লিপি হইতে কালক্রমে বর্ত্তমান নাগরী এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অক্ষর উদ্ভূত হয়। মধ্যযুগে আর্য্যাবর্ত্তের কোন কোন স্থানে যে শ্রেণীর প্রাচ্য অক্ষর প্রচলিত ছিল, প্রিন্সেপ, ফ্লিট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে 'কুটিল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কিলহর্ণ সাহেব এই নামের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বীকার করেন নাই। উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার। উৎকলবাসিগণ তালপত্রের উপর 'খুন্তি' নামক লৌহ-সূচী দ্বারা লিখিতেন;

সূক্ষ্মাগ্র খুন্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে তালপত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এই জন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তির্য্যকভাবে কাটা হইত; এইরূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত করা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরল রেখার মাত্রা টানা যায়; বলা বাহুল্য, কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপির ইহাই বিশেষত্ব।

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইহাতে কয়েকটি অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর মধ্যবর্ত্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা বিদ্যমান। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নেপালী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বঙ্গাক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এসিয়ার নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসকল দশম কিম্বা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র। জাপানের হরিয়ুজি মন্দিরে "উষ্ণীষ-বিজয়ধারিণী" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। উহা সেই মন্দিরের পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত মগধাক্ষরে লিখিত, তাহা সেই সময়ের বঙ্গাক্ষর হইতে ভিন্ন নহে। ইহার একখানি প্রতিলিপি অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি সংগ্রহ করিয়া অনেক্ডোটা অক্সনিয়েন্‌সিয়া Anecdota Oxoniensia গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। অকালে পরলোকগত জাপানী যুবক এস. টি. হোরি আমাকে জাপানী পুরোহিতগণের লিখিত অক্ষরের নমুনা দেখাইয়াছিলেন, তাহা একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ।

বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গভাষাও সেইরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে নানা-রূপ পরিবর্ত্তন ও বিবিধ দেশজ ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া

বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা ; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্য্যগণের কথিত গৌড়ীয় ভাষা[১] অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক হইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু কোন্ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে ? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই ; প্রকৃতিও সৃষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন ; আদি বৃত্তান্তের চিররহস্য-ভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ। মনুষ্য জাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন। মনুষ্যভাষার যে সর্ব্বপ্রাচীন অমর নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গভাষার আদিরূপ অন্বেষণ করিতে গেলে, সেই বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ললিতবিস্তরের প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। তখনও নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোনও লিপি নাগরী নামাঙ্কিত হয় নাই।[২]

আর্য্যভাষায় পরিবর্ত্তন।

আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদ, তাহার পর রামায়ণাদির সংস্কৃত এবং বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত ; তৃতীয় স্তরে, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাসমূহ। এস্থলে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইতেছে। বঙ্গভাষার উৎপত্তিকালের নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে ; আমরা ইহার লিখিত ভাষার পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার কল্পনাশীল কবি ও দার্শনিকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সূত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস 'বালেন্দুবক্র-পলাশ-পর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, অথবা জয়দেব, 'মদন-মহীপতি'র 'কনক-দণ্ড-রুচি কেশর-কুসুমে'র কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবি মুখে 'বিদ্যুৎ' কি 'মেঘের ডাক'

লিখিত ও কথিত ভাষা।

---

১. হরন্‌লি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে "গৌড়ীয় ভাষা", এই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ—উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী। আমরাও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব।

২. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ৪৮১ পৃষ্ঠা।

বলিয়া লেখনী দ্বারা 'ইরংমদ' বা 'জীমূতমন্দ্রে'র স্বষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান বর্ত্তমান, কিন্তু সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্যপল্লবের প্রতি স্পৃহা ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে ;—তখন ভাষাবিপ্লবের প্রয়োজন হয়। যখন বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল ; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতীর বাক্‌চেষ্টার শাসন করে ; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চিরপ্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বার্ত্তিককার কাত্যায়ন, বররুচি, ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গলায়ন, শিলাবংশ—ইহারা ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত, পরবর্ত্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও 'মহাবংশ' ও 'ললিতবিস্তর' শুদ্ধ বলিয়া গণ্য এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি 'চৈতন্য চরিতামৃত' নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী ; পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার রূপান্তর।

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায় কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার

বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকা বৌদ্ধাধিকারে রচিত। যদি সমাজের পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিবাহপ্রথা বিশেষ নিন্দার্হ হইত, তাহা হইলে নাটকের প্রধান নায়ককে গ্রন্থকার কখনই এইরূপ পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধগণের সংস্কার ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-ধারণা হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ-জাতকে দেখা যায় রাজা দশরথের দুই পুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ এবং একমাত্র কন্যা সীতা। রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করিলেন।[১] সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে বিচিত্ররূপের ছিল, ইহা হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতকের এই উপাখ্যানভাগ শোধরাইয়া লইবার জন্য হিন্দুগ্রন্থকারগণ নানারূপ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল ছিল, এরূপ নহে ;—ভাষাও বিশৃঙ্খল এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের আদর্শ লোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তাহার স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় প্রচলিত হইল ; কথিত ভাষাও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব অবলম্বন করিল। যথা,—

১। "পণমহ জমস্স চলণে"···মুদ্রারাক্ষস, ১ম অঙ্ক।

২। শৃলে বিক্কন্তে পণ্ডবে ? শেদকেদু পুত্তে লাধাএ ? লাবণে ইন্দপুত্তে ? আহো কুন্তীএ তেণ লামেণ জাদে অশ্শখামে ? ধম্মপুত্তে জড়াউ—মৃচ্ছকটিকা, ১ম অঙ্ক।

৩। "পলিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদ্দচালুদত্তাকে তুমং॥" মৃচ্ছকটিকা, ৮ম অঙ্ক।

সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই এইরূপ রচনা বহুবার পড়িয়াছেন ; চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শব্দ স্থলে চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলণ এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়। এখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিম্নশ্রেণীতে ক্বচিৎ ভাষার এরূপ শিথিল ভাব প্রচলিত থাকিতে পারে ; কিন্তু কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া।

১. অথ বারাণসিয়ং দসরথ-মহারাজা নাম অগতিগমনং পহায় ধম্মেন রজ্জং কারেসি। তস্স সোলসন্নং ইত্থি সহস্সানং জেট্ঠিকা অগ্গমহেসী দ্বে পুত্তে একঞ্চ ধীতরং বিজায়ি, জেট্ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো নাম অহোসি। দুতিয়োলক্খণ কুমারোতধীতা সীতাদেবী নাম॥" ইত্যাদি।···বৌদ্ধজাতক।

করেন। সাহসরামের প্রস্তর লিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশোকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা স্থধন্বা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যথা শঙ্করাবিজয়ে,—

দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকাবিদ্যাপ্রসঙ্গ-ভেদৈর্নিজিত্য তেষাং শরীরাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উলুখলেষু নিক্ষিপ্য কশাপ্রহরৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট-মতধ্বংসমচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে।" **আদিশূর বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য স্থাপন করেন,** যথা—'জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি পতির্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।"[১]

হিন্দুধর্ম্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়নেই পর্য্যবসিত হইল না; চতুর্দ্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরব্ধ হইল। আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তদীয় পিতা রাজা বিশালদেব হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতি-গতি পরিবর্ত্তন করিলেন, চাঁদকবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।[২] পাঠক দেখিবেন, রাজা বৌদ্ধধর্ম্মকে "নষ্ট জ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 'লাম' পুনরায় রাম হইলেন। রত্নাকর দস্যুর উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফূরে॥ শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে। উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে কেমনে॥ মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আইসে॥ ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মৃত মানুষের সবে মড়া বলে নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম। তব মুখে তখনি স্ফূরিবে

১. রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

২. অতি দুচিত ভয়ো সারংগ দেব। নিত প্রত্তি করৈ অরহংত সেব॥ বুধ ধ্রম্ম লিয়ো বংধে ন তেগ। সুনি স্রবন রাজ মন ভো উদেগ॥ বুল্লাই কুংঅর সনমান কীন। কিহি কাজ তুম্ম ইহ ধ্রম্ম লীন॥ তুম ছংডি সরম হম কহৌ বত্ত। বাংনিক পুত্র হন তৈং দুচিত্ত॥ ইহ নষ্ট গ্যাংন (জ্ঞান) সুনিয়ে ন কান। পুরষাতন ভজ্জে কিত্তি হান॥ তুম রাজবংস রাজ নহ সংগ। মৃগয়া সব খেলো বন তুরংগ॥ পরমোধ তজো বোধক পুরান। রামাইন সুন ভারথ নিদান॥...চাঁদগাথা, সময় ১,৩৪৯-৩৫২। মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধগণ মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন না ("বাঁধে ন তেগ"), এইজন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ-প্রাবল্যের দিনে বাঙালীরা পাগড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এদেশ হইতে উষ্ণীষ-ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

রাম নাম ॥ শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে। অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাঁহারে ॥ বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান। বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ খান ॥ মরা মরা বলিতে আইল রাম-নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥ তূলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। একবার রাম-নামে সর্ব্বপাপক্ষয় ॥ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

পরস্বহারক দস্যুর জিহ্বা পাপে জড়, তাহার মুখে রাম-নাম বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের?)

সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে উহার প্রভাব।

এত দোহাই ও যত্নের সহিত এই নূতন উচ্চারণশিক্ষা দিবার পর আর কোন্ চাষা রামকে 'লাম' বলিতে সাহস করিবে? এই ভাবে লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল এবং চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই সব পুঁথিতে এমন অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা—পখা…পক্ষ, কাতি…কার্ত্তিকমাস, নিমল…নির্ম্মল, নখ্‌তা…নক্ষত্র, মুরুখ…মূর্খ, বিভা…বিবাহ, পুনি…পুনঃ, শুকুল…শুক্ল, বগা…বক, দে…দেহ, সভাই…সবাই, বিনি…বিনা।[১]

বস্তুতঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, কাশী বা পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—

"জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর। জয় শ্মশাননাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক, মহত্তর। জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গ-ভূষণ, জটাধর। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর ॥"

বিম্‌স্ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাষা গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিহিত; তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালা, উড়িয়া ও মরাঠীতে 'তৎসম' শব্দের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং হিন্দী, গুজরাটী এবং

১. ইহার প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে।

পাঞ্জাবী ও সিন্ধীতে ঐরূপ শব্দের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন।[1] বিম্‌স্ নির্দ্দেশ করেন যে, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, তখনও হিউএনসাঙ্ সমতট ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের অধিবাসীদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃতের গর্ব্ব চিরদিনই সুরক্ষিত। গৌড়ীয় রীতি বৃথা শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন। বৈদর্ভী রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য্য, সুকুমারত্ব এবং গৌড়ীয় রীতির সমাসবহুলত্ব, দণ্ড্যাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

বৈদর্ভী রীতি,—

শিথিলং মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা ॥

গৌড়ীয় রীতি,—

"যথানত্যর্জুনাব্জন্ম সদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ ॥"

কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত এই দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত।

বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত।

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই, উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতিসন্নিহিত হইলেও, উক্ত মত এখন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। দেখা যায়, ডাক ও খনার বচনের ভাষা এবং পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা যে সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায় ; কিন্তু বর্ত্তমান ভাষা হইতে তাহা এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করাও সঙ্গত নহে। সুতরাং সে ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে ? হয়ত যে সকল প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল

১. Beames, *Comparative Grammar* Vol. 1. p. 29.

না;—কিন্তু উহাও সাহিত্যদর্পণ-নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতের অথবা অপভ্রংশ ভাষাগুলির অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নহে। দণ্ড্যাচার্য্যবিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে:—

"শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥"

বঙ্গভাষার ঠিক পূর্ব্বাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটিতেই দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই। নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য-প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। যদিও এই সকল শব্দ বিবিধ পুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নের তালিকায় অনেক স্থলেই উল্লেখ করিলাম।

প্রাকৃত	সংস্কৃত	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
লোণ[1]*	(লবণম্)	.... লুন	... প্রা. প্র.
পত্থর[2]*	(প্রস্তরঃ)	... পাথর	ঐ
বিজ্জুলী	(বিদ্যুৎ)	... বিজলী	... মৃ. ক.
বাড়ী	(বাটী)	... বাড়ী	... মৃ. ক.
ঘর	(গৃহম্)	... ঘর	...
দুয়ার	(দ্বারম্)	... দুয়ার্	... মৃ. ক.
ঠাণ	(স্থানম্)	... ঠাঁই	... ঐ
বক্কল	(বল্কলম্)	... বাকল	... অ. শকু.
ভত্ত*	(ভক্তম্)	... ভাত	...
লট্‌ঠী*	(যষ্টিঃ)	... লাঠী	...
খম্ভ*	(স্তম্ভ)	... থাম্বা	...
চক্ক*	(চক্রঃ)	.... চাকা	...

১. 'লুন' শব্দ পূর্ব্বে 'লোণ' রূপেই ব্যবহৃত হইত; যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,...
"বাহান্নপুরুষ যার লোণের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥"

২. এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে', শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনা'তে, বিম্‌স্ সাহেবের **Comparative Grammar** ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে।

প্রাকৃত	সংস্কৃত	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল
বহু [১]	(বধূঃ)	... বউ	... মু. রা.
ঘিঅ	(ঘৃতম্)	... ঘি	... মৃ. ক.
দহী	(দধি)	.... দই	... ঐ
দুধ্ধং	(দুগ্ধম্)	... দুধ	
অন্ধআর	(অন্ধকারঃ)	... আঁধার	... মৃ. ক.
শিআল	(শৃগালঃ)	... শিয়াল	... ঐ
হত্থী	(হস্তী)	... হাতী	... ঐ
ঘোড়ও	(ঘোটকঃ)	... ঘোড়া	... গাথা
চন্দ	(চন্দ্রঃ)	... চাঁদ	... মৃ. ক.
সঞ্ঝা	(সন্ধ্যা)	... সাঁঝ	... ঐ
হত্থ	(হস্ত)	... হাত	.... অ. শকু.
মত্থঅ	(মস্তকং)	... মাথা	.... মৃ. ক.
কণ্ণ	(কর্ণঃ)	... কাণ	... মৃ. ক.
হিঅঅ	(হৃদয়ঃ)	.. হিয়া	.... ঐ
অত্তা[২]	(মাতা)	... আই	... মৃ. ক.
রাও, রায়	(রাজা)	... রায়	... চ. কৌ. ও প্রা. পিঙ্গল
চ্ছুরাং	(ক্ষুরঃ)	... ছুরি	....
মসাণং	(শ্মশানম্)	... মশান	...
বম্হণ	(ব্রাহ্মণঃ)	... বামুন	... মৃ. ক.
চেড়ী[৩]	(চেটী)	... চেড়ী	... ঐ
সহি	(সখী)	... সই	... ঐ
জেট্‌ঠং	(জ্যেষ্ঠঃ)	... জেঠা	...
উবজ্ঝাঅ	(উপাধ্যায়ঃ)	... ওঝা	... মু. রা.

১. প্রাকৃত 'বহু' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যথা— 'যাহার বহু ঝি দূরে যান্তি, তাহার নিকটে বসে অসতী'। ডাকের বচন, বেণীমাধব দের সংস্করণ।

২. বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'আতা'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা— 'আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। ভূতের ডরেতে সেই হিন্দুয়ানি মানি॥'

৩. এই শব্দ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃত	সংস্কৃত	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল
কজ্জং	(কার্য্যম্)	… কাজ	…
কম্মং	(কর্ম্ম)	… কাম	…
বহিণী	(ভগ্নি)	… বোন, বহিন	… মৃ. ক.
রাই	(রাধিকা)	… রাই	… অপভ্রংশ ভাষা[১]
কাণু	(কৃষ্ণঃ)	… কানু	… ঐ
গোয়াল	(গোপঃ)	… গোয়াল	… ঐ
বর্ত্তাং	(বার্ত্তা)	… বতি	…
অপ্পি	(আত্মা)	… আপন	… মু. রা.
আহ্মি[২]	(অহম্)	… আমি	… মৃ. ক.
তুহ্মি	(ত্বম্)	… তুমি	… উ. চ.
শে	(সঃ)	… সে	… মৃ. ক.
তুএ	(ত্বয়া)	… তুই	… ঐ
তুই	(তব)	… তাহার	… অ. শকু.
এহু	(এষঃ)	… এই	… ঐ
ইমিণ	(অনেন)	… এমনে	… মু. রা.
অজ্জ	(অদ্য)	… আজ	… উ. চ.
ণা	(ন)	… না	… গাথা
অ	(চ)	… ও	… ঐ
দঢ়	(দৃঢ়)	… দড়[৩]	…
সচ্চ	(সত্যম্)	… সাচা	… মৃ. ক.
অদ্ধ	(অর্দ্ধম্)	… আধ	… ঐ
বুড্ঢ	(বৃদ্ধঃ)	… বুড়া	… ঐ

---

১. অপভ্রংশভাষামাহ আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ ॥

২. বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইবার জন্য এই 'আহ্মি', তুহ্মি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই 'আমি' ও 'তুমি' স্থলে সর্ব্বত্রই 'আহ্মি' ও'তুহ্মি' দৃষ্ট হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়-রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকেও এই প্রকারের প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে।

৩. এই 'দড়' শব্দ পূর্ব্বে দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—

"মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত দ্বিজবর। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড় ॥"

চৈ. ভা.; এই "দড়" শব্দের অর্থ এখন দক্ষ হইয়াছে।

প্রাকৃত	সংস্কৃত	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল
দুঅ	(দ্বয়ং)	… দুই	… প্রা. পৈঙ্গল
দুণা	(দ্বিগুণ)	… দুনা	…
তিগ্নি	(ত্রি)	… তিন	… ঐ
চারি	(চতুর)	… চারি	… ঐ
ছ	(ষষ্ঠ)	… ছয়	… ঐ
সত্ত	(সপ্ত)	… সাত	… প্রা. পৈঙ্গল
অট্ট	(অষ্ট)	… আট	… মৃ. ক.
বারহ	(দ্বাদশ)	… বার	… প্রা. পৈঙ্গল
চোদ্দহ	(চতুর্দ্দশ)	… চৌদ্দ	… ঐ
পণ্ণরহ	(পঞ্চদশ)	… পনর	… প্রা. পৈঙ্গল
সোলা	(ষোড়শ)	· · ষোল	… ঐ
বাইস	(দ্বাবিংশ)	… বাইশ	… ঐ
কেত্তকং	(কিয়ৎ)	… কতক	
এত্তকং	(ইয়ৎ)	… এতেক	
জেত্তকং	(যাবৎ)	… যতেক	…
জত্থক	(যত্র)	… যথায়	… উ. চ.
এত্থ	(অত্র)	… এথায়	… মৃ. ক.
পল্লাণ	(পলায়নম্)	… পালান	… মৃ. ক.
মিচ্ছা	(মিথ্যা)	… মিছা	…
অম্ব	(অম্র)	… আঁব, আম	…
সরিষর	(সর্ষপঃ)	… সরিষা	…
আঅরিস	(আদর্শ)	… আরসি	…
রূপ্পা	(রৌপ্যম্)	… রূপা	…
মচ্ছি	(মক্ষিকা)	… মাছি	…
কেথ্ন	(কুত্র)	… কোথা	…
ছিন্দ	(ছন্ন)	… ছেঁড়া	…
হলদ্দা	(হরিদ্রা)	… হলুদ	…
পোত্থি	(পুস্তক)	… পুঁথি	…
গঙ্গল	(লাঙ্গলম্)	… লাঙ্গল	…

মহু	(মধু)	... মৌ	...
তেল	(তৈলম্)	... তেল	...
সেজ্জা	(শয্যা)	... শেজ	...

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত 'দেশী নামমালা' নামক পুস্তকে গ্রন্থকার আচার্য্য হেমচন্দ্র অনেকগুলি তৎকাল-প্রচলিত শব্দের তালিকা দিয়াছেন ; ইহার সঙ্গে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ এবং ঐ সকল শব্দ যে প্রাকৃত বলিয়াই গণ্য ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে অনুরূপ বাঙ্গলা শব্দসহ পূর্ব্বোক্ত শব্দের কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা	দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
পোট্ট	... পেট	জড়িত	... জড়িত
কোট্ট	... কোট	ঝড়ী	... ঝড়ী, ঝড়
গোচ্ছা	... গোচ্ছা, গোছা	ঝাড়	... ঝাড়
ছল্লী	... ছলি	অল্লট্টপলট্ট	... উলোট পালট, উল্টা পাল্টা
থড়ি	.... থুড়ি		
বুক্কই	... বুকনি	ভল্লু	... ভালুক
তগ্‌গ	... তাগা	থরহরিয়	... থরহরি
টিপ্পী	... টিপ	দোরা	... ডোড়
চট্টু	... চাটু	পুপফা	... ফুপা, ফুফু
পপ্পিঅ	... পাপিয়া	ওসা	... ওস্
ফুক্কা	... ফক্কা	কোলাহল	... কোলাহল
ঢংঢল্ল	... ঢলঢলে	খড়	... খড়
উৎথল্ল	... উতলা, উথলানো	চাউল	... চাউল
গঢ়	... গড়	টিক্ক	... টিকা
খলী	... খোল	ডুম্ব	... ডোম
উথল্ল-পথল্লা	... উথল-পাথল	টুংটো	... ঠুঁটো
ওড়ণ	... উড়ানী	পেল্লই	... ফেলা
কোইলা	... কয়লা	কড়ংত	.. কাঁড়ানো
ওইল্ল	... ওলা	খাইয়া	... খাই
ঘোড়ো	... ঘোড়া	ঘোইল	... ঘোলা
ছিবই, ছিহই	... ছোঁয়া	ডম্ব, ডাবো	... ডেবরা

দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
ছিনাল	… ছিনাল
ছিনালী	… ছিনালী
ঘোলই	… ঘোলা
পলোট্টই	… পালাটানো
ঝালংকিঅ	… ঝলক
ঝালিঅ	… ঝালানো
ঝলঝলিয়া	… ঝলমলে
ঝলসিঅ	… ঝলসানো
ডালী	… ডাইল, ডাল
তড়ফড়িঅ	… ধরফড়
আয়ডটী	… আড়
ওসরিআ	… ওসরা (বারেন্দা)
ওহাড়ণী	… ওয়াড়
কট্টারী	… কাটারী
কড়চ্ছ	… করচুল (হাতা)
কংদোট্টং	… কানড় (ফুল)
করিল্লং	… কোঁড় (বাঁশের কোঁড়)
কণ্ণাসো	… কানাচ্ (পুকুরের তীর)
কালং	… কালো
কাহারো	… কাহার
করকং	… করঙ্গ
খড্ডা	… খাদ, খদ
খল্লা	… খাল
খড়ক্কী	… খিড়কী
খোড়ো	… খোঁড়া

দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
ডলো	… ডেলা, ঢেলা
ধন্ধা	… ধাঁধাঁ
ডোলা	… ডুলি
বোক্কড়	… বোকা, (পাঁঠা)
হেলা	… হেলা
বল্লা	… বল্লা, বোল্‌তা
হড্‌ড	… হাড়
বিহাণ	… বিহান
রোল	… রোল
বট্টা	… বাট
চূড়ো	… চূড়, চুড়ী
ছেলও	… ছেলী
ঝলা	… ঝলা
ঝংটী	… ঝুটী
ঝাড়ঃ	… ঝাড় (যথা বাঁশ ঝাড়)
ঝুটঠং	… ঝুটা
ডুংগরো	… ডুংরি (ছোট্ পাহাড়)
ঢড্‌ঢো	… ঢেঁড়া
ঢংকনী	… ঢাক্‌নী
ণংদং	… নান্দ (গরুকে জাব দেওয়ার মৃৎপাত্র বিশেষ)
ণক্কো	… নাক এবং নেকা
ণাউড্‌ডো	… নেওড়, নেওট, (স্নেহজনিত আবদারশীল)
পংখুড়ী	… পাপড়ি

দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা	দেশীপ্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
গড্ডী	… গাড়ী	ফগগূ	… ফাগ (আবির)
চট্‌টী	… শিখা	বপ্প	… বাপ
চট্‌টু	… চাটু	ববররী	… বাবরী চুল
চাসো	… চাস	মট্‌ঠো	… মাঠো (মৃদু)
চিল্লা	… চিল	মম্মী	… মামী
চিল্লো	… চেলা	বদ্দলং	… বাদল

বাঙ্গালা আর প্রাকৃতের নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন প্রাকৃত-রচনা হইতে ঐ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়াসে অনুমিত হইবে। প্রাকৃতের হোই, পড়ই, কিণই, করই, বোলই, ণচ্চই, ফুট, গাঅ, বুজ্‌ঝ, চিণ, জাণ, লগ্‌গ, পুচ্ছ ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা, চেনা, জানা, লাগা, পোঁছা, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত—শুনিঅ, অভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ, ইত্যাদি বাঙ্গালায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া, ইত্যাদি রূপধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত 'অচ্চি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা 'হইয়া'র মিলনে 'হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হয় ; যথা –'দেখিতে-আছে', 'করিতে-আছে'। অতীত কালের 'আসীৎ'-এর অপভ্রংশ 'আছিল' পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।[১]

শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তাবশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 'চল', 'খেল' ইত্যাদি ধাতুর 'ল' অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে রকারের সংশ্রব আছে, সেখানে 'ল' কারে 'র' পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে—"ড়লয়োরভেদঃ"; কিন্তু তদ্ভিন্নও অনেক স্থলে 'ল' প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ), খেলিলাম (খেলামঃ) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে 'ল' প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্রূমঃ স্থলে প্রাকৃত বোল্লাম, দৃষ্ট হয় :—

'ণ ভণামি এস লুদ্ধো ণেহস্স রসেণ বোল্লামো'—মৃ. ক. ৬ অঙ্ক।

করসি, খায়সি, করোন্তি, জানেন্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে বিস্তর-পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া

১. 'রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১ম সংস্করণ, ২২ পৃ.।

দেখাইব। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে,—

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে। দেবযানি পলাইল কুপের ভিতরে ॥"
সঞ্জয়, আদিপর্ব্ব।

(২) "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর। নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
কবীন্দ্র, ভীষ্মপর্ব্ব।

(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥"
চৈ. চ. অন্ত্য।

(৪) "চতুর্দ্দিকে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর। হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির ॥"
শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

(৫) "পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে। বার্ত্তা এক বলি পরভু তব পদতলে ॥"
—(শূন্য-পুরাণ, ৭ পৃষ্ঠা, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)

'করোমি'র অপভ্রংশ 'করোম' ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায় এবং সর্ব্বত্রই ঐ শব্দ 'করিষ্যামি'র অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে এখনও 'করুম' ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। 'মৃগলব্ধ' পুঁথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥"[১]

'করিমু' প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'কুর্ব্বঃ' হইতে 'করিব'ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব। 'করিমু'র স্থলে ক্বচিৎ 'করিবু' শব্দও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়; যথা,—

"নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে ॥" ডাক।

"পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।" শূন্য-পুরাণ, ২ পৃঃ।

প্রাকৃত 'হউ' (স. ভবতু), 'দেউ' (স. দদাতু) স্থলে 'হউক" 'দেউক' বাঙ্গালাতে প্রচলিত। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ 'ক'এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা,—করিবেক, খাইবেক, দেখুক

১. কোন কোন পুঁথিতে "সুচক্রদণ্ডী" স্থলে "সুন্ধ দণ্ডী" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ইত্যাদি। গ্রীয়ার্‌সন্‌ সাহেব বলেন, এই ‘ক’ কিম্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন; যখন ক্রিয়া (কৃ, ভূ, দা ইত্যাদি) কর্ম্ম অথবা ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উত্তর কর্তৃসূচক ‘ক’ প্রত্যয় হইয়া ঐ সকল পদ (করিবেক, হউক, ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয়। (জার্‌ন্যাল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি, সংখ্যা ৬৪, পৃ. ৩৫১।) উক্ত শব্দগুলির প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ ‘ক’ ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়,—

“জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর ভকতসমাজ॥”

চৈ. ভা. আদি।

“সর্ব্বলোকে শুনিয়া হইল হরষিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত॥”

চৈ. ভা. আদি।

সংস্কৃতের ‘হি’ (যথা ‘জানীহি’) বাঙ্গালায় শুধু ‘হ’তে পরিণত। পূর্ব্বে ‘করিহ’. ‘যাইও’ রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বুঝাইতে ‘হ’র ব্যবহার দৃষ্ট হয়ঃ—

“আঅচ্ছ পুণ্যে জ্‌দং রমঅ।”—মৃ. ক. ২ অঙ্ক।

কোথাও ‘হু’ দৃষ্ট হয়; যথা—প্রা. পিঙ্গলে, “মইন্দ করেহু!” এই হু (হুঁ) হিন্দীভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রাকৃতের মতই ‘য’ স্থানে ‘জ’, ‘য়’ স্থানে ‘অ’ বা ‘এ’ লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুদ্রিত অনেক পুস্তকেও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই; যথা,—

“উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি॥” ডাক।

‘পৌষে যার নাহিক ভাত। তার কভু নাহিক সোআথ॥” ডাক।

হস্তলিখিত পুস্তকে যথা,—

ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথ। নির্ভয়ে বেলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥”

—কবীন্দ্র;—বে. গ. পুঁথি, ১০৫ পত্র।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি ‘স’ কার (শ, ষ, স), দুইটি জ (জ, য) এবং দুইটি ণ (ণ, ন) স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয়; ইহা প্রাকৃতের অনুরূপ। কেবল ‘ন’ সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, প্রাকৃতে সাধারণতঃ শুধু ‘ণ’ ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিক প্রাকৃতে ‘ণ’ স্থলে ‘ন’-এর ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, “পৈশাচিক্যাঃ রণয়োর্লনৌ” (পৈশাচিক্যাঃ রেফস্য লকারো ভবতি ণকারশ্চ নকারঃ, চণ্ডপ্রাকৃত, ৩।৩৮)। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে

প্রাকৃতের মত 'দ' স্থানে 'ড' দৃষ্ট হয়; যথা,—দাণ্ডাক্কয়া' স্থলে 'ডাণ্ডাঞা' (তবর্গস্থ চ টবর্গো। যথা,—দণ্ডঃ ডণ্ডো—চণ্ডপ্রাকৃত, ৩।১৬)।

পূর্ব্বকালে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। বাঙ্গালা ভাষা যে পূর্ব্বকালে 'প্রাকৃত' ভাষা নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। সঞ্জয়-রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্দ্র-দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাইয়াছি, *"ভারতের পুণ্য-কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে॥" *বিশ্বকোষ অফিসের (৩৪

বঙ্গভাষা পূর্ব্বকালে প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।

নং পুঁথি) 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পুস্তকে * "তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।";
*যদুনন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে * "প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই
মোর সাধ।"; * লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য-খণ্ডে— * "ইহা বলি
গীতার পড়িল এক শ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক॥" * এবং
বিশ্বকোষ অফিসের (২৪৩ সংখ্যক পুঁথি) একখানি গীতগোবিন্দের বঙ্গীয়
অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়;— * "ইতি
শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্ত্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীতপীতাম্বরো
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।" * এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক
পুঁথি) * "সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবার কৈল পরাকৃত ছন্দ॥",
* এইরূপ বহুস্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

অপভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়; যথা—"রাই দোহড়ি পঠণ সুণি হসিঅ কানু গোআল।"
(রাইএর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কানু গোয়াল।)
—ছন্দোমঞ্জরী, ষষ্ঠ স্তবক।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কৌতূহলজনক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল। ক্রমে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ সকল ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্খালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষেরই

হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে পর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা, লেখা দূরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবারমাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক; কিন্তু যাহা দিনে, দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে আচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস ব্যর্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর সংশোধন হইল না। প্রত্যেক ছত্রের গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নামশব্দের পরিবর্ত্তন করিলে এ ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির ক্বচিদ্ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক; কিন্তু প্রত্যেক ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, বিভক্তি-চিহ্নগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা।

শব্দগুলি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথম প্রাকৃতে, তাহার পর গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যাক্ষর লুপ্ত হয় এবং আদ্য বর্ণে আকার যুক্ত হয়। যথা,—হস্তী—হাতি; হস্ত—হাত; সপ্ত—সাত; কক্ষ[১]—কাখ; মল্ল—মাল; লক্ষ—লাখ; অম্র—আম; বজ্র—বাজ; পক্ষ—পাখ; হট্ট—হাট; অষ্ট—আট; কর্ণ—কাণ; কজ্জল—কাজল; অক্ষ—আঁখি; ভল্লূক—ভালুক। কখনও কখনও শেষবর্ণের পরে আকার যুক্ত হয়; যথা,—ছত্র—ছাতা; চক্র—চাকা; চন্দ্র—চন্দা[২]; পক্ব—পাকা; পত্র—পাতা; কর্ত্তা—

সংস্কৃত শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়ম।

---

১. কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির 'ক্ষর উচ্চারণ' খাখ এইরূপ ধরা হইয়াছে।

২. প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে 'চাঁদার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; যথা,—
"দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাঁধা। কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চাঁদা॥" ক. ক. চ.
'জিনিয়া প্রভাত-রবি সিন্দূর ফোটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা॥" ক. ক. চ.
"তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বাঁধা, তিল অর্দ্ধ না দেখিলে মরি॥" ক. ক. চ.
"কাঁদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, স্মর লইল আসি॥ চণ্ডীদাস।
"লগন চাঁদা।" খনা।

কাতা।[১] কখনও বর্ণের শেষে আকার লুপ্ত হয় ; যথা,—লজ্জা—লাজ ; সজ্জা—সাজ ; ঢক্কা—ঢাক। আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে 'ং' কি 'ন'কার থাকিলে, তাহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ; যথা,—বংশ—বাঁশ ; ষণ্ড—ষাঁড় ; হংস—হাঁস ; দন্ত—দাঁত ; চন্দ্র—চাঁদ।

'অ' স্থানে 'আ' হইবার উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে স্বরবর্ণ অন্যান্যরূপেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—

'অ' স্থানে 'এ' ; বঙ্গন—বেগুন।

'আ' স্থানে 'ই' ; পঞ্জর—পিঞ্জর ; সজ্ঞান—সিয়ানা।

'অ' স্থানে 'উ' ;—ব্রাহ্মণ—বামুন ; দ্বিপ্রহর—দুপুর ; ঔষধ—ওষুধ।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেকরূপ সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে।[২]

ট ও ড স্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয় ; যথা,—ঘোটক—ঘোড়া ; ঘট—ঘড়া[৩] ; ষণ্ড—ষাঁড় ; চণ্ডাল—চাঁড়াল ; ভাণ্ড—ভাঁড়।

'ধ' অনেক স্থলে 'ঝ' বা 'য'তে পরিণত হইয়াছে। যথা,—উপাধ্যায়—ওঝা ; বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁড়ুয্যা।

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায় ; যথা,—'ক'—স্ুবর্ণকার—সোণার ; চর্ম্মকার—চামার ; কুম্ভকার—কামার ; নৌকা—নাও, বা না ; কোকিল—কোয়েল ; নকুল—নেউল।

'খ'—মুখ—মু[৪]।

'গ'—দ্বিগুণ—দুণা ; ভগিনী—বোন ; সুগন্ধ—সোঁধা।

'চ'—সূচি—সূই।

'জ'—রাজা—রায়।

'ত'—ভ্রাতা—ভাই ; মাতা—মা ; শত—শ ; ঘাত—ঘা।

'দ'—হৃদয়—হিয়া ; কদলী—কলা ; খাদন—খাওন।

'প'—কূপ—কূয়া ; প্রাপণ—পাওন ; পিপাসা—পিয়াসা ;
দীপশলাকা—দিয়াশলাই।

---

১. "ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।" চণ্ডীদাস

২. Beames—*Comparative Grammar*

৩. "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী।" ক. ক. চ.

৪. "নাহি রাঁধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ-পানা মু॥" ক. ক. চ,

'ভ'—নাভি—নাই ; গাভী—গাই।

'ম'—গ্রাম—গাঁ।

কথিত ভাষা এইরূপে সর্ব্বদা সহজ আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিম্‌স্ সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনাতেও প্রবর্ত্তিত হউক। তিনি বঙ্গদেশে সাধুভাষা-প্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি যেন কতকটা বিরক্ত। যাঁহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন? তখন 'খাওয়ার' স্থলে 'আহার করা', 'ভাত' স্থলে 'অন্ন' ও 'জল' স্থানে 'নীর' ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের মনঃপূত হয় না। আমাদের মতে, এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্বস্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষায় কল্যাণ-সাধনহেতু সংস্কৃতের নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ, ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম' কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশ-বৎসলগণ তাহাও চালাইতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক্ ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সেইজন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল তাঁহার সুহৃদ্ মনোমোহন বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

কথিত ও লিখিত ভাষায় প্রভেদ।

"আপনি পরম জ্ঞানবতী সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধ করে। পিতৃ-চরণ দর্শন সুখ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান।"

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিমান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ

বঙ্গভাষা অনার্য্যভাষা-সম্ভূত নহে।

এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, অপর কোন অনার্য্য ভাষা হইতে উহারা উদ্ভূত হইয়াছে, কয়েকজন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন্, কে এবং কল্ড্ওয়েল্ এই মতাবলম্বী। ইঁহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। বিভক্তি ও ছত্রগুলির গঠন দ্বারাই কোন ভাষার আদিনির্ণয় সঙ্গত; কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে বাস হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বাক্যগঠনে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে হিন্দীর "কো" (যথা 'হামকো') ও বাঙ্গালার "কে" (যথা 'রামকে') তাতার দেশীয় অন্ত্যবর্ণ "ক" হইতে আগত হইয়াছে। ডাক্তার কল্ড্ওয়েল্ দ্রাবিড়[১] ভাষার বিভক্তি-চিহ্ন "কু" হইতে হিন্দীর "কো" আসিয়াছে, এইরূপ অনুমান করেন এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড়-ভাষা-সম্ভূত এই মত প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাদটীকায় কল্ড্ওয়েলের যুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হরন্লির খণ্ডনকারী যুক্তির সারাংশ সঙ্কলিত হইল।[২] গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তির যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত

---

১. দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী। See *Comparative Grammar of the Dravidian Languages* by **Bishop Caldwell p. 46, Ed 1875; Hunter's** *British Empire*. **p. 32.**

২. ডাক্তার কল্ড্ওয়েল্ বলেন, আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তদ্দেশপ্রচলিত অনার্য্যভাষা সংস্কৃত-শব্দৈশ্বর্য্য দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। এই জন্য ঐ সকল অনার্য্যভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, ঐ সকল ভাষার ব্যাকরণ তদ্দারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার উত্তরে ডাক্তার হরন্লি বলেন, আর্য্যগণ বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া সহসা ঘৃণিত অনার্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে;

হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরন্‌লি, দিট্যাছি ও জার্ম্মান পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখনও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিত্রাক্ষরযোজনরীতি বর্ব্বর ভাষাবিশেষ হইতে অনুকৃত, এণ্ড্রেস্ এবং হুয়ে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই মত এখন একরূপ খণ্ডিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলিও কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে, এই মতও এখন দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই সকল মতপ্রচারকদিগের যুক্তি—সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি,—প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইবে কি না বলিতে পারি না। হয়ত দুই একজন গ্রন্থকীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীর পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তিকুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন। সম্প্রতি ডা. জে. ডি. এণ্ডারসন সাহেব এই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শব্দের উচ্চারণের হ্রস্ব—দীর্ঘতার আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন যে, হিন্দী এবং বাঙ্গালা দুই স্বতন্ত্র রীতিতে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালার উচ্চারণ দ্রাবিড় রীতির অনুযায়ী। এই মত প্রথম আমার নিকট যতটা অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল, এখন আর তাহা হয় না।

তাহারা যে দীর্ঘকাল সংস্কৃতজাতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং নাটকাদির প্রাকৃত হইতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত অনার্য্যগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিগ্রহ করিয়াছিল। এতাবৎ কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে ঘৃণিত অনার্য্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্তির সময়ে আর্য্যভাষার সুদীর্ঘকালব্যাপী অখণ্ড রাজত্বের পরে যে বিজিত অনার্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাসে অবশ্য মধ্যে মধ্যে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, বিজেতা জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন; যথা,—নর্ম্মানগণ ইংলণ্ডে আরব ও তুর্কীজাতিরা আর্য্যাবর্ত্তে এবং ফরাসীগণ গলে; কিন্তু এই সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিতগণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন এবং উপনিবেশস্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাতন্ত্র্যগৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইতিহাসে কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না।

J. A. S. B., 1872, Part I., No. II., p. 122.

বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্বার কি বিসর্গবর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়। যথা,

'শুজণে খু, ভিচ্চাণুকম্পকে শামিএ নিদ্ধণকে বি শোহদে।' মৃ· ক·, ৩ অঙ্ক।

প্রাকৃতে ঐরূপ 'এ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গালা কর্ত্তৃকারকে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা;—

১। "শুনিয়া রাজাএ বোলে হইয়া কৌতুক।
স্থগন্ধা অপছরা কেন হৈল মৃগরূপ ॥"—সঞ্জয়, আদি।

২। "কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূপ ঠান।
কোন মতে বিধাতাএ করিছে নির্ম্মাণ ॥"
রামেশ্বরী মহাভারত, বে· গ· পুঁথি, ৮৬ পত্র।

প্রথমার একবচনে ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—

'ভঅবদি! তমসে! অঅং দাব ঈদিসো জাদো, দে উণ ন আণামি কুসলবা।' উ· চ·, ৭ম অঙ্ক। 'কহিং তে পুত্তআ',—উ· চ·, ৭ম অঙ্ক।

প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—

"নরা, গজা বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা, তের ছাগলা।"—খনা।

ট্রম্প অনুমান করেন, বাঙ্গালা কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে' সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত 'কৃতে' শব্দ হইতে আগত[১]। এই 'কৃতের' নিমিত্তার্থ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—

"বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্।
স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি ॥"—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

মোক্ষমূলর বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালা 'কে' আসিয়াছে। শেষ সময়ের সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক'এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা মোক্ষমূলরের মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। বাঙ্গালা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির

১. এই 'কৃত' শব্দ প্রাকৃতে 'কিতে', 'কিও' এবং 'কো', এই তিন রূপেই ব্যবহৃত হইত। ট্রম্প অনুমান করেন, শেষোক্ত 'কো'র সঙ্গে হিন্দীর 'কো' ও বাঙ্গালা 'কে'র সাদৃশ্য আছে।

আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই 'ক' (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।[১] গাথা ভাষায় এই 'ক'এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; যথা, ললিত-বিস্তরের একবিংশাধ্যায়ে,—

"স্ববসন্তকে ঋতুবর আগতকে রমিমো প্রিয় ফুল্লিতপাদপকে।
তবরূপ স্বরূপ স্বশোভনকে বসবর্ত্তি স্বলক্ষণ চিত্রিতকে॥"
"বয়জাত সুসংস্থিতিকাঃ সুখকারণ দেবনরাণ সুসংভুতিকাঃ।
উত্থি লঘুং পরিভুজ্জ স্বযৌবনিকং দুর্ল্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥"
ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

১। "রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে॥"—কবীন্দ্র, বে. গ., ১০৬ পত্র।
২। "ভীষ্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।" ঐ
৩। "সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়"—সঞ্জয়।
৪। "শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।"—কবীন্দ্র, বে. গ., ৭৫ পত্র।
৫। "পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব।" ঐ ৭৭ পত্র।

এই ভাবে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্‌টি কর্ত্তা, কোন্‌টি কর্ম্ম পরিচয় পাওয়া কঠিন। "সৌরন্ধ্রক কীচক বোলয়ে ততক্ষণ"[২]—ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর্ম্ম ও সম্প্রদানে বাঙ্গালায় 'ক'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ঃ যথা প্রাকৃতে,—

"পলিত্তাঅহ্ দাশীএ পুত্তে দলিদ্দ-চালুদত্তাকে তুমং।—মৃ. ক. ৮ অঙ্ক।

কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নই প্রযুক্ত হয়

---

১. "তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে 'ক'-এর ব্যবহার কিছু বেশী। 'দূত' স্থানে 'দূতক', 'হট্ট' স্থানে 'হট্টিকা', 'বাট' স্থানে 'বাটক', 'লিখিত' স্থানে 'লিখিতক' এইরূপ শব্দ প্রয়োগে কেবল উদ্ধৃতাংশ মধ্যেই দেখা যায়, এমন নহে, সমুদয় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।" শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত, "ধর্ম্ম-পালের তাম্র-শাসন।" সাহিত্য—মাঘ, ১৩০১, ৬৫৩ পৃ.।

২. কবীন্দ্র—বে. গ. ৬০ পত্র।

না। যথা,—আম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত 'ক'-যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্ব্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ 'ক' পূর্ব্বে বিভক্তি-বোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শব্দের অন্ত্যবর্ণ মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম্ম ও সম্প্রদান ব্যতীত অন্য বিভক্তিতেও 'কে' ব্যবহৃত হইত। যথা,—

"মথ্‌রাকে পাঠাইল রূপ সনাতন।" (চৈ. চ.—আদি, ৮ম প.)

বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু "সব", "সকল" প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত হইত। যথা,—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার॥" চৈ. ভা.—আদি।

ক্রমে "আদি" সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা—নরোত্তমবিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা। শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে। করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে, 'রামাদি', 'জীবাদি', হইতে ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'রামদের', 'জীবদের' উদ্ভূত হইয়াছে; ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক', 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা—নরোত্তমবিলাস,—

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥"

এই 'ক'এর 'গ'এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ), জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর র-সংযোগে 'দিগের' এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে 'দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।[১] কাহারও কাহারও মতে পার্শী 'দিগর' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দিগের' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

১. এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই। 'দিগকে', 'দিগের' এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই।

আদি শব্দের সংযোগ ব্যতীত 'ক' বর্ণকে 'গ'এ পরিণত করিয়া পূর্ব্বাঞ্চল-বাসিগণ 'আমাগো', 'রামগো' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন। ঐ কথাগুলি দ্বারা 'অকস্মাৎ', 'রামকঃ' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচলিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রাকৃত 'কেরউ' হইতে বাঙ্গালা 'গুলো' শব্দের জন্ম। হিন্দী—ঘোড়াকের, নেপালী—ঘোড়াহেরু, বাঙ্গালা—ঘোড়াগুলো একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত[১]; কিন্তু 'বালকটি', 'একটি', 'দুইটি'—ইত্যাদি ভাবের 'টি' স্পষ্টতই 'গুটি' শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন পুস্তকে ঐ ভাবে গুটি শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যথা,—* "দুইরো দুই কুটুম্ব আবার আন নাই। দন্দবাদ না করিবি দুই গুটি ভাই।" * (দুয়ের দুই আত্মীয়, আর অন্য কেহ নাই, দুই ভাই দ্বন্দ্ব করিও না)—অনন্ত রামায়ণ। কাহারও কাহারও মতে "কুল" শব্দ হইতে "গুলো" উৎপন্ন হইয়াছে।

করণ কারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্ব্বে "রামে ডাকিয়াছে", "রাজায় (এ) বলিয়াছে" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। এখনও "কুড়ালে পা কাটিয়াছে", "নৌকায় বাড়ী গিয়াছে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। 'দ্বারা' শব্দ সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দ হইতে আগত, উহা কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত। সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রাকৃতে 'হিংতো' শব্দ[২] পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই 'হিংতো' হইতে বাঙ্গালা 'হইতে' আসিয়াছে। এই 'হিংতো' পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'হন্তে' রূপে প্রচলিত ছিল। যথা,—

'কালে ক'ল্ল নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়॥'

আলওল-কৃত পদ্মাবতী, ২ পৃষ্ঠা।

এই 'হিংতো'র অপর রূপ 'হনে'ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথা—

---

১. ভারতী, ১৩০৫—জ্যৈষ্ঠ।
২. "ভাসো হিংতো শুংতো।"—ইতি বররুচিঃ।

"তাকে দেখি মোহ পাইলু না দেখিলু পুনি।
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি॥" —সঞ্জয়, আদি।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ'[১] বাঙ্গালা 'র'কারে পরিণত হয়। প্রাকৃত 'অগ্গীণ' স্থলে আমরা বাঙ্গালায় 'অগ্নির' পাইতেছি। 'ণ' সচরাচরই 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বপ[২] অনুমান করেন, হিন্দীর 'কা' এবং বাঙ্গালা ষষ্ঠীর চিহ্ন সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'অস্মাকম্', 'যুস্মাকম্', ইত্যাদি 'ক' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু হরন্লি সাহেব বপের অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৩] তাঁহার মতে, সংস্কৃত কৃতের প্রাকৃত রূপান্তর হইতেই বাঙ্গালা এবং হিন্দী ষষ্ঠীর চিহ্ন আসিয়াছে। 'কৃতে' হইতে প্রাকৃত 'কেরক' উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'কেরকে'র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সেই সেই স্থলে 'কেরকের' কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্নস্বরূপই ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"তুমং পি মাণিজ্জন্তো অপ্পণো কেরিকং জাদিং ণ সুমরেসি।"
—মৃ. ক., ৬ষ্ঠ অঙ্ক।

"কস্সকেরকং এদং পবহণম্।"

এই 'কেরক' (বা 'কেরিক') হইতে হিন্দী—কর, কের, কেরি আসিয়াছে। যথা—

তুলসীদাসের রামায়ণে—'ক্ষত্রজাতিকের রোষ'—লঙ্কাকাণ্ড; পদসরোজ সবকেরে—বালকাণ্ড।

এই 'কেরক' হইতে যেরূপ হিন্দীর 'কের' ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে বাঙ্গালা ও উড়িয়া ষষ্ঠীর চিহ্ন 'এর' ও 'র' উদ্ভূত।[৪] রাজা রাজেন্দ্রলাল

---

১. টাস্মোর্ণঃ। অতোঽনন্তরং টাস্মোস্তৃতীয়ৈকবচনষষ্ঠীবহুবচনয়োর্ণকারো ভবতীতি।
—বররুচিঃ।

২. Bopp's *Comparative Grammar*, para. 330. Note.

৩. Journal Asiatic Society (Bengal), 1872, No. II, p. 125

৪. In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial 'ক' of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর. Take for instance the genitive of সন্তান, a child. It would be সন্তানকেরকো; this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের—which is the present genitive in Bengali. By analogy the other Bengali genitive post-position র which it shares with the Oriya, is probably a curtail-

অনুমান করেন, বাঙ্গালা ষষ্ঠীর 'র' সংস্কৃত 'স্য' হইতে আগত। এই মতের সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে যে, 'সে' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) 'স' রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর 'তে' সংস্কৃত 'ত্তসিল' হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার—যথা গহনে, কাননে, —প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু বাঙ্গালার সপ্তমী একেবারে প্রাকৃত-চিহ্ন বর্জ্জিত নহে। সংস্কৃত—শালায়াং, বেলায়াং, ভূম্যাং এর স্থলে প্রাকৃত—শালাও, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুস্তকেও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায়। আধুনিক 'শালায়', 'বেলায়' 'এ' 'য়' হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয়। আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"কিন্তু এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।"[১] আমরাও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

অসভ্যগণের ভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ।

বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্য্যদিগের কথিত ভাষা বহু পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। কোন্‌গুলি অনার্য্য-শব্দ, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দ্দুতে নাই;—সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতেও তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, ঢেঁকি, ধুঁচনি; এই ধুঁচনি শব্দ সংস্কৃত ধৌত শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব্দ দেশজ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। 'প্রকৃতিবাদ' অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যূন অষ্টশত শব্দ 'দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[২] এই 'দেশজ'-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা,

---

ment of the genitive case 'কর'—as ঘোড়াকর, ঘোড়াঅর,—ঘোড়ার। Journal Asiatic Society (Bengal), 1872, No. II. pp. 132—133.

১. রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'—প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২০।

২. প্রকৃতিবাদ অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩৩।

ঝাঁপা, পৌণে ইত্যাদি শব্দ 'দেশজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ; ইহারা বোধ
হয় অন্ত্য, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন
না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট। দেশজ-আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতক অনার্য্য ভাষা
হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সংস্কৃত বা
প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শব্দ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া
কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ইংরাজীতে
মারগ্রেট্ হইতে 'পেগ্', এলিজাবেথ্ হইতে 'বেস্' যে দুর্জ্ঞেয় নিয়মে উৎপন্ন
তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পার্শী, ইংরেজী,
আরবী, পর্ত্তুগীজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ আছে। তবে অনুকৃতি
দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি রচিত হয় ; যথা,—ময়ূরের 'কেকা', বানরের
'কিচ্‌মিচ্'। কিঞ্চিৎ অনার্য্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে আছে,
সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায়ও আছে, সে জন্য বাঙ্গালা ভাষার জাতি যায় নাই।

এখন বাঙ্গালা ভাষার ছন্দ পর্য্যালোচনা করা যাউক। 'পয়ার' শব্দটি
'পদ' (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া
বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই
প্রশ্ন লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন এবং "করিমা

ছন্দ।

ব্যবকসায় বর্‌হালেমা" ইত্যাদি পার্শীর বয়েৎ তুলিয়া
গবেষণা করিয়াছেন। অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষ্যে পাত্র-
পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল-রাজগণের স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গালা
ভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়।
এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।[১] প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য
খুঁজিলেও অনেক স্থলেই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবদিগের
গীতি সমস্তই গায়কেরা সুরসংযোগে গান করিত। চৈতন্যভাগবতের পূর্ব্ব
নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল,—এ সমস্তই গানের
পালা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'ত্রিপদী' স্থলে 'লাচাড়ী' দৃষ্ট হয় (সম্ভবতঃ

১. "The institution of Bhats is as old as Indo-Aryan civilization."
—Indo-Aryans, Vol. II, p. 293.

২. "পাহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হৈতে।
তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে॥"
"আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ-গানে শুনিনু শ্রবণে তাঁহার নাম॥" প. ক. ত. ৩৬ নং।

লহরী শব্দের অপভ্রংশ, কেহ কেহ মনে করেন 'লাচাড়ী' 'নাচুনী' শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতে যেস্থানে শোক বর্ণনা করা হইয়াছে অধিকাংশ স্থলে সেইখানেই লাচাড়ী ছন্দ দেওয়া হইয়াছে, কিংবা 'দীর্ঘছন্দ' বা কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণ স্ব স্ব ভণিতায় * "রামায়ণ গান দ্বিজ মন অভিলাষে" কি "পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরাম দাস" * ইত্যাদি ভাবে পাদপূরণ করিয়াছেন। এই সব গান এক জনে গাহিয়া যাইত ও তাহার সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গাহিত। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধুয়াগুলি ভাষার মাধুর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়াগুলি মাঝে মাঝে মধুর।

"দান দিয়া যাও মোরে বিনোদিনী রাই।
বারে বারে ভাঁড়িয়াছ নাগর কানাই ॥"

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ (হস্তলিখিত পুঁথি)।

"রাম-নামের মহিমা কে জানে,
নাম সুধাময় অতি, গঙ্গা ভাগীরথী
উৎপত্তি ও রাঙ্গা চরণে।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি)।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না, মাত্রার দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্ব্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিকচাঁদের গানে[১] অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর সংখ্যা ২৪, ২৫ এমন কি ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে; আবার স্থলবিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ২০এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে; সুতরাং মিল নিয়মাধীন ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ;—

---

১. Journal Asiatic Society (Bengal), 1878—Part I, No. 3, p, 146.

"যাঁহার মুরলিধ্বনি শুনি সেই বটে এই রসিকমণি।
ভাটমুখে যার গুণ গাঁথা দূতী মুখে শুনি যাঁর কথা॥"

প. ক. ত. ৩৬ নং।

"পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া।
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া॥"

"সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া সোন্দাইল।
চামের দড়া দিয়া বাঁধিল॥"

"তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরকনাথের বর।
নাগাইল পাইলে ময়না না করে কুসল॥"

"তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র।
যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল॥"

কিন্তু এই গীতি এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় ও ডাকের বচন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্ত্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তকে পয়ার অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুস্তকে ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর ন্যায় পয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,—তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। নিম্নলিখিত পয়ার 'গান্ধার-রাগ' অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাগ শ্রীগান্ধার।

"যুদ্ধে ত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি। পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি॥
এ বুলিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জায়। অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে। দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে॥
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার। না কর না কর মোর প্রাণের সংহার॥
স্থণ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন। রথ বাহুড়াই আমার রাখহ জীবন॥
একশত সুবর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত। অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত॥
বৈদূর্য্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর। দশ হস্তী দিমু তোক পরম সুন্দর॥"

কবীন্দ্র—বে. গ. পুঁথি, ৬৫ পত্র।[১]

১. আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ, প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক।

এই পয়ার,—গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন শুনাইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়মপালনের প্রয়োজন ছিল না, উপরি উদ্ধৃত অংশটি আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে পয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন যে কোন পুঁথি খুঁজিলেই ১১ হইতে ২০ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

১. সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। (১৩)
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ (১৩) চণ্ডীদাস।

২. ভৈরব স্থত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪)
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥ (১৪)
রামায়ণ, হস্তলিখিত পুঁথি।

৩. যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। (১৫)
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ (১৪) চৈ. চ., ১৬ প.।

৪. খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা। (১৩)
প্রত্যেক সবারে দিল শচী স্থচরিতা। (১৪) চৈ. ম., আদি।

৫. ক্ষৌণি-কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ। (১৭)
পুণ্য-কীর্ত্তি গুণাস্বাদী দীন পরাগল খান॥ (১৪)
কবীন্দ্র—বে. গ. পুঁথি। ৪৫ পত্র।

৬. নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে। (১৫)
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

৭. চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪)
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ (১৩) চৈ. ভা.।

৮. আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। (১৩)
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো॥ (১৩) ক. ক. চ।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না তাহা সন্দেহ-স্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা—শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তবে নকলকারীর অজ্ঞতা গ্রন্থকারের উপর আরোপ করা উচিত নহে।

৯. প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট। (১৪)
প্রতি গলি নৃত্যগীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ ॥ (২০)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচাড়ীর) অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিম্নে ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা কি প্রকারের পদ্য এবং কি রীতিতে সে কালের কাব্যাস্বাদিগণ ইহা পড়িয়া সুখী হইতেন, নিরূপণ করা সুকঠিন।

দীর্ঘছন্দ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত,
নাহিক যে পরস্পর ভেদ।
বিপ্র তর্পন্ত, সতত করেন্ত,
অভ্যাস করন্ত ধনুর্ব্বেদ ॥
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলন্ত।
প্রতিবর্গের প্রাণ সমসর,
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর।
মাদ্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র
নকুল কোমল শরীর ॥
বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র মোর,
পুনি কি দেখিনু নয়নে।
কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র
নকুল চলিয়া গেল বনে ॥

কবীন্দ্র—বে. গ. পুঁথি, ৭৯ পত্র।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে সময় অবধি গান আর কবিতার অধিকার পৃথক্ হইয়াছে, সেই সময় হইতে কবিতায় যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গালা পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিত, তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শীর বয়েৎ খুঁজিতে হইত?

এক হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতা দুটির যতিও বাঙ্গালার মত।

"ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনল্যা লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্পসুরভির্মলয়াদ্রিবাতো যাতো হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাঃস্মঃ।"

ছন্দোমঞ্জরী, দ্বিতীয় স্তবক।

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর বহুদূর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিনও ঐরূপ কারণেই মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হইয়াছিল[১] শঙ্করের 'অর্থমনর্থং' ও জয়দেবের,—

"বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম॥"

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত "চরণ গণ বিপ্প, পঢম লই থপ্প" বা "সত্তা দীহা জাণেহী, কণা তী গো মাণেহী"[২] ও জয়দেবের "রতিসুখ সারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকারভেদে নূতন ছন্দ উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদবিন্যাসের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকারের, উক্ত ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক; বাঙ্গালী ঝিনুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালার প্রথম ছন্দ বোধ হয়, বৌদ্ধ চারণ-গীতিকার অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি-গাথা চাঁদকবি যে ছন্দে গান করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

---

১. "But the Latin Language abounds so much in consonances that those who have been accustomed to write verses in it, well know the difficulty of avoiding them, as much as an ear formed on classical model demands and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rhythmical songs." Hallam's History of the European Literature, Vol. 1.

২. প্রা. পৈঙ্গল।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ

(১) শূন্য-পুরাণ, (২) মাণিকচাঁদের গান, (৩) নাথগীতিকা, (৪) কথা-সাহিত্য, (৫) ডাক ও খনার বচন

৮০০ খৃ. অ. হইতে ১২০০ খৃ. অ.।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে কত শত বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ দেব-স্তোত্র বঙ্গীয় কবিতায় কোন উৎসাহের উদ্রেক করে নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। দুই একজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসাদেবী ও দক্ষিণরায়ের বন্দনাসূচক স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ব্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, যাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ; এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণুবিগ্রহপূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন।[১] শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাবের অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলোপ।

বঙ্গদেশ যে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত ছিল, তৎ-

১. "বেদবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা; ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ" কুলার্ণবতন্ত্র।

প্রসঙ্গের অবতারণা আমরা নিম্নে করিতেছি। এই বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য দর্শনে বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রে একদা বঙ্গদেশে আগমন প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ীভূত বলিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি পালি ও প্রাকৃতের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত দেখিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণপণ্ডিত তদীয় 'প্রাকৃতচন্দ্রিকায়' বঙ্গভাষাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই এই দেশ এবং এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপেক্ষণীয় ছিল। কালের কুটিল গতি। যে দেশের সমেত-শেখরে তেইশ জন জৈন তীর্থঙ্কর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রধান তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রচার-কার্য্যে নিরত ছিলেন, যে দেশের প্রিয়পুত্র বৌদ্ধাচার্য্য শান্ত রক্ষিত নালন্দাবিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধ জগতে বঙ্গীয় প্রতিভার অনন্যসাধারণ গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল যে, তদীয় সাহিত্যে উক্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গের জন্য কণিকামাত্র স্থানও ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল।

বঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউএন্‌সাঙ্ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে ১১৫০০ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুরোহিত্যের অন্যূন এক কোটি শিষ্য থাকিবার কথা। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজগণের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, উহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৬০৮ খৃ. অব্দে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। মগধের জনৈক কায়স্থ ১৪৪৬ খৃ. অব্দে একখানি বৌদ্ধপুঁথি নকল করিয়াছিলেন, উহা কেম্বিজ নগরে রক্ষিত আছে। এইরূপ অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুঁথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি

কিন্তু উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, ধর্ম্মপূজা।

বৈষ্ণব লেখকগণের কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ-প্রণেতা বঙ্গীয় কবি রামানন্দ নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ স্বর্ণবণিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগৎ দুঃখসাগরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। এই দুঃখবাদ বৌদ্ধদিগের নিজস্ব। প্রচলিত 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় আছে।[১]

কিন্তু ভগ্ন 'স্তূপ'রাশি, গলিত পুঁথিপত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র ব্যতীত কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের এদেশে আর কোন পরিচয় নাই? চট্টগ্রামের সুদূর প্রান্তে এখনও যে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা তিরোহিত হইয়াছে? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি এবং একপ্রকার রূপান্তর। এই ধর্ম্মের পুরোহিতগণও নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্মের মন্ত্রের এক চরণ এইরূপ *"ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং"—*এই 'শূন্যমূর্ত্তি' শব্দ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত 'শূন্য' এবং 'মহাশূন্য' শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'ধর্ম্মপূজার' প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত ডোম জাতীয় ছিলেন; ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিতকৃত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা 'শূন্যপুরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিষ্কার আভাষ আছে, যথা :—

"ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" (নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং),

"শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।"

পরবর্ত্তী কতক-
এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কথা।

"ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ধন॥ অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা
১. রঘুরাজা এক ব্যাপারোপলক্ষে
রাজা জল পান করে॥"—এই ভাবের দানশীলতা,
নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার পাত্রে
আমাদিগকে বৌদ্ধ রাজন্যগণের "ভিক্ষু" হওয়ার প্রসঙ্গ মনে করাইয়া দেয়। বাল্মীকির রামায়ণে
ঐ সকল কথা নাই।

গুলি ধর্ম্মমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথ-মহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে সৃষ্টিরহস্যে নাগের বিশেষরূপ উল্লিখিত আছে, ইহা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। ধর্ম্ম পূজার মন্দিরেও বৌদ্ধধর্ম্মের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে শীতলা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রায়শঃই দেখা যায়, ইহা বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্রেক করে; বৌদ্ধপূজার এক উপকরণ চূণ, ইহা কখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে; ধর্ম্মপূজায়ও এই চূণ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন দেখিতে পাই। সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা এই অধ্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধশাস্ত্রীয় হইলেও উহার পূজকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া অবগত নহে এবং উক্ত নামে অভিহিত হইতে স্বীকৃত নহে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলি ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব প্রদর্শনের চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় নাই। এস্থলে বলা উচিত যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নানা কথাই অলক্ষিত ভাবে হিন্দুশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবার্য্য। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও ঐরূপ শূন্যবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সম্ভবতঃ, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বেই বঙ্গভাষার কতকগুলি নীতিসূত্র ও স্তুতিগীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে—

> "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।
> ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

বৌদ্ধযুগের অপরাপর নিদর্শন।

কোন রাজার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তদুদ্দেশ্যে লৌকিক স্তুতিব্যঞ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত রাজন্যবর্গ মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্ব সময় হইতে যে প্রাগুক্ত প্রশংসাগীতি

সকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১]

(১) শূন্য-পুরাণ

এই পুস্তকের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা রামাই পণ্ডিত-বিরচিত। কয়েক বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষদ্ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্ব-কোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক যে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও সেই দেবমন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বলিত একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করা প্রধানতঃ এই কবিতার উদ্দেশ্য। যদিও শূন্য-পুরাণে অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় 'দ্বিজ' শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু এই পরিচয়ে আস্থাবান্ হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটি নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বয়ংই সন্দেহার্হ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর অতি সামান্য অপরাধে রামাইকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার জল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্পর্শ করিবেন না। রামাই পণ্ডিত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসকে সেই ভাবে আর একটি অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ ডোমপণ্ডিত হইবে। রামাই পণ্ডিতের বংশধর লেখক স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—

"ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।"

কিন্তু নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ; এ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহাতিশয্যই তাঁহার যুক্তিগুলিকে হতবল করিতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতরূপ—ধর্ম্মপূজার যে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শূন্য-পুরাণে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইঁহাকেই

১, মদনপালের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে দ্বিতীয় মহীপালের কীর্ত্তিগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত। 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গান'—এই প্রবাদ বাক্যও অনুশাসনোক্ত কথার সমর্থন করিতেছে।

ধর্ম্মপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে ধর্ম্মপূজার চারিটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সত্যযুগে শেতাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ৪০০; দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১২০০; এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন, উহা চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে উপবীত ধারণ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঠাকুরের পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাম্রধারণও তদ্রূপ। রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এই তাম্রদীক্ষার প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা ছত্রিশ জাতিকে তাম্রদীক্ষা প্রদানের অধিকারী। রামাই পণ্ডিত ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসের চারিপুত্র—মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। ইঁহাদের বংশধরগণ নানা স্থানে বিদ্যমান আছেন এবং ধর্ম্মসেবক-সম্প্রদায়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

শূন্য-পুরাণে একান্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জলপাবন, টীকাপাবন, অধিবাস, ধুনাজ্বালা, সন্ধ্যাপাবন, ঢেঁকিমঙ্গলা, গান্তারীমঙ্গলা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্ত্তী অনেক লেখক কারুকার্য্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদিকবির রচনা অবিকৃত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"জতদূর ধর্ম্মর ওঁকার জান। গারস্তের মহাপাপ দুরত পলান।"

কিংবা,—

"হে মধুস্থদন বার ভাই বার আদিত্ত হাত পাতি লেহ সেবকের অর্ঘপুষ্পপানি সেবক হব সুখি ধমাৎ কন্নি গুরুপণ্ডিত দেউলা দান পতি মাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডার-পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িল জঅ জঅকার।"

প্রভৃতি রচনা প্রাচীন ও জটিল এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না। এইরূপ ভাবের রচনা মাঝে মাঝে এই পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বয়ং নগেন্দ্রবাবু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সেই সকল রচনার অর্থ ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ শব্দ অর্থভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থবাচক হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিতেন। বুদ্ধ শব্দের দ্বারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে আধুনিক কালের পৌরাণিক দেবদেবীর যে সম্বন্ধ, জগৎপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সমস্তই বুঝায়, তদ্রূপ সদ্ধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ধর্ম্মপূজা—ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্নের তৃতীয় সঙ্ঘ—শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম্মপূজায় স্থান পাইয়াছে। শূন্য-পুরাণের ৮৩ পৃষ্ঠায় এই "সংখ" সম্বন্ধে বিস্তৃত পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূন্য-পুরাণে পুপ্প (পুষ্প), পসন্ন (প্রসন্ন), ছীফল (শ্রীফল), বজ্জ (বজ্র) প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের অবধি নাই। যাঁহারা এই পুস্তক যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন সমাজ ও ভাষার বিচিত্র প্রকারের নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "নিরঞ্জনের রুস্মা" শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্ত্তী যোজনা। শূন্য-পুরাণের প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথির মধ্যে একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে। উহা এরূপ অদ্ভুত যে, আমরা উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীনিরঞ্জন রুস্মা

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন॥ ১
মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্ন যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥ ২

মালদহে মাগে কর না চিনে রাপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস॥ ৩
বেদ করে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥ ৪
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার॥ ৫
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥ ৬
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার॥ ৭
ব্রহ্মা হৈল মহাঁম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি॥ ৮
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা॥ ৯
আঁপুনি চণ্ডিকা দেবী তিহ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর।

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ১০
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাথর বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১

কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

(২) নাথ-গীতিকা
ময়নামতীর গান ও গোরক্ষ-বিজয়

১৮৭৪ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে (প্রথম ভাগ, ৩নং, ১৮১ পত্র) বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব মাণিকচাঁদের গীতি শীর্ষক একটি বঙ্গীয় পল্লীগাথা প্রকাশিত করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকচাঁদ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এই গাথায় কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা প্রধানতঃ হিন্দু-রাজত্বের প্রথা। আমি এই সকল যুক্তির উল্লেখ করায় গ্রীয়ারসন সাহেব, আমার সঙ্গে একমত হইয়া মাণিকচন্দ্রকে একাদশ শতাব্দীর লোক মনে করিয়াছেন।[১]

কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। "বঙ্গালদেশের" রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাঁহার জয়গাথা তিরুমলয়ের শৈল লিপিতে উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবতঃ ১০২১-১০২৩ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোলবাহিনী বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল। ঢাকা সাহিত্য

১. ১৮৯৮ সনের ২৬শে জুলাই-এর পত্রে মান্যবর গ্রীয়ারসন সাহেব লিখিয়াছেন:
"I think that in my former letter I have omitted to thank you for the corrections which you have made to my edition of the *Manik Chandra Rajar Gan* which appeared in 1887. I now quite agree with you that its origin must be referred to Buddhist influence."

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণ দেশের কোন রাজার যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ আছে, কিন্তু বাঙ্গালী কবি রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে বিজয় লক্ষ্মী কাহার অঙ্ক-শায়িনী হন, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিরূপণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়। কবি ও স্তাবকবৃন্দ সত্যের অপলাপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না এবং অনেক সময় শৈল-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির ঘোষণাকেও আমরা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অনেক সময় পাষাণাশ্রিতা মিথ্যা কালজয়ী হইয়া অমর হইয়া থাকে।

গোবিন্দচন্দ্রের সময় নির্দ্দেশ।

সে যাহা হউক গ্রীয়ারসন সাহেব যে পল্লীগাথা প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে।

এখন গোরক্ষ-বিজয় নামক আর একখানি পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা পরে লিখিব। ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানা আকারে একই পুঁথির পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিস্তর পাঠান্তর সত্ত্বেও এগুলি যে একই প্রাচীন গাথার রূপান্তর, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের গাথা ভারত-বিশ্রুত। গোবিন্দচন্দ্র একই পুঁথিতে কোথাও বা গোবিন্দচন্দ, কোথাও বা গোপীচন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং এই পৃথক নামধারী ব্যক্তি যে এক ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইহার সন্ন্যাস-জনিত করুণ মর্ম্মস্পর্শী গীতি সমস্ত ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক সময় করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ইনি সাধারণ লোক ছিলেন না। এই গাথা কে কখন রচনা করেন, জানা যায় নাই, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ কোন ধর্ম্মগুরু বা বীরের চরিত তাঁহার জীবিত থাকার কালে অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়া থাকে। রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে সম্পাদিত পুঁথিতে ভবানী দাসের নাম ভণিতায় পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরচিত একটি গাথার সঙ্কলয়িতা

গোরক্ষ-বিজয়।

দুর্ল্লভ মল্লিক তাঁহার নাম ভণিতায় দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দুর্ল্লভ মল্লিক প্রাচীন কবিগণেরই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক স্বীয় গাথায় আবৃত্তি করিয়াছেন।

একখানি গোবিন্দচন্দ্রের গীতি ময়ূরভঞ্জ হইতেও পাওয়া গিয়াছে, উহা ওড়িয়া ভাষায় লিখিত। এই প্রসঙ্গ লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে এখনও নাটক রচিত হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রাজচিত্রকর রবিবর্ম্মা "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" শীর্ষক যে ছবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

ময়নামতীর গানের প্রচার।

ভাগলপুর, কাশী এমন কি পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দী-ভাষায় বিরচিত "গোপীচাঁদকা পুঁথি"র প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি (১৭১৫—১৭৯০ খৃঃ অঃ) এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার "সন্তলীলামৃত" ও পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ "গোপীচাঁদ-নাটক" (১৮৬৯ খৃঃ অঃ) রচনা করিয়াছেন। যে বঙ্গীয় রাজাকে লইয়া সমস্ত ভারতবাসী এক সময়ে প্রমত্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর নিকট সে কাহিনী অবশ্যই শ্রুতি-সুখাবহ ও আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল, চৈতন্য-ভাগবতকার ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রচলিত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি পালরাজবর্গের গাথা সম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই গোবিন্দচন্দ্রের গান তাহারই অঙ্গীয়, কিন্তু গোরক্ষ-বিজয় আবিষ্কারের পর আমাদের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র আদৌ পালরাজগণের কেহ ছিলেন কিনা তাহা সন্দেহ-স্থল;

গোপীচন্দ্র কোন বংশীয়?

আমাদের বিশ্বাস তিনি পালরাজগণের কেহ নহেন। ইহার পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। আমরা বঙ্গীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্রের নাম তাম্রশাসনে পাইয়াছি। তাম্রশাসনে আবার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই দুই নামই আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটি নামের গোপীচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের নামের সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র, তথা গোপীচন্দ্রকে আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়া অনুমান করি। নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিষ্ঠিত। ঐ বিহারের নিকট সুবর্ণচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ এখনও বিদ্যমান এবং তথাকার একটি শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাম্রশাসনের তারিখ সমর্থন করিতেছে। মাণিকচন্দ্র বিবাহ-সূত্রে মেহের-কুলের (ত্রিপুরা রাজ্যের) উত্তরাধিকার লাভ

করেন এবং পিতৃরাজ্য বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান। ত্রিপুরার পার্শ্বে যে বিস্তৃত শৈল-মালা দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোবিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত গৌড়ের সমীপবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ ইজারা লইয়াছিলেন, এজন্য রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহার কীর্ত্তিকথা জাগরূক। আমরা এই সমস্ত তত্ত্বই ময়নাবতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

মহীপাল প্রভৃতি পালরাজগণের গাথা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, তেওতার স্বর্গীয় প্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় এবং অপরাপর কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি যে, রঙ্গপুর রাজবংশীয়গণ এবং অপরাপর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও মহীপালের গান প্রচলিত আছে। যাঁহারা এদেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহীপালের গান উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটা অন্ধকার দিক অনায়াসে উজ্জ্বল করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন।

মহীপালের গান।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের গানের এই ভারত-ব্যাপী প্রচলনের কারণ কি? স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার মতে ইঁহারই চলিত নাম গোপীচন্দ্র হইতে "গোপীযন্ত্রে"র নামকরণ হইয়াছে—বস্তুতঃ ব্রজবাসিগণের সঙ্গে এই যন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। এই গাথাতেই আমরা প্রমাণ পাইতেছি, গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন; ইঁহার যখন কৈশোর তখন যতি গোরক্ষনাথ তিলকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেন, তখন বালিকার নাম ছিল শিশুমতি। গোরক্ষনাথ কৃপাপরবশ হইয়া শিশুমতিকে সেই অল্প বয়সেই দীক্ষা প্রদান করিয়া 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দেন। 'মহাজ্ঞান' প্রভাবে মৃতকে জীবন দান করা যাইতে পারিত। শিশুমতির গুরুদত্ত নাম ময়নামতী।

গল্প-সার।

মানিকচন্দ্র ময়নামতীকে বিবাহ করিবার পরে উক্ত রাজকন্যা স্বামীকে 'মহাজ্ঞান' শিখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'এই জ্ঞান প্রভাবে চিরায়ু হওয়া যায় এবং রোগ শোক দূর হয়'—ময়নামতী এই ভাবের নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াও স্বামীকে 'মহাজ্ঞান' গ্রহণে সম্মত করিতে পারেন নাই। মাণিকচন্দ্র

সর্ব্বদাই উত্তরে বলিয়াছেন, 'স্ত্রীকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট মাথা হেঁট করার অপেক্ষা পুরুষের আর কি অধিক অবনতি হইতে পারে ? আমি তোমাকে কিছুতেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।' কালক্রমে ময়নামতী প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করিলেন এবং মাণিকচন্দ্র ত্রিপুর-রাজগণের বহুবিবাহের চিরন্তন প্রথা পালন করিয়া আরও চারটি প্রধানা এবং ১৮০টি সামান্যা ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা নব যৌবন দৃপ্তা ; দেব-পুরের কন্যাগণের সঙ্গে ময়নামতীর কলহ বাধিয়া গেল। মাণিকচন্দ্র রূপ-যৌবনের সমুচিত মূল্য প্রদান করিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ময়নামতী স্বামী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া "ফেরুসা" নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মাণিকচন্দ্রের আসন্ন সময় উপস্থিত হইল, তখন ময়নামতী রাজ-প্রাসাদে আহূত হইলেন ; রাজার নিদারুণ পিপাসা, ময়নামতীকে তিনি হীরামাণিক্য-খচিত লক্ষ টাকা মূল্যের ভৃঙ্গ (ভৃঙ্গার) প্রদান করিয়া গঙ্গায় জল আনিতে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে যমদূত আসিয়া রাজার প্রাণ বাঁধিয়া লইয়া গেল। এক দীর্ঘশ্মশ্রু বাঙ্গালমন্ত্রীর উপদেশে রাজা প্রজা পীড়ন করিতেছিলেন। প্রজারা ধর্ম্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়া রাজার মৃত্যুর জন্য অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, সুতরাং রাজা অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। ময়নামতী স্বামীর অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ কল্পে যমরাজ এবং তাঁহার দূতকে যথেষ্ট প্রহার-অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাণিকচন্দ্রের জীবনের উপর শেষ যবনিকা পতিত হইল। পিতার মৃত্যুর সময় গোবিন্দচন্দ্র মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু রাণী ময়নামতীর হস্তে শাসনভার রহিয়া গেল।

গোবিন্দচন্দ্র ঢাকার অন্তঃপাতী সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরমা সুন্দরী কন্যা অদুনাকে বিবাহ করেন এবং উক্ত রাজার দ্বিতীয় কন্যা পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গানে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহার এক কন্যাকে গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরূপে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনাই গোবিন্দচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোবিন্দচন্দ্রের যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তখন ময়নামতী তাঁহাকে ১২ বৎসর কালের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, ইহা গোবিন্দচন্দ্রের

মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। অল্পবয়স্কা রাণীরা এই সন্ন্যাসের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন, এমন কি ময়নামতীকে কোনরূপে বিরত করিতে না পারিয়া তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া বৃদ্ধাকে বিষ প্রয়োগ করেন। কিন্তু ময়নামতী 'মহাজ্ঞান' প্রভাবে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়িজাতীয় এক সিদ্ধ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইল। বৃদ্ধা রাণীর প্রবল যুক্তি এই ছিল, ১৮ বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর কাল প্রবাসে না কাটাইলে ১৯ বৎসর বয়সে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু। অদৃষ্টের এই নিদারুণ লিপি খণ্ডনের আর উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাস উপলক্ষ্যে অদুনার বিলাপ কারুণ্যের নির্ঝর। প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য হইতে সেই মর্ম্মান্তিক কষ্টের ঝরণা বহিয়া আসিয়াছে। আমরা গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত গাথা হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পড়ে কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালি॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মাও বইন রবে স্বামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিত কলঙ্ক রাও।
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও॥
জীয়ন জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বামি বলিমু॥
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥

হাত খানি দুঃখ হইলে পাএ খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা স্থতি ভুঞ্জিমু এস্থতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥"

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছেন,—

"কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়।
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায়॥
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়॥
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্মামির পদতল॥
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা॥
যখন আছিনু আমি মা বাপর ঘরে।
তখনি কেন ধর্ম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে॥
এখন হইনু রূপর নারী তোর যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ॥"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর গোবিন্দচন্দ্র বহু কষ্ট সহ্য করেন। হীরা নাম্নী একটি রূপসী ধনাঢ্য গণিকা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিফল-প্রযত্ন হইয়া অবশেষে তাঁহাকে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত করে। তাঁহাকে দূর হইতে ভারে করিয়া জল আনিতে হইত। একদা জল আনয়নের সময় তাহার মনে হইল, দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। তখন উরুদেশের একটুকু স্থান কর্ত্তন করিয়া সেই রক্ত দ্বারা একটা কাঠিকে কলম স্বরূপ ব্যবহার পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন এবং পায়রার দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় গুরু হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। যখন বহুবর্ষ পরে তিনি স্বীয় রাজ-প্রাসাদে সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হন, তখন অতুনা তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। অন্তঃপুরীতে অপরিচিতের প্রবেশের হঠকারিতার জন্য রাজহস্তীকে তাঁহাকে পদদলিত করিতে নিযুক্ত করেন এবং রাজপুরীর বৃহৎ সারমেয়কে তাঁহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। রাজহস্তী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া শুণ্ড দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রাজভক্তি জানাইল। সারমেয় লাঙ্গুল হেলাইয়া রাজ-সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

তখন অদুনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "বনের পশু প্রভু তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু মন্দভাগিনী আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এই গানে কতকগুলি বিষয় এরূপ আছে যাহাতে রাণী ময়নামতীর উপর শ্রদ্ধা হইতে পারে না। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব হইলে গোবিন্দচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তিনি কিছুতেই হাড়িসিদ্ধার মন্ত্রশিষ্য হইতে সম্মত হইতে পারেন না; একে সে অতি নীচ জাতি, তাহার উপর যে তাঁহারই রাজধানীর হাটবাজারের জঘন্য স্থানগুলি পরিষ্কার করিয়া বেড়ায়, তিনি রাজাধিরাজ হইয়া কি প্রকারে সেই হাড়িসিদ্ধাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারেন? রাণী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া হাড়ির অলৌকিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র স্বয়ং তাহাকে ব্যজন করেন। সোণার খড়ম পায়ে পরিয়া হাড়ি নদীতে হাঁটিয়া বেড়ায়। "চাঁদের পিঠে আঙ্কে বাড়ে, কুরুমের পিঠে খায়"—ইত্যাদি নানারূপ গুণপনার উল্লেখ করিয়া ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার প্রতি রাজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে যত্নপর হন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র এই প্রসঙ্গে রাণীর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন—তিনি বলেন, "আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

ময়নামতী ব্যভিচারিণী কি না?

"হাড়ির খাইছেন গুয়া মা হাড়ির খাইছেন পান।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গিয়ান॥
হাড়ির গিয়ানে তোমার গিয়ানে জননী একস্তর করিয়া।
আমার পিতাকে মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইআ॥
বুদ্ধি পরামিশে আমাকে বনে পাঠাইআ।
গুয়া বীচি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া॥
হাটে গেছেন বাজারে গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই?
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হএ।
সত্য রাজার পুত্র নাঁও পাড়ানু হএ॥"

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—মা! তুমি এই হাড়ির হস্তের তাম্বূল ও গুবাক গ্রহণ করিয়াছ এবং তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া তাহার 'মহাজ্ঞান' শিখিয়া লইয়াছ। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার পিতাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছ এবং পুনরায় তাহারই সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে বনে পাঠাইয়া উহার সঙ্গে

নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগের সংকল্প স্থির করিয়াছ। আমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি তাহার চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হইলে না কেন? তুমি যদি সহমৃতা হইতে, তবে বুঝিতাম আমি সত্য রাজপুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি।"

এই গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া রাণী অবশ্য পুত্রকে অভিসম্পাত ও ভৎ'সনা করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হাড়িসিদ্ধা এবং আমি উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য, সেই সম্পর্কে সে আমার গুরু ভাই, পুত্র হইয়া এই ভাবে মাতৃ-চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, এমন পুত্রকেও আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়া পোষণ করিয়াছিলাম!"

এমন হইতে পারে গোবিন্দচন্দ্রের অদুনা প্রভৃতি মহিষীগণ বৃদ্ধা ময়নামতীর বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত ছিলেন যে, তাঁহারা একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'গোরক্ষ-বিজয়' ময়নামতীর দলভুক্ত নাথ-সম্প্রদায়ের লেখা। সেই পুস্তকে লিখিত আছে, যখন হাড়িসিদ্ধা পার্ব্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করেন—"আমি তোমার মতন রূপসী রমণীর প্রেমলাভ করিতে পারিলে, নীচ হাড়ির কাজ করিতেও প্রস্তুত আছি", পার্ব্বতী তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তথাস্তু, তুমি মেহেরকুলে গমন কর, তথায় রাণী ময়নামতী আমার মতই সুন্দরী, তুমি তথায় হাড়ির কার্য্য করিবে এবং উক্ত রাণীর প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।" ঐ পুস্তকের অপর এক স্থানে উল্লিখিত আছে, কানফা নামক যোগীকে গোরক্ষনাথ জানাইতেছেন যে, হাড়িসিদ্ধা ময়নামতী রাণীর সঙ্গে চরিত্র ঘটিত দোষে ধৃত হইয়া রাজা গোবিন্দ-চন্দ্র কর্তৃক কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। সুতরাং ময়নামতীর দলভুক্ত লেখকগণ এই কলঙ্ক-কথাকে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এইরূপ কুলটা, পতিহন্তারিকা এবং পুত্রনির্ব্বাসনকারিণী রমণীই গোবিন্দচন্দ্রের গীতিকার শ্রেষ্ঠা নায়িকা। আমরা প্রাসঙ্গিক ভাবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি জানিতে পারিয়াছি মাত্র। কিন্তু এই সকল গাথার সর্ব্বত্র ময়নামতীর ও হাড়িসিদ্ধার অজস্র প্রশংসোক্তি; তাহাদের অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার জন্যই যেন সকল গাথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহাজ্ঞানের প্রভাব দেখাইবার জন্যই যেন সকল গাথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহাজ্ঞানের গুরু গোরক্ষনাথ এবং তাঁহারই শিষ্য যোগিগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই গাথার প্রচার করিয়াছিলেন।

গোরক্ষনাথ মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক, কারণ তদীয় মহিষী তাঁহার শিষ্যা, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। ডাক্তার ভাণ্ডারকার অনুমান

করেন, গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন,—এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রকারের অনুমান ও মত-ভেদ আছে। ইনি মীননাথের শিষ্য, কাহারও কাহারও মতে মীননাথের বাড়ী বাখরগঞ্জে ছিল এবং তিনি দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে নানারূপ বাদানুবাদের গহনবনে প্রবেশ না করিয়া আমরা এখানে আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তই লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর লোক ও তিনি পাঞ্জাবে জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত-পুস্তক আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষ-সংহিতাই শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। যে কয়েকখানি বঙ্গীয় গোরক্ষ-বিজয়ের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিই ২৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া চারিজনের নাম ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে,—কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন। ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুঁথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট হন। সুতরাং ফয়জুল্লাকে আমরা "গোরক্ষ-বিজয় বা মীনচেতন" পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া মাল্য-চন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'আদি লেখক' অর্থে আমরা শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই। যেরূপ শীতান্তে বকুল-গাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সূতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া লয়; সেইরূপ "গোরক্ষ-বিজয়" ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোণে পড়িয়াছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই প্রাচীন দ্বাদশ শতাব্দীর রচনার অনেকাংশ এখনও ইহাতে বিদ্যমান।

গোরক্ষনাথ।

গোরক্ষ-বিজয় বা মীনচেতন।

গোরক্ষ-বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র; তাহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্র-বল, উচ্চ নীতি, গুরু-ভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমা-চিহ্ন, গোরক্ষ-বিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগ-নির্দ্দেশক চিহ্ন। এই চিহ্নের পর ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন

রাজ্যের এলাকা, তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য মন্থন করিতেছেন; গ্রাম্যভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও প্রেম কুসুমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন। এই অপূর্ব্ব পুঁথির গ্রাম্যভাষা ও রুচি যে পাঠককে শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন। গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটি একটি করিয়া জয় করিয়া ইহুদীশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুণ্ঠিতভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্যের ও প্রেম-নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাহার চরিত্র কতবার কষিত হইল,—কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাঁটি সোনা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন্ ছার! অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন, মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষ-নাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চ শির হেঁট হইল।

গোরক্ষনাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলী-পত্তনে তাঁহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, "কায়া সাধ" উপদেশ বারংবার মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলী-পত্তনের রাজ-প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিল তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন। যে চরিত্র-বল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্গীয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। যেমন অশোক-স্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন,—এই পুস্তক তেমনই নাথধর্ম্মের একটি গৌরবজনক নিদর্শন। এই নাথধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়া গিয়াছিল। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গানে বৌদ্ধ মহাযানের অনেক কথাই পাওয়া যাইতেছে। হাড়িপার উপদেশগুলির অনেকগুলিই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের নীতিসূত্র। দুর্লভ মল্লিকের পুস্তকে হাড়িপা শূন্য হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং অহিংসা যে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, তাহার বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষ তাহার গুরুকে ৩১টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—প্রশ্নগুলি এইরূপ: "দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?"; "শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় চলি যায়?"; "সুগন্ধিচন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাএ? * ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির অনেকই "সন্ধ্যা-ভাষায়" বিরচিত এবং যোগ সম্বন্ধীয়,—যথা * "অজপা কাহারে বলে জপে কোন জন।" * এই 'অজপা' শব্দের অর্থ করিতে হইলে তন্ত্র-শাস্ত্রের

কোনটিতে আমরা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানফা প্রভৃতি নাথ-গুরুগণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাইয়াছি। ধর্ম্মমঙ্গলগুলির সহিত বর্ত্তমানে আলোচ্য গাথাগুলির এক সৌহার্দ্দসূত্র টের পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মগত কোন প্রকার ঐক্য যে বিদ্যমান ছিল তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ জনসমাজে তখনও রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। অনেক রমণীর বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও চক্ষু নীলোৎপলের ন্যায় নহে, কাহারও ওষ্ঠ পক্ক বিম্বকে কিম্বা কাহারও দন্ত দাড়িম্ব বীজকে লজ্জা প্রদান করে না। ইঁহাদের সুদীর্ঘ কেশপাশ কালভুজঙ্গ হইয়া নায়ককে দংশন করে না। অনেক বীরের বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও ভুজ আজানুলম্বিত অথবা শালসম নহে। গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দশনপংক্তি অতি সুন্দর, গ্রাম্য কবি তাহাদিগকে শোলার সহিত উপমা দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই গ্রাম্য ক্ষেত্রের, গ্রাম্য পশু পাখী প্রভৃতির কথা। পরবর্ত্তী সাহিত্যে বঙ্গভাষার উপরে সংস্কৃত শব্দের যে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই সকল গাথায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চিরপরিচিত বঙ্গ কুটির, মেয়েলী ছড়া, প্রাচীন প্রবাদবাক্য এই সমস্ত গাথার প্রাণ স্বরূপ এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রী সামান্য বসন পরিহিতা বঙ্গীয় পুর-স্ত্রীর মতই অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের নিজস্ব জিনিষ বুঝিতে শিখি, তবে সামান্য হইলেও এই পল্লীগাথাগুলি প্রিয় মনে করিব। এইটুকু জানা দরকার যে, আপাত সামান্যবৎ প্রতীয়মান ক্ষুদ্র জিনিষও প্রিয়জনের চক্ষে মহার্ঘ হইতে পারে।

এই পুস্তকগুলিতে হিন্দু-রাজত্বের সময়কার অনেক সামাজিক রীতিনীতির প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। বিশ্বেশ্বরবাবুর সংগ্রহে ময়নামতী স্বয়ং হাটবাজারে যাইতেন, এরূপ দৃষ্ট হয়। নলিনীবাবুর সংগ্রহে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে হইলে নিজেরা দোকানে উপস্থিত হইতেন। ইহা দ্বারা অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস খোল বা মৃদঙ্গ বৈষ্ণবেরা আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে এই প্রদেশ মৃদঙ্গ শব্দে মুখরিত হইয়া আসিতেছে। 'কৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণ স্বয়ং বংশী ত্যাগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া গোপীর মন ভুলাইতেছেন এবং গোরক্ষ-বিজয়ের স্বয়ং গোরক্ষনাথ খোলের মুখে এরূপ ধ্বনির উদ্ভব করিতেছেন

যেন তাহা কথার ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া বাদকের মনের ভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে। সুতরাং বহুপ্রাচীন কাল হইতে যে এই বাদ্যের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ময়নামতীর গানে দৃষ্ট হয়, প্রজারা সদাশয় রাজার রাজত্ব কালে এরূপ সম্পন্ন হইত যে সামান্য লোকের ছেলেরা সোনার ভাটা (বল) লইয়া ক্রীড়া করিত এবং কৃষকগণও পুষ্করিণী কাটাইয়া—নিজের রাস্তাঘাট নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইত, পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকিত না। ব্যবসায়িগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলে হাতী কিনিয়া ফেলিত এবং ধনাঢ্যগণ গৃহ-প্রাঙ্গণে হীরা, মণি, মাণিক্য রৌদ্রে শুকাইতে দিত। এই সকল পুস্তকে আরও দেখা যায় যে সমস্ত দেশময় তান্ত্রিক আচার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথায় কথায় লোকে অগ্নিপরীক্ষা, তপ্ততৈল-পরীক্ষা কিম্বা বিষ প্রয়োগ পরীক্ষার সহায় লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিত। অভিচার দ্বারা শত্রুবিশেষকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টাও সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত। রাজাদের পাশাখেলা একটা ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্ব্বদা থাকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, অনেক সময় বস্ত্রাদির ন্যায় উহা টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত-বিরহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহুদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে—"পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিকে দেয় পাঁতি।"

রাজসভার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দৃষ্ট হয় রাজাকে ঘিরিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য পণ্ডিতগণ উপবেশন করিতেন। সম্মুখভাগে রাজগুরু বসিতেন। এক পার্শ্বে ভাটরাজগণ গাথা গাহিত এবং অপর পার্শ্বে প্রধান সচিব আসীন থাকিতেন। রাজার পশ্চাতে "আরণি" ও ছত্রধারকের স্থান ছিল এবং তাহাদের সহিত সমসূত্রে জলের গাড়ু, পানের বাটা এবং ব্যজনী-বাহক ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া থাকিত। সভার উত্তর দিকে সম্ভ্রান্ত বণিকগণ উপবেশন করিতেন এবং পশ্চিম দিকে সাধু সন্ন্যাসিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রজাগণ উপস্থিত হইয়া অভিযোগাদি করিত। প্রত্যহ রাজ-ভাণ্ডারী রাজাকে আয়-ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব শুনাইত। (বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, প্রথম ভাগ, ৯৭ পৃ.)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তন্ত্রাদির প্রচলন দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সকল

অলৌকিক ব্যাপারের কাহিনীর উপর লোকের আস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ যুগের য়ুরোপীয় পল্লীগাথাতেও প্রায় সেইরূপ অনেক অলৌকিক উপাখ্যান পাওয়া যাইতেছে ; তাহাদের কোন কোনটির সঙ্গে বঙ্গীয় পল্লীগাথার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ময়নামতীর গানে রাণীর নানাপ্রকার আকৃতি গ্রহণ করিয়া গোদাযমকে অনুসরণ করার উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। ময়নামতী যমদূতকে তাড়াইয়া নদীতে লইয়া গেলেন, যমদূত ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িল। রাণী মহিষরূপ ধারণ করিয়া দূতকে জলের মধ্যে তাড়া করিলেন। যমদূত শফরী হইয়া নদীতরঙ্গে মিলাইয়া গেল, রাণী 'পানকউড়ি' হইয়া শফরীকে আক্রমণ করিলেন। যমদূত চিংড়ী মৎস্য হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিল, তখন ময়নামতী রাজহাঁস হইয়া চিংড়ীকে তাড়া করিতে লাগিলেন, তারপর আরও নানা রূপ-পরিবর্ত্তন করার পর যমদূত পায়রা হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, ময়না বাজ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর গোদাযম বৈষ্ণবের রূপ ধারণ করিয়া ভেকাশ্রিতগণের মধ্যে যাইয়া বসিল, রাণী মৌমাছি হইয়া সেই ছদ্মবেশী বৈষ্ণবের টিকির উপর বসিয়া মস্তকে হুল ফুটাইয়া দিলেন। (বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, প্রথম ভাগ, ৩৯ পৃ.)। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বেদে তিষ্টাকন্যা সরণার অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন এবং বিবস্বানের অশ্বরূপে তার অনুসরণ ; শিবিরাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতরূপ স্বীকার ; ধর্ম্মগুপ্ত-কন্যা সোমপ্রভার কথা (কথা-সরিৎ-সাগর, ১৭শ তরঙ্গ) প্রসঙ্গে অগ্নিদেব ও গুহচন্দ্রের ভৃঙ্গরূপ ধারণ প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ম্যাবিনজিওন নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (ট্যালিসিন, ৩৫৯ পৃ.) কারিডওয়েন সম্বন্ধীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

"গুইনবাচ্‌কে পলাইতে দেখিয়া কারিডওয়েন তাহাকে অনুসরণ করিল। গুইনবাচ্‌ অনুসরণকারিণীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য একটি খরগোশ রূপ ধারণ করিয়া দ্রুত যাইতে লাগিল। কিন্তু কারিডওয়েন সারমেয় রূপ ধরিয়া খরগোশের অনুসরণ করিল। প্রাণ ভয়ে গুইনবাচ্‌ একটি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নদীতে পড়িল। কারিডওয়েন পানিকউড়ী হইয়া মৎস্যকে অনুসরণ করিল। গুইনবাচ্‌ তখন পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কিন্তু কারিডওয়েন বাজ হইয়া পক্ষীকে অনুসরণ করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না পাইয়া তাড়িত ব্যক্তি একটা গোলার নিকট যবরাশির মধ্যে একটা যবের

দানা হইয়া মিশিয়া গেল। কিন্তু কারিডওয়েন একটি কৃষ্ণকুক্কুটীর রূপ ধরিয়া যবের প্রত্যেকটি দানা খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল।"

গেলিক দেশের নানা আখ্যানে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে। টুরিএনের পুত্রগণ কর্তৃক হেস্‌পেরিডেস্ উদ্যানের তিনটি আতা হরণের গল্পে লিখিত আছে; "সে দেশের রাজার তিন কন্যা ছিল, তাহারা মন্ত্রতন্ত্র জানিত। তাহারা মন্ত্রবলে ভোঁদড় হইয়া বাজরূপধারী তিন রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজকুমারগণ বাজরূপ ছাড়িয়া সারসরূপ ধারণ করিলেন এবং সমুদ্রের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন।" (চারলস্ স্কোয়ার, কেল্‌টিক মিথ্ এ্যাণ্ড লিজেণ্ড, ৯৯ পৃ.)।

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গীয় বহু উপাখ্যানের সঙ্গে য়ুরোপীয় গল্পের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস এই সকল উপাখ্যান ও মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভারতবর্ষ হইতে অপরাপর দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কি উপায়ে ভারতবর্ষ এই সকল আখ্যান বিদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আরবগণ হিতোপদেশ, জাতক এবং কথা-সরিৎ-সাগরের গল্প য়ুরোপে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের পল্লীগাথা কি সেই উপায়ে বিদেশে গিয়াছিল? ঢাকার মস্‌লিন যে জাহাজে বিদেশ গিয়াছিল, এই সকল গল্প কি তাহাতেই রপ্তানি হইয়াছিল? বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে লুরি নামক বংশীবাদকের দল এদেশ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপ প্রভৃতি নানা রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখন জিপ্‌সি নামে পরিচিত, ইঁহারাই কি এই সকল আখ্যানের বাহক হইয়াছিলেন?

ক্রুসেডের সময় য়ুরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে এসিয়াবাসিগণের একবার ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস ভরতের অনেক গল্প এই সময়ে য়ুরোপে প্রবেশলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় রামায়ণের ভস্মলোচনের সঙ্গে গ্যালিক উপাখ্যানের ব্যালর নামক অপদেবতার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় এবং আমরা বহুসংখ্যক প্রাচীন বঙ্গীয় গল্পের সঙ্গে য়ুরোপ প্রচলিত গল্পের আশ্চর্য প্রকারের মিল পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি "The Folk Literature of Bengal" নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

(৩) কথা-সাহিত্য

বাঙ্গালার কতকগুলি নিজস্ব ব্রতকথা ও রূপকথা আছে যাহা বহু প্রাচীন। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষ-বিজয়ের ন্যায় তাহাদের ভাষাও রূপান্তরিত

হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তন্মধ্যে অতি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন আছে। সেগুলি কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোন ঠিক সংবাদ দিতে না পারিলেও আমরা দেখাইব, যে যুগে বাঙ্গালীর ডিঙ্গা বহর বাঁধিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিত ; যে যুগে সাধু বা বণিকের এদেশে প্রায় রাজ-সম্মান ছিল ; যে যুগে রাম, লক্ষ্মণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রগুলি এদেশের কল্পনা মুগ্ধ করে নাই,—যে যুগে শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে শিবঠাকুর ষোড়শশত গোপিনী লইয়া মথুরায় নৌ-বিহার করিতেন এবং শিবের পরিবর্ত্তে সূর্য্যদেব গৌরীর পাণিগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইতেন,—যে যুগে ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের পরিবর্ত্তে থুয়া, ভাদালি, ধাতা-কাতা প্রভৃতি গ্রাম্য অনার্য্য দেবতা এদেশের মহিলাগণের নিকট ভোগ ও পূজা পাইতেন,—যে যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা স্বামী পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে পাঠাইয়া অবিরত গ্রাম্যদেবতাগণের নিকট তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিত এবং বলি 'মানসিক' করিত,—পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বৌদ্ধ-শক্তির পরিণতির সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করিব।

কথা-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব।

প্রথম প্রমাণ ভাষা। ভাষা রূপান্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও রহিয়া গিয়াছে ; যথা প্রাচীন "থুয়া" এবং "ভাদালি" ব্রত কথায় * "থুয়া পুজি থুয়ালী। অঘন মাসের ভুঞালী॥ অকালে ভাতন্তী। অকালে পুতন্তি।" "ঢেকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত।"; * যথা সূর্য্যগাথায়— * "আজ যা গৌরী কান্দ্যাকাট্যা। কাইল আইস গৌরী হাস্যারস্যা। গৌরীর মা কাঁদে কাটে। হাজার টাকা গাইড়ে বাঁধে।" "তিন থ্যাকর থ্যাকনা। তিন ঝাকর ঝাঁকনা॥" * (শঙ্খমালা)।

এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রত-কথার ভাষা বিশেষ প্রাচীন, কারণ তন্ত্রমন্ত্রের ভাষা শুদ্ধ করিলে, তাহাদের শক্তির হানি হয়। সূর্য্যের গাথায় ভাষা একটুকু বেশী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কবিতার চরণ পয়ারের মত নহে, ছড়ার মত, সেইখানেই প্রাচীন রচনা বুঝিতে হইবে—অবশ্য পাঁচালীকারগণ সেই সকল ছড়ার অনুকরণে আধুনিক কালেও অনেক আখ্যান লিখিয়াছেন—সেই সকল আধুনিক রচনায় সংস্কৃত-কথার বাহুল্য দেখিয়া রচনা-কাল সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রাচীন ছড়া সে জাতীয় নহে। সেগুলি ডাক ও খনার-বচনের শ্রেণীর। কোন কোন স্থলে

এই গ্রাম্য কথাগুলিতে ময়নামতীর গান ও গোরক্ষ-বিজয়ের যুগের ভাষা অবিকল রহিয়া গিয়াছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাণী অদুনা স্বীয় যৌবন-শ্রী দ্বাদশ বৎসরে বিনষ্ট হইবে—সুতরাং সন্ন্যাসের সময় অতিবাহিত হইলে তিনি আসিয়া আর তাঁহাকে যুবতীরূপে পাইবেন না, এই কথা বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"ধান চাউল বসন নহে গোলা বান্দি থুমু।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে মাল যোগাইমু॥
বাদসাই যাচক নহে মোহর মারিমু।
মালী ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাথিমু॥"
তেলি ঘরের তেল নহে বাজারে বেচিমু।
সুতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু।
ধর্ম্মঘটী যৌবন মুহী কিরূপে রাখিমু॥"

শঙ্খমালার গল্পে শক্তির যৌবনসম্বন্ধে শঙ্খবণিকের ভগিনী কুজী বলিতেছে :—

"এত গোলার জিনিষ নহে যে গোলা ছাঁদিয়া রাখিব।
বাণিয়ার সিন্দুর নহে কৌটায় ভরিয়া থুব॥"*[১]

ব্রতকথায় ময়নামতীর গানের ন্যায়, ধর্ম্মঠাকুর অতি উচ্চপদে আসীন আছেন এবং রূপকথা ও ব্রতকথা এই উভয়েই "ধাতা-কাতা" দেবতার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ—এই সকল কথা ও গাথার মধ্যে অতীতের একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়াছে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল ; বণিকের আসন অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িল। পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসা-দেবীর ভাসান এবং চণ্ডী-মঙ্গল সমূহে সমুদ্র-যাত্রার যে বর্ণনা আছে তাহা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত, বহুপূর্ব্ব হইতে সমাগত কিংবদন্তী ও প্রবাদকে কবিগণ কল্পনাবলে রূপান্তরিত করিয়া সেগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ব্রতকথা এবং রূপকথার মধ্যে আমরা সমুদ্র-যাত্রার সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পাই। বর্ষার দুর্দ্দিনে যখন দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া ঘনঘটার আবির্ভাব হইত, প্রবল ঝটিকার সঙ্গে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকিত—তখন প্রবাসগত নিজজনের চিন্তায় বঙ্গললনার প্রাণ ব্যাকুল হইত, সেই ব্যাকুলতার প্রতিচ্ছায়া আমরা দেবতাগণের নিকট তাঁহাদের বহু আবেদন-নিবেদন ও চিন্তাকুল প্রার্থনায় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। রূপকথাগুলিতে সমুদ্র-যাত্রার

১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত শঙ্খমালার গল্প দ্রষ্টব্য।

প্রাক্কালে বণিক্-সীমন্তিনীরা কিরূপে স্বীয় কেশদাম উন্মুক্ত করিয়া স্বামিগণের পা মুছাইয়া দিতেন, আলিপনা দ্বারা গৃহ-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত করিতেন, নাবিকগণ কি ভাবে বণিককে জিজ্ঞাসা করিত, 'পরিবারবর্গের জন্য সংস্থান করা হইয়াছে কিনা, —প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লওয়া হইয়াছে কিনা, তাঁহারা সকলে আহ্লাদ সহকারে সম্মতি দিয়াছেন কিনা, দেবতাগণের ভোগের ব্যবস্থা ও দেবমন্দিরের "অষ্টচূড়া" অলঙ্কৃত করা হইয়াছে কিনা'—সেই সকল বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যেন একটি অতীত যুগের যথাযথ চিত্রপট আমাদের চক্ষের নিকট উদ্ঘাটিত হইতেছে। ডিঙ্গাগুলিকে তৈল সিন্দূর ও চন্দন পরান, তাহাদের মধ্যে "মধুকরে"র বিশেষরূপ অঙ্গরাগ করা, দিনরাত্র জ্বালিয়া রাখিবার জন্য পঞ্চদীপের ব্যবস্থা ও মণির ঝালর ও বণিকের নামাঙ্কিত পতাকার অজস্র ব্যবহার—এ সকলই যেন প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মনে হয়। বণিকগণের কপটতা ও প্রতারণার নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যেও যেন অনেকটা সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় :—

কোন হ বেনে দারচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।
কোন হে বেনে কাহনের বস্তু বেচে সিক্কার দরে॥
কোন যে বেনে 'খাওারা' পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
ওরে মহামাণিক্য, সাহা মাণিক্য কয়ে লোকেরে বিকোয়॥"

(ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯০ পৃ.)।

প্রত্যেক জাহাজের গুলুয়ে এক একটি চামর থাকিত। বহু ঘুন্টিতে বাঁধা কাছিগুলির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে এই সকল গল্পে অনেক কথা পাওয়া যায়। সমুদ্র-যাত্রাকালে সাগরের পূজা এবং বহু ছাগ বলি দিতে হইত।

এই যুগে রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র সামাজিক মর্য্যাদায় প্রায় সমকক্ষ। জাতিভেদ খুব প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বিবাহ-সময়ে জাতি-সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না। ভাটগণ পাত্র-পাত্রীর চিত্র লইয়া দেশ বিদেশে আনা-গোনা করিত।

তৃতীয় প্রমাণ—মুসলমানী বঙ্গ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের মুসলমানগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল। তাঁহাদের অনেকেই ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দী কিংবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও অনেকে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি ছাড়িতে পারেন নাই। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের এক শ্রেণীর মুসলমানেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

"প্রাতঃকালে ছড়া দেয় রে সাঁজ হৈলে বাতি। লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।"; "সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া। অসতির পতি যেমন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।" প্রভৃতি গান অনেকেই মুসলমান ফকিরের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। এই ছড়াগুলিতে অনেক স্থানে খুব প্রাচীনভাষার নিদর্শন আছে। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহের পর এই সকল ফকিরেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী শিখিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী থাকার সময় যাহারা এই পাঁচালী গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাদেরই বংশধরগণ সেই বৃত্তি এখনও অব্যাহত রাখিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, হিন্দু বা বৌদ্ধাবস্থার সময় তাহারা যে সকল পূজা করিত ও রূপকথা শুনিত—তাহার চর্চ্চা এখনও কতক পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এখনও তাহারা "জরাসুরের" গাথা গাইয়া থাকে এবং সাপের মন্ত্রগুলি তাহাদের একরূপ একচেটিয়া ; এই সকল মন্ত্র-তন্ত্র এবং গাথা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাগণের স্তুতিবাদে পূর্ণ, কিন্তু হইলে কি হয় ? এগুলি এখনও মুসলমানগণেরই একরূপ নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রাচীনকালে যে সমস্ত রূপকথা এদেশে প্রচলিত ছিল, মুসলমান হইয়াও রমণীগণ তাহাদের মাধুর্য্য ভুলিতে পারে নাই, তাহা তাহাদের শিক্ষার অস্থিমজ্জার মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব তাহারা এড়াইবে কিরূপে ?

একথা যদি বলা হয় যে, মুসলমান হওয়ার পর সেই সকল রমণীরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হিন্দু মহিলাগণের নিকট হইতে এইরূপ কথাগুলি শিখিয়া লইয়াছে, সে কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ নিষিদ্ধ মাংস, পিঁয়াজ, রসুণ প্রভৃতির ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের মধ্যে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে—যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা এখনও হয় না। এই সকল রূপকথার মধ্যে দেবদেবীর কথা অনেক আছে এবং নায়ক নায়িকারা সকলেই হিন্দু, এরূপ অবস্থায় মুসলমান মহিলারা কেনই বা হিন্দুর নিকট হইতে এগুলি শিখিতে যাইবে ? মুসলমান হওয়ার পর তাহাদিগকে মোল্লারা হিন্দুর নিকট হইতে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাহাদের গৃহের পার্শ্বে খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া এই ৫।৬ শত বৎসর যাবৎ হিন্দুরা যে পৌরাণিক ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছে, তাহার একটি বর্ণও মুসলমানগণ গ্রহণ করে নাই। প্রহ্লাদের ভক্তি, ধ্রুবের তপস্যা, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের কীর্ত্তিগাথা—মুসলমানগণ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু কাঞ্চনমালা ও পুষ্পমালার রূপকথা, সখীসোণার

গীতিকথা তাহারা মাতৃক্রোড়ে বসিয়া এখনও শুনিয়া থাকে। এ সমস্ত রূপকথা পৌরাণিকধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী, স্থতরাং তাহারা এ সমস্ত উত্তরাধিকার-স্থত্রে পাইয়াছে। আমরাও যে ভাবে পাইয়াছি, তাহারাও সেই ভাবে পাইয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ই রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ্চ ফেলোরূপে আমি বিবিধ প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছি। এস্থলে তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

মুসলমানগণের মধ্যে যে এই সকল অতি-প্রাচীন গীতিকথা এখনও প্রচলিত তাহা নিম্নলিখিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে জানা যাইবে :—

১। চন্দ্রাবলীর পুঁথি—মুন্সী মহাম্মদ আবেদ বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্, দরজিপাড়া হইতে প্রকাশিত।

২। মধুমালার কেচ্ছা—খোন্দকার জাবেদ আলি কর্ত্তৃক বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৩। মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা—মুন্সী আয়জদ্দিন বিরচিত।
৩৭৭ নং চিৎপুর রোড পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

৪। জরাস্থবার পুঁথি—মুন্সী এনাতুল্লা সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৫। সতীবিবির কেচ্ছা—মুন্সী আয়জদ্দিন বিরচিত।
৩৩৭ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

৬। মালতীকুসুম মালা—মহাম্মদ মুন্সী বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৭। কাঞ্চন-মালার কেচ্ছা—মুন্সী মহাম্মদ বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৮। সখীসোণা—মহাম্মদ কোরবান আলি বিরচিত।
১৩৮ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৯। যামিনীভান—মহাম্মদ খাতের মরহুম বিরচিত।
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১০। ইন্দ্রসভা—মুন্সী আমানত মরহুম কর্ত্তৃক বিরচিত।
৩৩৭ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

১১। শীত বসন্তের পুঁথি—মুন্সী গোলাম কাদের বিরচিত।
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১২। সাপের মন্তর—মীর খোররম আলী বিরচিত।
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল রূপকথা বাঙ্গালার পল্লীর নিজস্ব তাহা হিন্দু রমণীর ন্যায় মুসলমান রমণীরাও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই সকল কাহিনী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নহে ইহারা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় ইহার অনেক-গুলি সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তিনি মালঞ্চমালার গল্পটি একটি একশত বৎসরের প্রাচীন স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়া যথাযথভাবে এমন কি স্থানে স্থানে ডিক্টাফোন দ্বারা রেকর্ড করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাহাদুরী এই যে, তিনি প্রাচীন গল্পগুলিকে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই; তিনি স্বয়ং কবি ও সুলেখক, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ লোভসম্বরণ করা সহজ হয় নাই। প্রাচীন গল্প যে কোন লেখক সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে বিদ্যা ফলাইতে যাইয়া ঐতিহাসিক তথ্য ও গল্পের মৌলিক সৌন্দর্য্য ও মূল্য বিনষ্ট করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে ষোড়শ শতাব্দীর কবি ফকিররাম কবিভূষণের হস্তে প্রাচীন সখীসোণার গল্প এবং কাঙ্গাল হরিনাথের হস্তে "শীত বসন্ত"—রূপান্তরিত হইয়াও সঙ্কলয়িতাগণের কবিত্বপ্রভাবে কতকটা নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণাবাবুর স্থান ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চে, কারণ তিনি প্রাচীন যুগের একটা অধ্যায়কে যেন মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি এই সকল রূপকথার মধ্যে আপনাকে এরূপ ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন—যে তাঁহার প্রতিলিপিতে মৌলিক জিনিষটিই প্রতিফলিত হইয়াছে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য নহে যে তাঁহার সঙ্কলিত এই গল্পগুলি ৯ম কি ১০ম শতাব্দীর রচনাকে অবিকৃতভাবে দেখাইতেছে; ভাষা কালক্রমে অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় পল্লীর অবরোধ-রুদ্ধা মহিলাগণের ভাষার পরিবর্ত্তন পুরাকালে অল্পই হইত। বাহিরের প্রভাব, বাহিরের আলো বাতাস সেই নিভৃত নিকেতনে অল্পই ঢুকিতে পারিত। সুতরাং বাণিজ্যকেন্দ্রে ও নগরাদিতে ভাষার যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে,—এই সকল মহিলা-কথিত রূপকথায় ভাষার তাদৃশ রূপান্তর ঘটিতে পারে নাই। এইজন্যই ঠাকুরদাদার ঝুলির যখন প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, তখন সমালোচক

মহলে রব উঠিয়াছিল যে "ভাষা দুর্ব্বোধ্য, এ সকল প্রাদেশিক বাক্যাবলীর অর্থ কে করিবে ?" ইত্যাদি। বাক্যাবলী শুধু প্রাদেশিক নহে, সুপ্রাচীনও বটে। ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিতে যাইয়া পাঠককে বন্ধুর ভাষা-পথে পদে পদে উছট্ খাইয়া হাঁটিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমালোচকগণের তাড়া খাইয়া দক্ষিণাবাবু পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদাদার ঝুলির ভাষা কতকটা সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত মূল্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ গল্প-ভূক্ সামান্যশিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল প্রাচীন গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা বঙ্গীয় মুসলমানগণের গাথা ও মন্ত্র-তন্ত্র হইতে ভাষা ও ভাবের দুই একটি নমুনা দেখাইব। যথা সাপের মন্ত্র—

"হস্ত সারম্ গলা সারম্ আর সারম্ মুখ।
পেট পিট চরণ সারম্ আর সারম্ বুক।
পেট পিঠ চরণ সাতি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে॥
কাঙরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দ রাজা বলে অমুক হৈলা অমর।"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে প্রাচীন কতকগুলি শব্দ আছে। 'কাঙর' কামরূপ কথার অপভ্রংশ। কামাখ্যা তীর্থ হইতে প্রাচীন মন্ত্র-তন্ত্রের স্রোত এক সময়ে এদেশে বহিয়া আসিয়াছিল। "কাঙুর" শব্দের সহিত ধর্ম্মমঙ্গল পাঠকগণ সুপরিচিত। বালী উত্তরপাড়ায় কোন্ অতীত যুগে বিন্দ নামক রাজা সর্পাঘাতের চিকিৎসা ও মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু এই উল্লেখ যে কোন প্রাচীন প্রবাদের উপর দাঁড়াইয়া—তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

দক্ষিণাবাবুর সংকলিত পুস্তকগুলির মধ্যে ঠাকুরদাদার ঝুলিই বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। এই ঝুলিতে "মধুমালা", "পুষ্পমালা", "কাঞ্চন-মালা", "মালঞ্চমালা", ও "শঙ্খমালা" এই পাঁচটি রূপকথা আছে। যেরূপ মণিগণের মধ্যে কৌস্তভ শ্রেষ্ঠ,—এই গল্প পঞ্চকের মধ্যে সেইরূপ মালঞ্চমালা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকটি গল্পেই বঙ্গীয় পল্লী-লক্ষ্মীর পদাঙ্ক চিহ্ন পড়িয়া আছে; বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহসুধা তাঁহাদের অটল চরিত্র-বল এবং দুশ্চর

তপস্যা, তাঁহাদের নবীন প্রেমের ত্যাগশীল সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা ও স্থৈর্য্য, প্রত্যেক গল্পের মধ্যে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী হৃদয়ে যে কি মধুর কবিত্বের নির্ঝর বহিত, তাহাদের অফুরন্ত চেষ্টার ভিতর প্রেমের কথা কিরূপ সিন্দুররাগের উজ্জলতা ললাটে পরিয়া শোভা পাইত—তাহা এই গল্পগুলিতে যেরূপ পাওয়া যায়, বোধ হয় এই সাহিত্যের কোথাও তাহার তুলনা নাই—ইহারা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যের মত ইহাদের মধ্যে রূপ বর্ণনার বাহুল্য নাই,—আধুনিক সাহিত্যের মত ইহাতে প্রেমের কথা মুখে প্রকাশ করিবার চেষ্টা নাই। রমণীগণের প্রত্যেক কথায় নারীজনোচিত সংযম দৃষ্ট হয়,—তাহাদের প্রত্যেক উত্তমের, প্রতিটি ত্যাগের ভিতর পল্লী-লক্ষ্মীর প্রেম অফুরন্ত সুধা বিতরণ করিতেছে—কিন্তু অযথা মুখরতা দ্বারা সেই প্রেমকাহিনী বৃথা স্ফীত হইয়া পড়ে নাই। সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এই সকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে দৃষ্ট হয়। রচয়িতা বিশেষণ পদ প্রায়ই ব্যবহার করেন নাই, তিনি নিজে কোন কথা কহিয়া পাঠকের রুচি বা মানসিক ভাবকে কোনদিকে প্রবর্ত্তিত করিতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই,—শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই চরিত্র-গুলি এরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোন সমাসের ঘটা, রূপবর্ণনার আতিশয্য বা লেখকের বক্তৃতায় তাহা হইতে পারিত না। মালঞ্চমালা যখন মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে দেশে কোন বিত্যালয় আছে কিনা যাহাতে বালক চন্দ্রমাণিককে তিনি পাঠাইতে পারেন, মালিনী বলিতেছে— * "রাজার বাড়ী পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়, কুঁজো আছে, হুজো আছে, গেঁজো আছে, তুই ঠাং ন্যাংরা আছে, আবার রাজার রাজপুত্তুর আছে, দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি কাকহাটী না বকহাটি"। * এরূপ অল্প কথায় পাঠশালার চিত্র কোথায় কি দেখিয়াছেন? এই কথাটি মনে মনে রাখিতে হইবে, গল্পের শ্রোতা শিশুমণ্ডলী, তাহাদিগের কৌতুক বজায় রাখিতে হইবে, তাহাদের সুকুমার মুখ কথায় কথায় হাসিচ্ছটায় দীপ্ত করিতে হইবে—গল্পের সূত্র সর্ব্বদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। যখন মালঞ্চমালা তাহার আশ্রয়দাতা বাঘকে বলিল, শিশু বড় হইতেছে, তাহার পড়াশুনার দরকার—এ সময়ে জঙ্গলে পড়িয়া থাকিলে চলিবে কিরূপে? তখন বাঘ বলিতেছে—* "তা লেখাপড়া শিখাও। কত পণ্ডিত আছে, সাঁঝ সকালে ঘোরে, হোক্কা হুয়া করে, বল একটা ধরে এনে দেই।" * এই সকল কথায় ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। পৌরাণিক যুগের

৬

কথায় কথায় সাবিত্রী, সত্যবান্, দ্রৌপদী ও সত্যভামার কথা—শপথ করিতে হইলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে সাক্ষী করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পমালার নিকট কোটালের পুত্র শপথ করিতেছে পৃথিবীকে সাক্ষী মানিয়া, কারণ "পৃথিবী পবিত্র—এখানে ফুল জন্মে।" কি সুন্দর কথা, ফুলের মত পবিত্রতা কোন্ ইন্দ্র বা চন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে পাওয়া যাইবে? মালঞ্চমালাকে তাঁহার স্বামী বড় হইবার পর এক দিনও দেখেন নাই, কিন্তু যেদিন স্বামী ঘোড়ায় চড়িয়া পরীক্ষা দিতে চলিলেন—সে বড় বিষম পরীক্ষা,—প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা আছে—সেদিন মালঞ্চ তাঁহাকে দেখা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, "সেই সময়ে মালঞ্চ, সোয়ামীর হাতে ঘোড়ার রাশ তুলে দিতে গিয়া সোয়ামীর মুখের দিকে চাহিলেন, জুতার ধূলা ঝেড়ে দিতে গিয়া সোয়ামীর পায়ের ধূলা নিলেন।" এই রমণী যে প্রেমের কত তপস্যা করিয়া সংযম রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা না জানিলে সোয়ামীর মুখের দিকে চাওয়া ও পায়ের ধূলা নেওয়ার মূল্য পাঠক কিরূপে বুঝিবে? জীবন দান করিয়া দৈববলে জীবন পুনঃ লাভ করিয়া যাহাকে কত কষ্টে মানুষ করিয়াছিলেন, সেই স্বামী যেদিন রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পর হইয়া গেলেন,—যাঁহার জন্য প্রতি পদে তিনি জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যখন তাহার পরিচয়টিও পাইলেন না, তখন অশ্রুভারাক্রান্তচক্ষু এই সহিষ্ণুতার দেবীমূর্ত্তিকে আমরা রাজ-দম্পতীর বাসর গৃহে নীরবে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই। রাজদম্পতীকে দেখিয়া মালঞ্চ প্রার্থনা করিলেন—

"সুখে থাইকো, সুখে থাইকো, রে রাজ পুত্র
সুখে থাইকো রে রাজ কন্যা
যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলে রে।
বাসরের বাতি যেন সাত পুরুষে নেহালে,
রাজ-ছত্র যেন চৌদ্দ-পুরুষের মাথায় ছত্র ধরে।
জল থল বন বৃক্ষ যেন সজাগ হইয়া থেকো রে।
চখের পাতা পড়তে যেন উঠে রে আইসো।
রাজ মন্দিরের চূড়া যেন অজয় হইয়া থেকো রে।
চন্দ্র সূর্য্য যেন রে সুমঙ্গলে হাসে।
আমার শ্বশুরের ঘর, আমার সোয়ামীর পীড়ি
অক্ষয় করে রেখো তুমি পরমেশ্বর।

রাজ কন্যার আয়ত যেন হাতে গায়ে ক্ষয়ে রে
তুমি আমায় দেও এই বর।
চৌদ্দ ভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার
ওরে আমি জল মাটী হইয়া থাকিমোরে
আমি ভুঞ্জিমো কত সুখ।
ওরে আমি পশু-পক্ষী হইয়া থাকিমোরে
আমি ভুঞ্জিমোরে কতই সুখ।"

অথচ যে শ্বশুরের রাজ-মন্দিরের ও সংসারের বিজয় প্রার্থনা করিয়া তিনি এই গীতি গাহিতেছেন, সেই শ্বশুর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সেই রাজ-মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং যে সতিনীর আয়ত ভিক্ষা করিয়া তিনি ভগবানের নিকট কাঁদিতেছেন, তিনি তাঁহার জন্য একটুকু স্থান রাজ-গৃহে রাখেন নাই।

বহু কষ্ট ও নির্য্যাতনের পর রাজ-শ্বশুর মালঞ্চের মহিমা বুঝিতে পারিলেন, তখন রাজ-প্রাসাদে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। মালঞ্চের অভ্যর্থনার জন্য পুষ্প-তোরণ নির্ম্মিত হইল। চন্দ্রমাণিক তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মালঞ্চ নিজ হস্তে মালা গাঁথিয়া রাজকন্যাকে পরাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কারণ তিনি ভোগ করিতে সংসারে আসেন নাই, ত্যাগ করিতে আসিয়াছিলেন—তাই প্রজারা তাঁহাকে পাটরাণী হইতে উচ্চতর আসন দিয়াছিল। "মালঞ্চ কাঞ্চীকে (রাজকন্যাকে) করিলেন পাটরাণী ; রাজ্যে মালঞ্চ হইলেন ঠাকুরাণী।"

বৌদ্ধ-হিন্দু-ধর্ম্মে নারীর যতরূপ আদর্শ ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মালঞ্চ সেই গুণরাশির সমন্বয়। এই উচ্চ কল্পনা নানারূপ অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে প্রকৃত নারীমূর্ত্তিকে দেখাইতেছে। দাম্পত্যভাব ও মাতৃভাবের মধ্যে যে বিভিন্নতার রেখা, তাহা এই গল্পে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে—বোধ হয় জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। অসীম কথা-সমুদ্রের মধ্যে মালঞ্চ যেন পদ্মাসনা লক্ষ্মী। এই পাঁচটি গল্পের মত গল্প কোথাও আছে বলিয়া জানি না ;—ইহারা শিশুর আমোদের উৎস, যুবকের প্রেম-পিপাসার অমৃত এবং বৃদ্ধের শাস্ত্র, ইহা মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েরই তুল্যরূপ উপভোগ্য। অতি সহজে আমরা নদীর জল পান করিতেছি কিন্তু তাহা গিরিশিখর হইতে আসিয়াছে। অতি সহজে যে আলোর প্রভাবে আমরা পথ দেখিয়া যাইতেছি তাহা সর্ব্ব প্রধান

জ্যোতিষ্কের,—সহজপ্রাপ্ত জিনিষ যে কত বড়, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। যাঁহারা বেদ-বেদান্ত হইতে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া তাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন ও সুখবোধ্য করিয়াছিলেন—এই সকল গল্প তাঁহাদের দান—এইগুলি অবজ্ঞার জিনিষ নহে—বাজারের অল্পমূল্যের মাদুর নহে—পারস্যের গালিচার ন্যায় মহার্ঘ এবং সূক্ষ্ম কলা-শিল্পের পরিচায়ক।

শঙ্খমালার গল্প হইতে যে কতদিকে কতরূপ কবিত্ব ফুটিয়া আছে তাহা দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। ননদীর হস্তে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া শঙ্খমালা বলিতেছেন—

"ঠাকুর ঝি কি জন্য এমন কর রে ঠাকুর ঝি
ও সাধুর বহিন আমি কি দোষ করিলাম
আজ তোমার কাছে।
একই খেলা খেলেছিলাম ঠাকুর ঝি গো
তোমার মালা আমি পরাইয়াছিলাম যে ঠাকুর ঝি
দাড়িম্বের গাছে রে।
আমি তুমি জল আনিতে গিয়াছিলাম
যে ঠাকুর ঝি সাধু-সরোবরের জলে
একই দুধের বাটীতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি
খাইলাম যে তোমার দাদার পরসাদ রে।
একই আঁচল গায়ে দিয়া ঠাকুর ঝি আমরা
কইলাম মনের কথা মনের সাধ রে।
একই বিছানে শুয়ে যে ঠাকুর ঝি
তোমার আমার নিশির রাতি গেছে রে ঠাকুর ঝি
আজ আমারে এ তুমি কেমন দেখা দিলা রে
সাধুর বহিন এ কেমন বেশে।"

এই কাতরোক্তি দুঃখ-সহিষ্ণু বঙ্গীয় গৃহ-লক্ষ্মীর চিরন্তন ক্ষমার পরিচায়ক। বহু বৎসরের পর স্বামী রাজ-প্রাসাদে আসিয়াছেন। শঙ্খমালা যে সেখানে আছেন সাধু তাহা জানেন না, কিন্তু শঙ্খ বহু যত্নে সাধুর জন্য পরিপাটী করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছেন। সাধুর পরিবেশন তিনিই করিতেছেন, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতীকে সাধু দেখেন নাই। তথাপি অন্ন-ব্যঞ্জন আস্বাদ করিয়া সাধুর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে— * "যে রন্ধন খেয়েছি আমি বার বৎসর আগে।

আজ কেন জিভে আমার সেই রন্ধন লাগে।” * সহসা পরিবেশনকারিণীর দুইটি হস্তের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন— * “কে দাও ব্যঞ্জন, কে দাও ভাত। সাধুর ভিটায় যেন দেখিয়াছিলাম সেই দুখানি হাত।”

এই কথায় দাসী বাঁদীরা হাসিয়া উঠিল, সাধু লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। কিন্তু বাতাস কৌতুক করিয়া শঙ্খমালার সিঁথির অবগুণ্ঠন এই সময়ে একটু সরাইয়া দিল। সাধু তাঁহার কপালখানি দেখিয়া আবার আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন— * “সেই কপাল সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোণার দীপ।” * শঙ্খের ধৈর্য্যের বাঁধ ছুটিয়া গেল ; তিনি আর রহিতে পারিলেন না, সাধুর পায়ের কাছের মাটী তাঁহার কপালের সিন্দূরের রং দিয়া রাঙ্গাইয়া দিলেন। এই প্রণাম বহু কষ্টের পর মিলনের শুভ চিহ্ন-স্বরূপ হইল।

এই সকল গল্পে অনেক গীত আছে ; তাহার দুই একটির নমুনা আমরা দিয়াছি। কিন্তু পাঠক যাহা গদ্যের মত পড়িয়া যাইবেন তাহার অনেকাংশও কতকগুলি মেয়েলী ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার অংশ তাহা একেবারেই মনে করিবেন না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই সকল ছড়া ধরা পড়িবে। সম্ভবতঃ এসকল গল্প মেয়েরাই রচনা করিয়াছিলেন, এত ছড়া কাটিয়া কথা কওয়া পুরুষের অসাধ্য। গীতগুলি বাদে এক শঙ্খমালার গল্পেই আমরা ২০৩টি ছড়া বা কবিতার চরণ পাইয়াছি। ডাঃ ওয়াসবার্ন হপ্‌কিন্‌স্ দেখাইয়াছেন—ব্যাসের সঙ্কলিত মহাভারতে বেদ ও উপনিষদের শত শত চরণার্দ্ধ বিদ্যমান। পূর্ব্ববর্ত্তী মেয়েলী ছড়াগুলি পরবর্ত্তী যুগের মেয়েরা মুখে মুখে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ; সুতরাং এই সকল গল্পে যে কত যুগের বহুদর্শিতা ও স্ত্রীসুলভ প্রবাদ স্থান পাইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে ! আমরা এক শঙ্খমালার গল্প হইতে এই সকল চরণার্দ্ধ তুলিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, এই গল্পগুলি কিরূপ আশ্চর্য্য চাতুর্য্যের সঙ্গে প্রাচীন ছড়া ও প্রবাদ-বচন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

অপরাপর বঙ্গীয় গল্পের অনেকগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গ্রীম-সঙ্কলিত য়ুরোপ-প্রচলিত প্রাচীন গল্পগুলির সঙ্গে ইহাদের অনেকগুলির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। যত দূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের দেশ হইতেই সেই গল্পগুলি বিদেশে গিয়াছে এরূপ অনুমান

হয়। এ সম্বন্ধে আমরা The Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

শঙ্খমালার গল্পের গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ।

১। মূল ধন উবে, দিনে দিনে ডুবে। ২। শঙ্খ না মানিক, দিনে দিনে খানিক। ৩। আগে ছিল শঙ্খ মাণিক সমুদ্রের ধার। গালি মন্দ খাইয়া সে জলের সেপার। ৪। ধন রত্ন কড়ি, না বিয়ালেই বুড়ি। ৫। ধন রত্ন কড়ি, পাখা পেলেই উড়ি। ৬। পদ্ম ভাঙ্গে ক্ষীর খায়, নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়। ৭। দিন হেলে, রাত ত টলে। ৮। রাজপুত্র হাসিয়া উড়ান, গোঠে গোঠে ধনুকের বাণ ফুরাণ। ৯। চোখের মণি, দুঃখের খনি। ১০। মা চোখ ভরিয়া দেখিলেন, চোখ ভরিয়া গিলিলেন। ১১। ওরে পুত্র আজ কয়ে বুঝাই তোরে, তুই না বাণিজ্যে গেলে ও যে তোর বংশের লক্ষ্মী ছাড়ে। ১২। ঢেকি বেনে তুষ খান, তুষ কেটে ভূষি খান। ১৩। এক রাজার বেটা মোহনলাল। তার সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল। সেই রাজার বেটা পক্ষী মারে। এক এক তীরে যোলশ গণ্ডা পক্ষী ঝুরে পড়ে॥ ১৪। রাজার বেটা মোহন কুমার, ভেড়া চড়াও সায়েরের পাড়। রাজার বেটা তুমি পক্ষী মার। সদাগরের বেটা শঙ্খমণি—তার কথা কি বল্‌তে পার॥ ১৫। তুমি জেলের বেটা নওরে সাধু জাল বেয়ে না খাবি রে। সওদাগরের পুত্র তুমি রে সাধু, তুমি বণিজ করিতে যাবি রে॥ ১৬। মাঝি মাঝি কর্ণধার। তুমি নুন খেয়েছ কার? ১৭। সে সওদাগরও নাই, দিন আনি দিন খাই, ঘর গৃহস্থালী হাল বাই। ১৮। নাতিপুতি কে বা আছে, কে বা দেয় বাতি। কার ভরা কার ঘাটে বা উঠে কে দেয় বেসাতি॥ ১৯। এই কপালে ঘাট অঘাট, আঘাট যে সেই হ'ল ঘাট। ২০। আছে কি নাই, ঢেকি ছাই বলতে পারে শেওয়া কাঁদায়। থা কি অথা, বল্‌তে পারে পদ্মের পাতা। ২১। ভোগ দিবে রাগ দিবে। যদি নৌকা জাগে ত জাগ দিবে॥ ২২। এক পা হাঁটেন এক পা না হাঁটেন। ২৩। বেছে বেছে সার দিলেন। তিল সিন্দুরের আঁক দিলেন॥ ২৪। এক কড়ি করিয়ারে উনো, পুত্র পঞ্চ কড়ি কর্‌বি দুনো। খয় খরাতি, ছয় ছরাতি, কাহন নিস বান গুনে। ২৫। ঘাটের ভরা ঘাটে বুঝাবি বান তুফান দিয়া পাড়ি। ওরে মুখের আগুনে ছেড়ে রে বানের মাথার মণি কাড়ি॥ ২৬। সওদাগর আইল মা তোর ঘাটে। আতাল পাতাল হইয়া

বৈস তোর জোড় আসনের পাটে॥ জোড় পূজা তোর কালীর সাগর, আমার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর, সারি দেনা দহের কুলে সওদাগরের হাটে॥ ২৭। গহিন জনে নিয়াস কাটে। কালী সাগর ফেটে উঠে॥ ২৮। রাগ রঙ্গে তেল দিল আর দিল সিন্দুর কাঞ্চন। কালী কালী বলিয়ে কর্ণধর ডিঙ্গা করিল বন্দন॥ ২৯। ঝালর মোতি, প্রদীপ বাতী। হাল সাজ সঞ্জাত। ৩০। না নড়ে বাতাস না নড়ে দিক, উজান ভাটির বাতাস ঠিক। সেই বাতাস পবন তখন নায়ের গমন। ৩১। ওরে পাল কামলা আসে পাটহ মজুর। গায় গব্য নিয়ারে চৌদ্দ ডিঙ্গা করে পুর॥ ৩২। নূতন পালের দড়ি, হালের মাথায় কড়ি। ৩৩। দহের জলে ঢেউ খেলে না খেলে। কমল পাতের জল হেলে কি না হেলে॥ ৩৪। চোখের জলের মালা গাথিয়ারে শক্তি পরে আপন গলায়। বছর পরে সেই স্বামী দর্শন দিয়া পলায়। ৩৫। লক্ষ কোঁটা চক্ষের জলে পতি একেক শঙ্খরে পিয়াইলাম। শত আট শঙ্খ যে স্বামী আমি এই মালা বসি গাঁথিলাম। আমি বুকে করিয়া রাখিলাম পতি তোমার নামের নিদর্শন। এহি শঙ্খের মালা পতি আজি নাও দাসীর দর্শন। ৩৬। মা আলপনা থুইয়া কাঁদেন, বোন আলপনা দেয় হাসে। মা চৌদ্দ ডিঙ্গা বরণ করেন হাত কাঁপে, বোন চৌদ্দ ডিঙ্গা বরণ করেন হাত নাচে। ৩৭। উড়ে পূড়ে ধূলা যে ধূলাতে পড়ে। কুলের বউ কুলনারী, আপনা যদি রাখে তো কে মারে॥ ৩৮। এতো গোলার জিনিষ নয় যে গোলায় ছেঁদে রাখিব। বাণিয়ার নয় যে সিন্দূর কৌটায় ভরিয়া রাখিব॥ মনুষ্যের ছেলে আমি কেমন রাখিব। ৩৯। ফুটলো কি ছুটলো? মায় পবনে ছুটলো। ৪০। পালে পালে দিল টান, পবনের বেটা হনূমান। ৪১। জানি কি জানি, মানি কি মানি। ৪২। ভাতে দানা দুধে ছানা। ৪৩। ঘুমের আন্ধি, ঘুমের সান্ধি। ৪৪। দশের কথা, বেদের পাতা। ৪৫। এক বছর রাখিলাম রে ভাত কাপড় দিয়া। ভাত কাপড়ের দুঃখ হইল রে রাখিলাম সঙ্গ দিয়া। ৪৬। প্যাক প্যাক ডাক ছাড়ে, রাজহংস পাখা নাড়ে। ছয় মাসের পথ দণ্ডে গেল যেন পুষ্পকের রথ। ৪৭। শুন শুন শক্তি সুন্দর আমি এলাম রাতে প্রহরে। কবাট খুলে দেও গো শক্তি আসি আমি আপন ঘরে॥ ৪৮। সত্যের সন্ধি, ঘর বন্দী। ৪৯। না ছুইও কবাট রে আমার যাবৎ আছে রাতি। পতির আজ্ঞা জাগিরে রাতি আমি জেলে মোমের বাতি॥ ৫০। মাথার কেশে সাপ গর্জ্জে দুইও চোখে থারু খড়্গ যে ঘুরাইয়া শক্তি উঠে দিল হাঁক। ৫১। পতির অঙ্গ শক্ত,

পতির গায়ে রক্ত। ৫২। খড়্গ হাতে মোমের বাতি জ্বলে সারা রাতি। বাতি যদি না থাকিত বধ করিতাম পতি॥ ৫৩। পতি যে আইলে পতি কহে যেও মায়েরে। পতি যে আইলে পতি কহে যেও বোনেরে॥ ৫৪। উঠ উঠ মাল্লা মাঝি কত নিদ্রা যাও। বাণিজ্যের ভরা আমার উঠে ছাড় নাও॥ ৫৫। ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন পক্ষীরা ছাড়ে রা। আঙ্গিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ কুজি আস্তে তুলে গা॥ ৫৬। ইতল বিতল। চেতন চিতল। ৫৭। দুই কাকলে হাতে কাঁকন, ননদের গলায় কাঁসর বাঁজন। ৫৮। ঘর ব্যস্ত, পাড়া ব্যস্ত। ৫৯। বুকের পাটা না মুড়ো ঝাঁটা। ৬০। আহা ছি ছি কোথায় যাই, কার মাথা চিবিয়া খাই। ৬১। শঙ্খ যে বহিয়া কেল বাতাসের কথা বাতাসেই মিশিল। ৬২। সাধু নুন খায় পান্তা খায়। বাসি ব্যঞ্জনের সোয়াদ ন্যায়॥ ৬৩। ননদী না যমুনা, যমকেও অত ডরাই না। ৬৪। অভাগীর বিটি অভাগীর মা। তোর বউয়ের কীর্ত্তি দেখে যা॥ ৬৫। কোন জলে ডুবি, কোন্ কোনে থুবি। কিসের আগুন খর কুটায় ঢাকবি॥ ৬৬। এক চায় আর পায়। ৬৭। তিন ঝাকর ঝাকনা, তিন থাকর থাকনা। ৬৮। যা যা ঘর ছেড়ে বনের ডালে, বার খেতে তেল আইলে। ৬৯। তোমার মালা যে আমি পরাইয়া ছিলাম ঠাকুর ঝি দাড়িম্বের গাছে। আমি তুমি জল আনতে গিয়াছিলাম সাধু সরোবরের জলেরে। একই দুধের বাটীতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি খাইলাম দাদার প্রসাদ। একই আঁচল গায়ে দিয়ে ঠাকুর ঝি আমরা কইলাম মনের কথা মনের সাধ। ঠাকুর ঝি একই বিছানায় শুয়ে যে তোমার আমার নিশির রাত গেছে। আজ আমারে তুমি এ কেমন দেখা দিলে, সাধুর বহিন, এ কেমন বেশে॥ ৭০। বুক খান, না পাষান খান। ৭১। আমি বুঝিলাম এত দিনে। আকাশ বাতাস বৈরি হ'ল আমার কপাল গুণে॥ ৭২। ছয় মাসের পথ উজান আসি যে আমার ভাঙ্গিল বাসর। হায় বুঝি না কহিয়া মা বোনেরে গো রাতের পোহাইতে পহর॥ ৭৩। তোমার কুলের পদ্ম কুল আমি কুল নারী, যা বল তাই করি। ৭৪। আবার দহ, না সহ। ৭৫। পোড়া মুখ পোড়, বনে গিয়া পড়। ৭৬। খ্যাংরার দাগে মাস কেটে উঠে, ও অভাগী ঘরের ঘুঁটে। ৭৭। বাঁশ বনে আঁচর গেল, কাঁটা বনে বিচর গেল। ৭৮। তিন পা যাইতে হোঁচট খান, মটক ফেল্‌তে বেলা বাড়ান। ৭৯। পালানের গাছ হেলে পড়িল, তাল সুপারি ভেঙ্গে পড়িল॥ ৮০। কোন বা জন্মে আমি

মায়ের দুধ দাঁতে করে কাটিলাম, কোন বা জন্মে কার ঝিয়ারীর গায়ে আমি ক্ষার খৈল দিলাম। ৮১। পুত গেল বাণিজ্যে, বৌ গেল আন রাজ্যে। ৮২। তালু কণ্ঠা শুকায় ছাতু ভিজাইতে জলে শুকায়। ৮৩। মা খিদের সময় খাইতে পারেন না, নাইবার সময় নাইতে পারেন না। ৮৪। মেয়ে পাত কাটেন, হাট করেন, কুজ নাড়িয়া নাড়িয়া ভাত বাড়েন। ৮৫। মা যে উপবাসী; তার কথা ভাবুক গিয়ে পাড়া পড়শী। ৮৬। সাত গোষ্ঠি ঝার দিয়াছেন, কুজি আমার কিসে নাচেন। ৮৭। নীলমাণিক যে জন্ম নিবে তোমার সাধুর ঘরে, না মর মর সাধুর বউ নীলমাণিক তোমার উদরে। ৮৮। বাড়ন্তটুকু ঝরে, পড়ন্তটুকু পড়ে। ৮৯। মায় আনে মাংস আনে, জল ভেঙ্গে নল আনে। ৯০। এক নল ভাঙ্গে শক্তি এক নল খায়। আর এক নল হাতে নিয়ে শক্তি রাত্রি যে কাটায়। ৯১। পেঁচার কোটরে, পেঁচা রব করে। ৯২। কত দিনের অনাহার, দীন দুবলা গায়ের ভার। ৯৩। পথও পান না, রথও পান না। ৯৪। হাতে আমার নল সতীর কোলে অনল। ৯৫। বাঘ মহিষের রাজ্যে থাকি, মনের আগুন মনে রাখি। ৯৬। রাতের বাতাস ছাড়ে, মশাল হাতে নিয়া কাঠুরিয়া মৌচাকে খোঁচা মারে। ৯৭। বনে কাট কাটে, তার মৌ লোটে। ৯৮। কত জন্ম তপস্যা হোল! কোন ছলে বা দেখা নেল। ৯৯। তোমার বনে কাট কাটি। সংসারের কামাই খাটি॥ ১০০। পাখীর গানে সুর উঠল্, গাছের পাতায় ভোর উঠল। ১০১। সাত মশাল জালিয়া মাগো তোমার মশা মক্ষী খেদাইমো। যত মধু খাইতে পার গো মা আমি ঝরা ভরিয়া দিমো। ১০২। পাতা পাত শালের পাতা। বাঁশের বজ্জর তালের পাতা। ১০৩। সাত পর্তে ছাউনি দিলাম। আলোকলতার বাঁধন দিলাম। ১০৪। কুঁড়ে বান্ধম কুঁড়ে বান্ধম আমি মা জননীর বরে। সোণার যাদু যেন এই কুঁড়েতে হাসিয়া খেলা করে॥ ১০৫। চৌকাঠের উপর গঙ্গাজল, ধূমোর ধূমায় দিক পাগল। ১০৬। দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়ায়। সকল বেনেতে ভাঁড়ায়। ১০৭। কোন বেনে বা দারুচিনি দিতে দরমুচ বাহির করে, কোন কোন বেনে কাহনের বস্তু বেঁচে সিক্কার দরে॥ কোনহ বেনে খাণ্ডারা পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়। মহা মাণিক্য সাহা মাণিক্য কোরে লোকরে বিকোয়॥ ১০৮। বেলা পড়ে বেলা উজায়। গাছের পাতা মর্ম্মরিয়া শুকায়। ১০৯। ময়ূর ময়ূরী পাখা ছাড়িল। শালিক শারী ধুলি সিনান করিল॥ ১১০। পূবে পশ্চিমে যায়, কাখের কলসী নামায়। ১১১। পদ্মের

নালে পদ্ম নাই, পাতার ডাঁটে পাতা নাই। মরাল আসে নাই, দল শেওয়ালা ঠাঁই ঠাঁই॥ ১১২। পাড় পন্থারী কুড়ে, চার কোণ ঘুরে। ১১৩। ছালা বলে পরণ ছালা খোলে গায়, অঙ্গের আভায় বন জন্তু মূৰ্চ্ছা যায়। ১১৪। যেন মুক্তার ঝিনুক খান, সোনার কদলীর মোচা খান। ১১৫। নড়ে না হরিণী চরে না, ঝ'রে ঝ'রে পদ্মের দল পড়ে না। ১১৬। ভয় নাই ভয় নাই বনে তোমায় দেখতে পাই। ১১৭। তুমি কার ঝিয়ারী কার বৌ, কার চাকে ভরা মৌ। ১১৮। হাতী দেখে নড়ে নাই, বাঘ দেখে সরে নাই। ১১৯। সেঁচ করে না সঞ্চয় করে না, আপন ঘর কন্নায় মন উঠে না। ১২০। কাঠুরে বনে আসে বনে বেড়ায়, নিত্য নয়া কুটির বানায়। ১২১। সাপের হাঁচি বেদের বুঝি। ২২২। যদি পা'স সতীনের না, কলে বলে পার হয়ে লাথি মেরে যায়। ১২৩। বন কুড়নীর বাঁধ, একর ঘরের বাঁদ। ১২৪। ও কাঠুরাণী মাথার নিক, যা ভাবলি তাই ঠিক। ১২৫। চাঁদের নিছন হাতে পাবি। সতীন যে সত্তুরের সত্তুর তার মাথা চিবিয়ে খাবি॥ ১২৬। তিন আঁটি সরু কাঠি। চল দিব আঠার মুঠি। ১২৭। হাড়ী যেন তবে। সরল যেন পূবে। ১২৮। কুল ছিল কাল কেশর কুল হল নুড়ি, চিতার কাঠায় মাজিয়া দিয়া আড়াইকে দেড় বুড়ি। ১২৯। দাঁত নড়ে থর থর, তা বেয়ে পড়ে তাম্বুলের রস। ১৩০। কাঠুরাণীর হাতের ফাঁকি, দাই বুড়ির মাথায় ঝাকি। ১৩১। সন্ধ্যার বাতি দেখ্‌বো। রাতখানি থাক্‌বো। ১৩২। নীলমাণিক জন্ম নিল পূর্ণ চাঁদের কোলে, পশু পক্ষী ছুটে আসে বনের কাঠ বিড়ালে। ১৩৩। চাঁদের কোলে চাঁদ ভয়ে পড়েছে, সারা বন ভেঙ্গে পড়েছে। ১৩৪। এ যে সাত স্বর্গের নিছনি কপালে জ্বলে টীকা। কোন বা রাজার আলোক নড়ি কপাল জোরা লিখা॥ ১৩৫। এক পাতা শিথানে থুইলেরে এক পাতা ছোয়াইল পায়ে। আর এক পাতা নিয়েরে স্বপন ঢাকিল নীলমাণিকের গায়ে॥ ১৩৬। এত এত মোহরের ধান আঙ্গিনায় হৈল তল। ভাল ডাকিনী দাই এর দেখ কলিজা ভরা থল॥ ১৩৭। সেই সময় বন দিয়ারে সাতাইশ চোর যায়, মঙ্গল বাতি জ্বালাইয়া শক্তি বার বৎসর ঘুমায়। ১৩৮। কোঁচড় কোঁচড় মোহর কুড়ায়, আর কুঁড়ের ঝাপে কাণ ঠেকায়। ১৩৯। পা টিপি পা টিপি কান নাড়ে। কার বাছারে নদীর ধারে॥ ১৪০। মায়ে যে ইহার পাগল হবে, ধরণী কি ভর সহিবে। ১৪১। কত স্বপন হাসে, কত স্বপন ভাষে। ১৪২। শক্তির নিশ্বাসে কাঁপে বন, বাহির হইল বাঘিনী অরণের অঙ্গন। ১৪৩। এক যে আগুনের শিখা, সপ্তদিক। ১৪৪। আমি

কোন বা জন্মে কচিলা বাছুরের মুখের দুধ কাড়িলাম রে। আমি কোন বা পক্ষীর ডিম সাপ হইয়া খাইলাম রে। (কচিলা=কচি)। ১৪৫। দেও দেবতা স্তম্ভিত, দিক পৃথিবী কম্পিত। ১৪৬। শূন্য আকাশ জল বাতাস। ১৪৭। আমার মাথার মাণিক ভাসাইয়া দিলি, আমার বুকের মাণিক খড়াইয়া নিলি॥ ১৪৮। পুত হোল গো পুত হোল, রাজার রাজ্য আলো হোল। ১৪৯। যা নাই রাজ ভাণ্ডারে—তাই দেখি ধুলার ঘরে। ১৫০। আগে ছিল যে সমুদ্র ক্ষারে সরে, এখন হল সমুদ্র নূন পাথরে। ১৫১। গঙ্গার জল সিনান করবে শক্তি দুঃখের গেল দিন। উঠিয়া তুমি ঠেসরে শক্তি সমুদ্রের পুলিন॥ ১৫২। চন্দন দেখিতে সাধু দেখে দরশনে, 'শ' অক্ষর লেখা আছে সেহিরে চন্দন। 'শ' অক্ষর পড়িয়া সাধু শক্তি নৈল মনে, ওরে সোণার হাতের আঁখর দেখিয়া সাধু হৈল অচেতনে॥ ১৫৩। বন দেবতার ছলা, মায়ের মন খানি উতলা। ১৫৪। বৈল ছেড়েছে আমের গাছে মায়ের আমার তারি তলে বাসা। শালের পাতা কুঁড়ে বাঁধিলাম আমি কাঠের বদলে আশা॥ ১৫৫। চৌদ্দ পালের ঘুন্টি তুলি নদ উজার নদী উজার। যদি হয় পথের চুল ভাটি তৈলে সমুদ্রে যায়॥ ১৫৬। হার চন্দনের শোভা আরো রত্ন পাটের শাড়ী। বৃক্ষের তলে আলো করে কার বা নব নারী॥ ১৫৭। গায়ে কাঁটা, মস্তকে ভাটা। ১৫৮। এক দিন দেখিলাম বন কুড়ুনী পরণে দেখিলাম ছালা, আজ এসেছে শাড়ীর ঘেরণ গলায় দুলিয়া মালা। ১৫৯। বাঁদি দাসী রাণীর রাণী, আমি হৈলাম চৌধুরাণী। ১৬০। দাসী বাদীর ঝাঁক, মৌমাছির চাক্। ১৬১। দাই বুড়ী খুন খুনে। পড়ে থাকে ঘরের কোণে॥ ১৬২। কটা মাথা কার ঘাড়ে, রাজার ঘাটে ডঙ্কা মারে। ১৬৩। বেটা বড় মর্দ্দানা, কয়টা ঘাড়ে গর্দ্দানা। ১৬৪। যত বেসাতি আটক দাও, সাধুকে ফাটক দাও। ১৬৫। দিক দিশা হাঁপিয়া উঠে, গায়ের ঘামে ঝরণা ছুটে। ১৬৬। রাজার যদি নাই সুখ, সকলেরই তাতে দুঃখ। ১৬৭। গা জুড়ে ঘুম এল চোখ ভরে জল এলো। ১৬৮। ঢোক্ গেলে, দিক্ তোলে। ১৬৯। আল ডিঙ্গাইয়া কে খায় খাস, মায়ের কথায় প্রত্যয় চাস্। ১৭০। জন্ম হল গহন বনে, আজ বসেছিল সিংহাসনে। ১৭১। কাকের বাসায় কুলির ছা, জাত স্বভাবে করে বা। ১৭২। একি কথা একি ভুল, কার মাথার কটা চুল। ১৭৩। পথে পায় জননী, সে জননীত ডাইনি। ১৭৪। কাঁপিস না ঝাপিস না, দুধ যেন ঠিক্রে না। ১৭৫। সিঙ্গি মাছের ঝোল চড়ায়। কালো জিরা আর মশলা বেটে খায়। ১৭৬। হাড়ি ভাঙ্গে সরা

ভাঙ্গে, সারা রাত্রি বসে জাগে। ১৭৭। নীল আছেন সিংহাসনে, কি হয় কে জানে। ১৭৮। না চুল পাঁচড়, না পরনে ভাল কাপড়। ১৭৯। দেব আছে ধর্ম্ম আছে। সত্য স্থর্য্য সাক্ষী আছে। ১৮০। পাতাটি পড়ে না, কুটাটুকু নড়ে না। ১৮১। পূর্ণ চাঁদের কিনিক জোছনা চাঁদ পাখীকে পাইল। ১৮২। সভা হৈ হৈ, ডঙ্কা রৈ রৈ। ১৮৩। ছিলাম আমি রাণী এখন হলাম পথ বেড়ানী। ১৮৪। আকাশের কথা দেবের বারতা। ১৮৫। স্থর্য্য কিরণ হাসে, নদীর হাওয়া আসে। ১৮৬। জল জৌলসের ঘিরে সোণার পাগড়ি শিরে। ১৮৭। সাজ পরণ ছেঁচড়ে, আপন গা হেঁচড়ে। ১৮৮। নদীর ঘাটে চৌদ্দ তরী চৌদ্দ নিশানে উড়ে। শঙ্খ সাধুর নাম লেখা সোণার আখরে॥ ১৮৯। চন্দ্রস্থর্য্য যদি সাক্ষী, সাক্ষী যদি বনের পাখী। ১৯০। যে রন্ধন খেয়েছি আমি বার বৎসর আগে। আজ কেন জিভে আমার সেই রন্ধন লাগে। ১৯১। বার বাটী তের ব্যঞ্জন সেই রন্ধন খাই। বার বার বৎসরেও তো সে রন্ধন ভুলি নাই। ১৯২। সাধু জল খেতে ভাত খায়। পলকে ভাত ব্যঞ্জন সাপুর স্থপুর ফুরায়। ১৯৩। যে দাও ব্যঞ্জন যে দাও ভাত, সাধুর ভিটায় যেন দেখেছিলাম সেই দুই খানি হাত। ১৯৪। সেই কপালে সেই টিপ, সাধুর ভিটায় সোণার দীপ। ১৯৫। এর বাড়ী খান, ক্বচিৎ দু এক কড়ি পান। ১৯৬। কুজের উপরে তেল মাখে, আয়নার আরশীতে মুখ দেখে। ১৯৭। বনে বনে বেড়ানী, ছিলাম কাঠুরাণী, হলাম রাজরাণী। ১৯৮। দাই কাঠুরাণী মরে গেল। শিয়াল কুকুরে টেনে নিল। ১৯৯। গান বাজনা, সাজ সাজনা। ২০০। আপন মুখে অন্ন ছোয়ান নাই, তবু বংশ চেয়ে ধন খোয়ান নাই। ২০১। তুল না হয় মূল না হয়। ২০২। বকুঠেঙ্গী পায়ে, কুজ স্থন্দরী গায়ে। ২০৩। কেশ চলে শক্তির বেশ ঢলে, দিন প্রভাতে শক্তির ঘরে মোমবাতি জলে।

(৪) ডাক ও খনার বচন

এই সকল বচন রচনার সময় বৌদ্ধ-প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ, ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম্ম যে অবশ্যপালনীয়, তাহা অনেকবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে[১]; কিন্তু একটিবারও হরি কি অন্য দেবতার নাম লইবার

১. "ধর্ম্ম করিতে যবে জানি।
পোখারি দিয়া রাখিব পানী॥"

স্থত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অতন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সেগুলি ভাষার প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগুলির ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।[১]

১. বুন্ধা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড।
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥

২. আদি অন্ত ভুঞ্জসি।
ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না খারসি॥

৩. ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি।
তাতে দিও নানা শালী॥

গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম
যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবনতির সময় উহা নাস্তিকতায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থ বাচকরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। 'বিদ্বোন্মদতরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত পুস্তকে বৌদ্ধগণের যে সকল যুক্তি অবতারিত হইয়াছে তাহা চার্ব্বাকের মতাবলম্বী। ডাকের বচনে তদ্রূপ সূত্রও প্রচারিত দেখা যায়,—

"ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব॥"
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার।
আপনা মইলে কিসের আর॥

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে "ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস" তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরুপত্নী নন্ ত? 'ঈশ্বর' শিবের এক নাম, সুতরাং ঈশ্বরের স্ত্রী 'ভবানী'কে বুঝাইতে পারে।

১. বেণীমাধব দে-র সংস্করণ, ১২৯৫ সাল।

৪. ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটাহুব বোল পড়ি সাথি ॥
মধ্যস্থে যবে সমাধে ন্যায়।
বলে ডাক বড় সুখ পায় ॥
মধ্যস্থে যবে হেমাতি বুঝে।
বলে ডাক নরকে পচে ॥

ডাক নামক জনৈক গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সক্রেতীস্—ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনের উদয়-অস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ আড়ালে পড়িয়াছে। আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সম্প্রতি আসামীয় সাহিত্যের বুরুঞ্জী লেখক উক্ত প্রদেশের "লোহি ডাঙ্গরা" নামক স্থান ডাকের বাসস্থান বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম "লোহ"। ডাক শব্দ সম্ভবতঃ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ এবং ব্যক্তি বিশেষের নাম নাও হইতে পারে। "চলিত কথা" অর্থে ডাকের বচন ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্গীয় ডাকের বচনের কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে, ডাক গোপ জাতীয়, কিন্তু অসমীয়া ডাক কুম্ভকার।

ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে মন্তব্য।

বোধ হয় বঙ্গভাষা-স্ফুরণের এইগুলি প্রাক-চেষ্টা। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০—১২০০ খৃ: অব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্ত্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা একজাতির সম্পত্তি; হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনায় সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।[১] কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন

১. ডাক অর্থে প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। "এখন ডাকের কথায় বলে" প্রভৃতি কথার কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের সমস্ত রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা-নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই, সুতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে। বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের দু'ছত্রে তাহা আছে ;—উহারা এতদূর সত্য যে, রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখিলে—ফলে মিলিয়া যাইবে।

খনা ও ডাকের বচনে প্রভেদ।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি ; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে।

১. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হাভাত॥[১] খনা

২. খনা ডেকে বোলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥

৩. দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বারমাস॥ খনা।

৪. দিনে রোদ, রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কাতিকের ঊনজলে।
খনা বলে দুন ফলে॥

৫. ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥

১. "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" তুলনা করুন।

ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার ॥
৬. নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥
৭. রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজার সাজে ॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি ॥
রৌদ্রে কাঁটা কুঁটায় রাঁধে।
খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে ॥
কাথে কলসী পানীকে যায়।
হেটমুণ্ডে কাকহো না চায় ॥
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে ॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সূচনা হইয়াছিল, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিব না। প্রতি বনে বন-কুসুম, প্রতি মেঘের গায়ে উজ্জ্বল তারা, তাহারা ত কত সুলভ। কিন্তু তাহাদের মত সুন্দর কি ?

এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু যখন ঐ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল, সেই জ্ঞান এ সব বচনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্যধারায় আটে না। আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি

বচনগুলিতে গৃহস্থালী জ্ঞান।

হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। "ধান্যের থোড় উন্মিলে এক মাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীর্ষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীর্ষভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না।"[১] এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহ-বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল্ কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি; কিন্তু আমরা এতদূর স্বাবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, ভূমি এবং তদুৎপন্ন শস্যাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একবারেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে তাই এই সব বচনগুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

জ্যোতিষে অচলা ভক্তি।

কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আঁকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই অপূর্ব্ব শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ফল	শব্দ ফল
ক্ব ক্ব—কল্যাণলাভ।	কোলো কোলো—নিষ্ফল বা ক্ষতি।
কঃ কঃ—রাজোপদ্রব।	কোয়ং কোয়ং—রাজা বা প্রভু বিনাশ।
করকং করকং—বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ	ক্রেং ক্রেং ক্রেং—দ্রব্যলাভ।
	কঃকুকুং কঃকুকুং—শবদর্শন ইত্যাদি।

১ খনার বচন, জ্যোতিষরত্নাকর।

কেতংকেতং—রত্নহানি।

করকো করকো—কলহ। জ্যোতিষরত্নাকর, ৪৪৫ পৃ.

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহাদিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।

কিন্তু শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দুধর্ম্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল—অনড় টলিল; যাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা কুসংস্কারে ও জড়তায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়া ধরিয়া বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপ ছেদন করিতে দাঁড়াইল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব।

আমরা 'বৌদ্ধযুগে'র রচনায় যে সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।[১]

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
অগ্র	...	অর্ঘ্য	...	শূ. পু.
অকইবের	...	পণ্ডিতের	...	ঐ
অন্যান্য অন্তিক্ষ	..	অনন্যচিত্ত	...	ঐ
অস্স্	...	অশ্ব	...	ঐ
অহন্যেক	...	অনেক	...	ঐ
অনুহিত	...	অনুষ্ঠিত	...	ঐ

১. এই সব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থে কোন অভিধান রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে অনেক কৃতবিদ্য সাহেবই সর্ব্বপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন। স্যার গ্রেভিস্ সি হফটন্ মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই শ্রেণীর অভিধান বাঙ্গালায় আর বিরচিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিলাম মাত্র। এস্থলে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পঁহু' ও 'নিছনি' শব্দের অর্থ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
আইদ্	...	আদি	...	শৃ. পু.
আকুড়ি	...	আকড়্সী	...	ঐ
তাঁড়ুল	...	তণ্ডুল	...	ঐ
আপাবন	...	বিশেষ পবিত্র	...	ঐ
আফুলা	...	অপক্ক	...	ঐ
আরসা	...	রসহীন	...	ঐ
আমলো	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আলম্ব	...	নিশান	...	ঐ
আসারে	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আসআঙ্গ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
উজুরোলা	...	উচ্চ শব্দ	...	ঐ
উড়াশালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
ককচি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কনকচুর	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কন্নি	...	লেখক	...	ঐ
কাঁড়দ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামদ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামিনা / কামিন্যা	...	কর্ম্মকার	...	ঐ
কালাকার্ত্তিক	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কিআলা	...	কেয়াফুল	...	ঐ
কিলেস	...	ক্লেশ	...	ঐ

লইয়া 'সাধনা' পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দার্থের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছেন। ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তৎকৃত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন ও তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ৺অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির পদসমূহের দুরূহ শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎসম্পাদিত চৈতন্য ভাগবতের টীকায় এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের টীকায় এ সম্বন্ধে কিছু শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকায় এতৎ সম্বন্ধে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কোন প্রশংসাই তাঁহার পক্ষে অতিশয়োক্তি নহে।

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম
কিসান	কৃষাণ ...	শূ. পু.
কুসুমমালী ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
কেওদা ...	কেঁদো ...	ঐ
খচরা ...	শূন্যগামী ...	ঐ
খীরকম্বা ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
খুদ্দ ...	ক্ষুদ্র ...	ঐ
খেজুরছড়ি ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
খেমরাজ ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
খোঁটা ...	কীলক ...	ঐ
গতি ...	সেবক ...	ঐ
গামারি ...	গাম্ভারা বৃক্ষ ...	ঐ
গারস্তর ...	গৃহস্থের ...	ঐ
গুজুরা ...	ধান্যভেদ	ঐ
গোঁতমপলাল	ধান্যভেদ ...	ঐ
গোপালভোগ ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
চন্দ্রহাস ...	অস্ত্রভেদ ...	ঐ
চানক ...	চাঁদোয়া ...	ঐ
ছিছরা ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
ছিহথ ...	শ্রীহস্ত ...	ঐ
জগদাল ...	জগদ্দল, ভারী পাথর ...	ঐ
জম্ভা ...	জিহ্বা ...	ঐ
জোলি ...	নিভাঁজ ধান্য ...	ঐ
ঝিঙ্গাশাল ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
ঝিসিকানি ...	বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ...	ঐ
ডকবুস ...	ডাঙ্গস ...	ঐ
ডহর ...	জলাভূমি ...	ঐ
ডাড়ুকা ...	শৃঙ্খলবিশেষ ...	ঐ
তরাজু ...	পাল্লা ...	ঐ
তাঁউল ...	তণ্ডুল ...	ঐ

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম
তামাক ...	তাম্রনির্ম্মিত পুষ্পপাত্র ...	শূ. পু.
তেঠঙ্গা ...	ত্রিভঙ্গ ...	ঐ
তোজনা ...	ধান্যবিশেষ ...	ঐ
ত্রিরূচ ...	ত্রিমুখ ...	ঐ
দম্বদার ...	দোম্‌মাদার ...	ঐ
দাইআ ...	দা দিয়া কর্ত্তন করিয়া ...	ঐ
দুআপর ...	দ্বাপর ...	ঐ
দুহুরাঅ ...	দুধরাজ ...	ঐ
দেউল্যা[১] ...	পূজাকারক ...	ঐ
দেহারা ...	মঠ ...	ঐ
ধিরকালি ...	বাদ্যবিশেষ ...	ঐ
ধুন্ধুকার ...	শূন্যাকার ...	ঐ
নিছনি ...	ঝাড়ন ...	ঐ
নেতর ...	বস্ত্র ...	ঐ
পর্ব্বতজিরা ...	ধান্যবিশেষ ...	ঐ
পাকানা ...	জড়িত ...	ঐ
পাটএ ...	মঞ্চে ...	ঐ
পাটসালে ...	রাজসভায় ...	ঐ
পাড়ন ...	পাটাতন ...	ঐ
ফেফেরি ...	ধান্যবিশেষ ...	ঐ
বারমতি ...	বারদিনব্যাপী ধর্ম্মোৎসব ...	ঐ
বিহরাম ...	বিশ্রাম ...	ঐ
বিহানে ...	প্রাতঃকালে ...	ঐ
ভাদোলী ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
বেসাতি ...	হাটে বিক্রয়ের দ্রব্যাদি ...	ঐ
বেলাল ...	বিল্ব ...	ঐ
ভেক ...	বেশ ...	ঐ

১. বর্ত্তমান 'দেউলিয়া' শব্দ এই শব্দ হইতে উদ্ভূত। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সম্ভবতঃ লোকে দেব-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম
মইপাল	... মহীপাল, ধান্যভেদ	... শূ. পু.
মনুহর	... মনোহর	... ঐ
মহীপাল	... ধান্যভেদ	... ঐ
সালুক	... কুমুদকন্দ	... ঐ
সাঁঝা	... সন্ধ্যায় আলোকদান	... ঐ
সনাখড়কি	... ধান্যভেদ	... ঐ
সালছাটি	... ধান্যভেদ	... ঐ
সীতাসালী	... ধান্যভেদ	... ঐ
সীফল	... শ্রীফল	... ঐ
হাতিপাঞ্জর	... ধান্যভেদ	... ঐ
হুকুলি	... ধানের গোছা	... ঐ
হুতার	... অগ্নির	... ঐ
মুক্তাহার	... ধান্যবিশেষ	... ঐ
মোখ	... মোক্ষ	... ঐ
মৌকলস	... ধান্যবিশেষ	... ঐ
লাউসালী	... ধান্যভেদ	... ঐ
লালকামিনী	... ধান্যভেদ	... ঐ
লিঙ্গা	... বাদ্যযন্ত্র বিশেষ	... ঐ
বম্ভগাঁঠি	... ব্রহ্মগ্রন্থি	... ঐ
বরঙ্গ	... বাদ্যযন্ত্রবিশেষ	... ঐ
বাঅন	... বামন	... ঐ
বাঁঝা	... বন্ধ্যা	... ঐ
বিকৃখ	... বৃক্ষ	... ঐ
বাম্ভন	... ব্রাহ্মণ	... ঐ
বাঁসমতী	... ধান্যভেদ	... ঐ
বোআলি	... ধান্যবিশেষ	... ঐ
সইতর	... সঙ্গের	... ঐ
অক	... উহাকে	... মা. চ. গা.
অগর	... অগুরু চন্দন	... শূ. পু.

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম
অচুম্বিতের	আশ্চর্য্যের	মা. চ. গা.
অফিল্লা	আফুলা	ঐ
অবুধ	বুদ্ধিশূন্য	ডাক
আউঢাউ	আইঢাই	মা. চ. গা.
আউ	পরমায়ু	ঐ
আউল	সিদ্ধ ব্যক্তি	ঐ
আউড়ে	বক্রভাবে	ঐ
আও	রব	ঐ
আধার[১]	খাদ্য	ডাক
আপহর	পাহারা	ঐ
আপ্ত	আপন	মা. চ. গা.
আছিল	উপস্থিত	ঐ
আইল পাতার	এলোমেলো	ঐ
আরিব্বল	আয়ু	ঐ
আসা নড়ি	হাতের লাঠি	ঐ
একতন যেকতন	যে কোন প্রকারে	ঐ
একলা	এক	ঐ
এলায়	এখন	ঐ
উকা	উল্কা-মশাল	ডাক
উলী	কুশল	খনা
কা	কাক	ঐ
কাউ	কাক	ঐ
কাউশিবার	তাগাদা করিতে	মা. চ. গা.
কাত্তি	কালী ; কার্ত্তিক মাসে	ঐ
কাঞ্চী	ছোট	ঐ
কোনটি	কোথায়	ঐ
কোটেকার	কোথাকার	ঐ

১. 'আধার' শব্দ পূর্ব্বে মনুষ্যের খাদ্যও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু পক্ষীর খাদ্য বুঝায়।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
কুশলানী	…	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী	…	ডাক
কৈতর[১]	…	পায়রা	…	মা. চ. গা.
খপরা	…	কুটীর	…	ঐ
খোচা	…	তৃণ পল্লব	…	ঐ
গাভুর[২]	…	যুবক, বলশালী	…	ডাক
গাবুরাণী[৩]	…	যৌবন	…	মা. চ. গা.
গিরি	…	গৃহী	…	ঐ
গোবিন	…	গভীর	…	ঐ
গোঁধলা	…	গোময়	…	ডাক
ভরজুয়ান	…	পূর্ণ যৌবন	…	মা. চ. গা.
চতুরা	…	চতুষ্কোণ অঙ্গন	…	ঐ
চাম্বর	…	চামর	…	ঐ
চরিচর	…	উপায়	…	ডাক
ছামুর	…	সম্মুখের	…	মা. চ. গা.
ছুহ্ন	…	শূন্য	…	ঐ
জীউ	…	জীবন	…	ঐ
জ্ঞাস্তা	…	জ্ঞাতি	…	ঐ
ঝোলাঙ্গা	…	ঝুলি	…	ঐ

১. এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

২. বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত।

৩. গ্রীয়ার্সন্ 'গাবুরাণী'র অর্থ করিয়াছেন :—"Bridehood"—বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যাল্, ১৮৭৮, প্রথম সংখ্যা, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃঃ। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাভুর, গাভুরাণী, এই উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও ইহার অর্থ যৌবন বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত স্থলে গাবুরালি (পাঠান্তর গাবুরাণী) শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে। এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন,—With reference to the word "Gaburani", about which I wrote to you the other day, I have since found out that the word "Gabur" is very common in Chittagong. It means "young", also "a boy", hence "a servant". The word "Gaburani", therefore, means "youthfulness", and has the same meaning as "yauvana". It has nothing to do with the Sanskrit "Garva".

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম
ডাঙ্গ[১]	কাটি	মা. চ. গা.
ডারিয়া	নিক্ষেপ করিয়া	ঐ
ডাঙ্গাইবার	প্রহার করিতে	ঐ
ডাম্বাডোল	বহুজনতার শব্দ	ঐ
ঢেবা ডোরা	ঢোলের দ্বারা ঘোষণা	ঐ
ঢলমল	ঝলমল	ঐ
তেতকে	তত	ঐ
তৈল পাটের খাড়া	যে খাড়াকে তৈল নিষেকে শাণিত করা হয়	ঐ
দায়[২]	ডাক	ঐ
দোয়াদশ	করঙ্গ	ঐ
দামরা	ঢোল	ঐ
দোন	দুই	ঐ
থবীরা	স্থবির	ডাক
ধরেক	ধরিও	ঐ
ধওল	ধবল	মা. চ. গা.
নঠ	নষ্ট	ডাক
নিন্দ	নিদ্রা	মা. চ. গা.
নিতে	বিনা	ঐ
নেওয়া	প্রলেপ	ঐ
নেয়াই	ন্যায়	ঐ
পইতায়	প্রত্যয় করে	ঐ
পোখরি	পুষ্করিণী	খনা

১, হফ্‌টন-কৃত অভিধানে ডাঙ্গ শব্দ সংস্কৃত দণ্ড শব্দ হইতে উদ্ভূত, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

২. এই "দায়" শব্দ পূর্ব্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাণিকচাঁদের গানে আছে,—

"যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,
ঘরর শ্যামক আইল বাপ দায় দিয়া।"

রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আসিল। অনেক পরে চৈতন্য ভাগবতে পাইতেছি, "অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন"—অর্থাৎ অন্যের কথা দূরে থাকুক ইত্যাদি।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
পাহাড়	...	পার	...	ডাক
পাকেয়া	...	ঘুরাইয়া	...	মা. চ. গা.
বাবন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বাঢ়ণ	...	ঝাঁটা	...	ঐ
বাদে	...	জন্য	...	ঐ
বেন্নামুখ	...	মুখ ফিরাইয়া	...	ঐ
বুন্দা	...	বৃষ্টি-বিন্দু	...	ঐ
ভুসঙ্গ	...	ভস্ম	...	ঐ
বেআলি	...	অনৈক্য	...	ডাক
মাও	...	মাতা	...	মা. চ. গা.
মধুকর[১]	...	নৌকা বিশেষ	...	ঐ
মাল্লি	...	পথ	...	ঐ
মাড়াল	...	পথ	...	ঐ
মিঠ	...	মিষ্ট	...	ঐ
মুর্চ্ছল	...	বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ	...	ঐ
যেটে	...	যে স্থানে	...	ঐ
যেত্কে	...	যত	...	ঐ
যোগ্যবান্	...	যোগ্য	...	ঐ
যেনমত	...	যখন মাত্র	...	ঐ
লহড় (লড়)	...	দৌড়	...	ঐ
সয়ল[২]	...	সকল	...	শূ. পু.
সমাধে	...	বোঝে	...	ডাক
সাধে	...	সংগ্রহ করে, লয়	...	মা. চ. গা.
সানে	...	ইঙ্গিত	...	ঐ
সরুয়া	...	সরু	...	ঐ

১. "মধুকর" নৌকা-বিশেষের নাম। পদ্মাপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে 'মধুকর' নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়; স্বয়ং চাঁদসদাগর 'মধুকরে' যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও 'মধুকর' অর্থে একরূপ নৌকা বুঝায়।

২. "একল রামাই পণ্ডিত সয়ল অবধান ॥"

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
সাঁও	...	সাপ	...	মা. চ. গা.
সেঁওয়ালী	...	সন্ধ্যাকালীয়	...	ঐ
হীন	...	শূন্য, বিয়োগ	...	খনা

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একেবারই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মাণিকচাঁদের গানে রাজা ভাল হইলে তাঁহাকে 'সতী' এবং দুষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে। খনা শনিকে 'ভানুতনুজা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহু-পূর্ব্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ায় 'গুণবতী ভাই' শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল। * 'যাইস না ধর্ম্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া।' (মা. চ. গা., ২৯২ শ্লোক) * প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, * 'কেন! কেন নেঙ্গা আইলেন কি কারণ' (৪৯ শ্লোক); * মাণিকচাঁদ রাজা তাঁহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, * 'কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া (৭২ শ্লোক)।* কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন * 'তুমি চাহিলেন দুধ' (৩০০ শ্লোক)। * প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা।

এই সময়ে রাজারা সোনার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন (৩০৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার (৪৬৭ শ্লোক) করিলেও নিত্য জীবনযাত্রা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 'ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক), 'দণ্ডপাখা' (২৫৪ শ্লোক) ও 'পাটের সাড়ী' (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখানা 'পাটের পাছড়া' পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ 'মেঘ ডম্বুর' কাপড় ও 'জগন্নাথী থান' নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিতেছেন।[১] চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট-কম্বলই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেছে (চৈ. চ., মধ্যমখণ্ড, ২০ প.)। সে সব এ সময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" (২২৫ শ্লোক,

সামাজিক অবস্থা।

---

১. রাজার জন্য সাধু "নিল জগন্নাথী থান দশ জোড়া।" ক. ক. চ.।
সাধুর স্ত্রী "বাছিয়া পরিল মেঘডম্বুর কাপড়।" ঐ

মা. চ. গা.) নামক একরূপ মিষ্টদ্রব্য উপাদেয় ছিল ও 'বংশহরির গুয়া' (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। 'বংশহরির গুয়া খাইয়া' দন্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের অক্ষক্রীড়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে 'সাদিনা', দশদিন পরে 'দশা', এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব করা হইত।

শূন্য-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নানা প্রকার ধান্যের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। কৃষকগণ তাহাদিগকে আদর করিয়া নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করিত। সেই "মহীপাল", "লালকামিনী", "মৌকলস", "খেজুরছড়া", "রাজগড়", "মুক্তাহার", "মাধবলতা", "সোনাখড়কি" প্রভৃতি অসংখ্য নামধেয় ধান্যের কথা এখন আর আমরা জানি না। বঙ্গের আদরের সামগ্রী মহীপালধান্য এখন মহী-পালন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি
২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ

ধর্ম্ম কলহ।

বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতূহল-উদ্দীপক। গৌড়বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন; সে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম "বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী"।[১]

বঙ্গসাহিত্যে শিব, পদ্মা চণ্ডী ও শীতলা।

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে। শৈবধর্ম্ম-কীর্ত্তনোপলক্ষ্যে ভাষায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত না হইলেও "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে[২] শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; এইরূপ দু'একখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্ম্মের ভগ্ন-কীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। উহারা ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও সেগুলি জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা সাদরে রক্ষা করিয়াছি।

যদিও শিবের গান বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বৃহদাকার ছড়া বা পালা পাওয়া যায় নাই, তথাপি প্রাচীন সমস্ত মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পুঁথিতেই শিবের আখ্যায়িকা অতি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে,—এতদ্বারা শিবের গানই যে

---

১. প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

২. ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়:—

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী
জন্মস্থান সুক্ষদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে শ্বশুর শঙ্কর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
মৃগলুব্ধ পুঁথি এহি হর গৌরীর পায়॥"

এই পুস্তকে শিবচতুর্দ্দশীব্রতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাই প্রতীয়মান হয়,—এই গানকেই অবতরণিকা করিয়া অপরাপর দেব-দেবীর প্রসঙ্গ বিরচিত হইত। সম্প্রতি গোরক্ষ-বিজয়ের একটি প্রাচীন পালা আমার হস্তগত হইয়াছে,—শিবের প্রসঙ্গ তাহারও মুখবন্ধ। এই সকল গানে শিব কৃষকরূপে, ভাঙ্গড়রূপে, কখনও বা নানারূপ তন্ত্রের গুরুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষকেরা তাঁহাকে কৃষকরূপে অধিকাংশ স্থলে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গালী তাঁহার দেবতাকে সর্ব্বদাই তাঁহার ঘরের লোক বানাইয়া হৃদয়ের অতি সন্নিহিত করিয়া পূজার অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

শূন্য-পুরাণ এবং রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রণীত শিবায়ন গ্রন্থে শিব সম্বন্ধে এক একটি এরূপ অধ্যায় আছে যে, তাহা প্রাচীনতম শিবগীতের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। তাহাতে শিব বৃদ্ধ কৃষকবেশে কুবেরের নিকট কিছু ধান্য মূলধন গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী ভীমভৃত্য তাঁহার নির্দ্দেশে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র চৌরস করিয়া চষিতেছে। শিবঠাকুর ক্ষেত্রের মশা এবং জোঁক ধ্বংস করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব অবতারিত হইয়াছে। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত'—এই প্রচলিত কথার সার্থকতা এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে বাগ্দিনীরূপিণী ভগবতীর শীলতাহীন রসসন্দর্ভও প্রাচীন শিবগীতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক শিবের সঙ্গে এই কৃষকরূপী কামিনীলুব্ধ শিবের কোন সম্বন্ধ নাই।

লৌকিক দেবতাদের প্রভাব ; শৈবধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শমণি-তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্রও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; এই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়া এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে[১] কালকেতু ও শালবাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল।

শৈবধর্ম্মের উপর এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরঙ্গ উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডাকিনী-দেবতা' চণ্ডীর

১. "ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা ॥" ইত্যাদি।

ঘট পদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া 'মেয়ে দেব'-সেবিকা খুল্লনাকে ভৎ'সনা করিয়াছিলেন ;[১] বিষহরিদেবীকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই ; হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।[২] শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজাও শীতলাদেবীর প্রতি সেইরূপ তীব্র অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন।[৩] কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য-গুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসক ভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য্যতৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্য্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিদেবীকে পূজা করিয়া বিপুলা (বেহুলা) কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা কে না জানে ? ভক্তের স্মরণমাত্র ইহারা কখনও সাশ্রুনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দু'এক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গাম্ভীর্য্যে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর একখানি সমুন্নত প্রতিলিপি। সমস্ত দেবগণের তেজোরাশি-সমুদ্ভূতা চণ্ডীকে বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র বজ্র, শিব শূল, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি ও লোকপালগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ উপহার দিয়া প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তিপুঞ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহাররূপিনী সিংহের উপর দাঁড়াইলেন। ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাবিলনের প্রস্তরগৃহ যাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন এ বিগ্রহ গঠন করিবে কে ?

---

১. ধনপতির সিংহলযাত্রা, ক. ক. চ.।

২. "হেতালের বাড়ি দিলগো আগো তাতে ব্যথা পাইলাম বড়।
জালুয়া মণ্টপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড় ॥" বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

৩. "জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুন রে অজ্ঞান বুড়ি এথা হৈতে দূর ॥"

তৎপর শীতলাদেবী যখন তাঁহার রাজ্যে মহামারী উপস্থিত করিলেন, তখনও নির্ভীক চন্দ্রকেতু বলিয়াছিলেন—

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ ॥"

দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫ সন, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃ.।

কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাঁদ সদাগরের সাতখান 'মধুকর ডিঙ্গা' খান খান হইয়া সমুদ্রে পড়িল। চাঁদবেণে 'শিব শিব' বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল,[১] কিন্তু শিবঠাকুর নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম। ধনপতির অশ্রু মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই! সুতরাং বিষহরি দেবী ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসায় ছিল।[২]

শিবের নিশ্চেষ্টতা।

শৈবধর্ম্মের শেষ কথা "শিবোঽহং"। জীব মাত্রই পাশমুক্ত হইলে শিব হইতে পারেন। শিব গুণাতীত, আনন্দস্বরূপ। ইঁহার নিকট কামনা করা বৃথা। ভগবানের পৃথক সত্তা এবং সগুণ-ভাব, উন্নত শৈবগণ দ্বৈতবাদীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন না; সুতরাং লৌকিক কাব্যসমূহে শিবের এই নিশ্চেষ্টতা কেন হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। এদিকে জনসাধারণ "শিবোঽহং" বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনও সাহস করে নাই। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চায়। বোধ হয় শক্তি-আরাধনা এই জন্য তাহাদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে মশানে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, কিংবা বিষহরিদেবী বেহুলাকে তাঁহার মৃত স্বামী ফিরাইয়া দিতেছেন,—এই সচেষ্ট দয়ার ভাব এবং গুণবত্তার পরিচয় তাঁহাদিগকে নববল-সম্পন্ন করিয়াছিল। বিশেষতঃ, যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা নিগু'ণ ব্রহ্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমানবিজয়ের পর এইজন্য শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে;

১. "ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তড়।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥" কেতকাদাস।
পুনশ্চ,—"যা করেন শিব-শূল, এবার পাইলে কূল,
মনসায় বধিব পরাণে।" কেতকাদাস।

২. "দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া॥" চৈ. ভা., আদি।

তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্দ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শক্তি প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা ধর্ম্মবিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।

পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিভিন্ন মতের একতা।

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-সূত্র প্রচারিত হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাস জটিল করিতেছে! বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও শ্যামোপাসকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্র-চর্চ্চার বহুল বিস্তার।

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনূমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে॥
হনূ বলে প্রাণপণে করি প্রভু-হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত॥
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনূমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

"ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল এইবার॥
সেই হতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥"

চৈ. চ., মধ্যমখণ্ড, ৯ম পঃ।

এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ত্ব পৌছাইতে যত্নপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গরুড় পুরাণ, এইরূপ প্রায় তাবৎ পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে জীব-হনন ব্যাপার একান্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে যুদ্ধস্পৃহা ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধভাব হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও জিঘাংসাবৃত্তি-বিরোধী করিয়া তুলিল। মায়াবাদে একান্তরূপে আশ্রয়পরায়ণ, বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিব-সুখসম্ভোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইল। অবশ্য শেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম[১] যে আকার

১. বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ সময়ে নাস্তিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণীতে বৌদ্ধদিগের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

(ক) "ন স্বর্গো নৈব জন্মান্যদপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ কর্ত্তা নৈবাস্ত কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা। প্রত্যক্ষান্নপ্রমাণং ন সকলফলভুগ্ দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ।"

অর্থ,—স্বর্গ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, সংহারকর্ত্তা নাই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি

ধারণ করিয়াছিল, তাহা উন্মূলিত হওয়াতে ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেই ধর্ম্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে নর-হৃদয়ে নবভাব অঙ্কুরিত হইল, তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। আমরা ধর্ম্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিকে লাভালাভের গণনা করে নাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই। পুরুষ-দিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক. ক. চ.) ; লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ককুহক দূর করিতেছেন (ক. ক. চ.)। বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন বিপুলা তদ্বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছেন (হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ) ; কর্ণসেন যখন রঞ্জা-দেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট বিস্মৃত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন তাঁহার স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধরণে পরাঙ্মুখ হন নাই (ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল, ৪র্থ সর্গ)।

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্ত্রচর্চ্চা সমাজের নিম্নতম স্তর, এমন কি, মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ

সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

(খ) "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্॥"

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ বিহার করিবে ; আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবে।

(গ) "কা সৃষ্টৌ পরিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ।
কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলালাদিতঃ॥"

অর্থ,—যখন মাতাপিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই যেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবনা কি আছে। অর্থাৎ সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছ, এজন্য পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করার প্রয়োজন কি?

কংসনদের জলপান করিয়া দুঃখভারাক্রান্তহৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই। যদিও ভাষাগ্রন্থগুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়,[১] যাঁহারা নব হিন্দুধর্ম্মের নেতা হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবির জোলাতাঁতি, রাইদাস চর্ম্মকার, দাদুপন্থীপ্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ দাদু ধুনরী, পীপা রাজপুত, ধনা জাট এবং সেনগ্রন্থী-প্রবর্ত্তক সেন[২] নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন।[৩] ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল, তাই চর্ম্মকারও ধর্ম্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রবাদ এই, মিস্ প্যারিঙ্গ্‌টন্ স্বীয় কুটীরের দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সন্মার্জ্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ সমাজের গোঁড়াগণও এই

পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি।

---

১. "যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল নির্ব্বংশ।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥" কাশীদাস।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ!
পরীক্ষিৎ রাজা বলিতেছেন;—
"এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ-বচন॥"
ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

২. পূর্ব্বে বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী) রাজাদিগের কুলনাপিত ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি সন্তানেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৩. প্রসিদ্ধ 'কড়চা' লেখক (পদকর্ত্তা নহেন) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন।
"বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥"—কড়চা।

ধর্ম্মপ্রবাহে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানবিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,— * "কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে, আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে"[1] * এবং সংস্কৃতে এই ভাবসূচক শ্লোক রচনা করিয়া ভাষা-সাহিত্য অঙ্কুরে নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, * "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" * কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদ ও শিক্ষার স্রোতঃ প্রতিরুদ্ধ হয় নাই।

রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর।

পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন; তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্ম্মবিশ্বাসানুকূল কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ অনুবাদ-গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য, অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীর্ত্তন-রচকগণও তদ্রূপ উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চণ্ডীপূজার ন্যায় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ও ভজন অর্থপ্রদ, কিন্তু সম্মানাস্পদ ছিল না[2]। নিম্ন-শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, ঢক্কানাদে তাঁহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং

---

১. **Mahamahopadhyaya Hara Prasad Shastri's pamphlet on Old Bengali Literature p. 13.**

২. চৈতন্যপ্রভু শ্রীধরকে বলিতেছেন,—

"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।।"

এবং লাভজনক বিষহরি ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন।—চৈ. ভা., আদি।

তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।[১] মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন,[২] তথাপি তাঁহারাই প্রকৃতরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুল-অবস্থায়ই শুষ্ক হইত, ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিত না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব

১. "দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥"
বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ৪০৬ গৌরাঙ্গাব্দ, ১৬ই মাঘ।

২. "কেহ বলে এগুলোর হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিবে এই ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত পানা কোন ব্যবহার॥
মনে মনে বলিবে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥"

ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদাই চৈতন্যপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥—" চৈ. ভা., মধ্যমখণ্ড।

চৈতন্যপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহাত্মাগণ তন্ত্ররত্নাকরে কতকগুলি শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে "বটুক ভৈরব একদা ভগবান্ গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইয়াছিল, কি কোনরূপে বিদ্যমান ছিল?"

গণদেব উত্তর করিলেন,—

"স এষ ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া পরমাবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান্ সৃজদ্বহূন॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥"

ইহার সারার্থ এই, "ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্মনাশের জন্য গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া লোকসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।" ইহার পর এই ভাবের আরও অনেক নিন্দাবাদ আছে।

করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫৩৭ শকে) সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ। আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালা 'পদামৃতসমুদ্রে'র সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত?

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ

ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

যাহারা টেন, ডাউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্মে, জেসমাইন আর জুঁইএ একটা প্রভেদ আছে; ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে, জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ইংরেজ কবির স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা।

ইংরেজ কবি চসার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্‌সার তাহা স্পর্শ করেন নাই; আবার ক্যাণ্টারবারি টেল্‌স্ কি ফেয়ারি কুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারাডাইস্ লষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ওয়েবষ্টার, ফোর্ড, বেন জনসন, চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন; একজনের রাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ।

বাঙ্গালী কবির অনুকরণ-প্রিয়তা ও তদ্দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হ'ন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না; এক কবির পূর্ব্বে আর এক কবি, তৎপূর্ব্বে অন্য এক জন, এই ভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না,

সম্ভবতঃ তিনি লোকপরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না। চৈতন্যভাগবতকার মঙ্গল-চণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা দ্বিজ জনার্দ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয়, এইরূপ কোন মাল-মসলা লইয়া মাধবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের তপস্যার বলে নিজে অমর বর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কানা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালায় রচনা করেন কবি কঙ্ক, তিনি চৈতন্যপ্রভুর সমকালবর্ত্তী। তৎপর কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর প্রাণরাম নামক এক কবি তাঁহার দৃঢ় যশের দুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি নিমতা-নিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলুব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা,—ময়ূর ভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্ত্তী, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম, শ্যামপণ্ডিত প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণনন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ, ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ কবি মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদিগৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন। এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় সমুদায় প্রাচীন কবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্য ও কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে'র ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি,—

"পুস্তকের কথা এই কর অবগতি।
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি॥
ভগ্নীসুত নাম এক তজম্মুল আলি।
আছিল আমার যেন সবাকারে বলি॥
অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান।
না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান্॥
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি।
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী॥
আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল।
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল॥
না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন।
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন॥
... ...
একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান।
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান॥
কহিল আমাকে সবে করিয়া মান্যতা।
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা॥
আদি অন্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী।
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি॥
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে দুষ্কর।
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর॥
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার।
স্পষ্টরূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার॥
....
অলঙ্ঘ্য তা সব বাক্য ধরি আমি শিরে।
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক।"......

হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া সুন্দরী।"

... ...
"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥

খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্যা তথায় একতপ্পা বিশ্বাম্বর ॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে ॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার ॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য ॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
সমান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা ॥”

কৃষ্ণরাম-প্রণীত “রায়মঙ্গল”।

মনসামঙ্গল-লেখক বিজয়গুপ্তও উক্ত মঙ্গল-লেখকগণের অগ্রবর্ত্তী কাণা হরিদত্তের গানের অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া স্বীয় কাব্যরচনার সমর্থন করিয়াছেন।

এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের স্বত্ত্ব। নূতন পথে লেখনী প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয়, একথা স্বীকার করিতেন না। তাই তাঁহার কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হ্যাইডি কি ডোনা জুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই। ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পনা অন্য জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্যকেও বিল্বপত্র ও তুলসীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কি না, ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা এই

প্রাচীন ক্ষেত্র আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই ; সৌর-জগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রের সেই নিয়ম দৃষ্ট হয় ; কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই ; কোন্ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' পদ্মাবতীর 'বারমাস্যা', 'পদকল্পতরু'তে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ), বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলাওল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর 'বারমাস্যা' 'মুরারি ওঝার নাতি' শ্রীধর-প্রণীত রাধার 'বারমাস্যা', সেখ কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্যা', সেক জালাল প্রণীত সখীর 'বারামাস্যা',[১], এইরূপ রাশি রাশি 'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পথে ঘাটে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহা উপর্য্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে। কবি-বল্লভের * "না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পারব হাম পিয়া দরশনে॥ * এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,— * "এ সখি কর তহু পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রখেবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।" (পদকল্পতরু, ৪৬ পদ) ;* যদুনন্দন দাস,— * "উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিও বাঁধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।" (পদকল্পতরু, ১৮৬ পদ) ; * নরহরি,— * "করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া॥ লেহ এ ললিতা মণিহার। অনুখন গলায় পরিহ আপনার। রপিনু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইহ তারে॥ তোমরা কুশলে সব রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো॥ নরহরি কৈরো এই

কাব্যের অংশ রচনায় অনুকরণ-বাহুল্য।

১. শেষোক্ত তিনটি "বারমাস্যা" বঙ্গসাহিত্যে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে।

কাম। সে সময় কাণে শুনাইও তাঁর নাম।" (সাহিত্যপত্রিকা, ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯); * কৃষ্ণকমল,— * "দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাসা'ওনা তাহা যমুনা প্রবাহে। আমার শ্যামবিরহে পোড়া তনু, আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ—সব সহচরী, দুটি বাহু ধরি, বাঁধিও তমালের ডালে। যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার প্রাণের হরি, বঁধুর শ্রীঅঙ্গসমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে।"; * কবিশেখর,— * "কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে। নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥" (প. ক. ত, ১৬৭৯ পদ, সতীশবাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা); * অজ্ঞাত আর একজন কবি,— * "সখি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে, ভাসায়ো না যমুনা সলিলে। তুলসীদল বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ো তাহায় হরির নাম; বাঁধিয়া রেখো সখি তমালের ডালে" (সাহিত্য, মাঘ, ১৩০২, ৬০৬ পৃষ্ঠা) * এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি, * "আমি ম'লে এই করিও, না পোড়ায়ো না ভাসায়ো" * ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের,— * "হৃদি বিসলতা-হারো নায়ং ভুজঙ্গম-নায়কঃ।" * ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,— * "হাম নহ শঙ্কর হু বরনারী", * ও রামবসু * "হর নই হে আমি যুবতী। কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি॥ করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ, চেননা পুরুষ প্রকৃতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণ লোচন, ক'রে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূসর, মাখি নাই বিভূতি।" (বিদ্যাপতি, ৺জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণ, ১৫৫—১৫৬ পৃ.) * গানের ভাব অনুকরণ করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবিশেখর,— * "নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শঙ্কিত পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশী বলি হেরই গগনে॥" (পদকল্পতরু, ১৮৭১ পদ) * চুরি করিয়াছেন; চোরের উপর বাটপাড় কৃষ্ণকমল উহা হইতে * "প্যারি হেরি নিজ ঝরে, নখল নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) * ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের— * "এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর ধরুক তাহার তান, মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে উদয় হউক চন্দ।" (রমণীমোহন মল্লিকের

সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা), * পরে বিদ্যাপতির * "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা। পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা ॥" * এবং পরে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে— * "আজি মোর মন্দিরে আওবে কালা, কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা। (মা. চ., ২৪৬ পৃ) * প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ইহা ইংরেজীর parallel passage অর্থাৎ অনুরূপ রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিন-দুপুরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্ব্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্য পূর্ণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয় ; সেগুলিতে উদ্গম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে, ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সকল কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন ? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে ? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে ?

অনুকরণের দোষ ও গুণ।

কিন্তু সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত-পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণব-গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাবজাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর', ও

'আজানুলম্বিত বাহু'র ন্যায় রাশি রাশি সংস্কৃতের আবর্জ্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যোজাত এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে * "শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥" (বিদ্যাপতি) * প্রভৃতি পরিচিত তুলনামূলক কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন *"দেহি পদপল্লবমুদারং" * গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা যন্ত্র-প্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল; কিন্তু বলরাম দাস যে দিন * "নিদঁ যায় চাঁদবদন শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা" (পদকল্পতরু, ১১০০ পদ) * ও কৃষ্ণকমল * "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি" (দিব্যোন্মাদ) * রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।

বৈষ্ণবগীতির স্বাধীনভাব।

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগাথা প্রকাশের পর আমাদের এই অধ্যায়-লিখিত ধারণার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। মঙ্গলগানগুলি পূজা-মণ্ডপের জন্যই রচিত হইত। চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতা-দিগের উৎসব উপলক্ষ্যে এই সকল মঙ্গলগান-রচনার প্রয়োজন হইত, সুতরাং কবিগণ উপর্য্যুপরি একই বিষয় লইয়া কাব্য প্রণয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কাব্যের বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন। আমরা একটি মাত্র মহুয়া, একটি মাত্র মলুয়া, একটি মাত্র চন্দ্রাবতী পাইতেছি এবং প্রত্যেকটি পালা গান এক একটি পৃথক বিষয় লইয়া লিখিত, দেখিতেছি। একথা নিশ্চয় যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বঙ্গসাহিত্যের গণ্ডী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হয়।

পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে 'শ্যামরায়', 'আঁধাবঁধু' ও 'ধোপার পাঠ' ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা ও মালঞ্চমালা তাহারও অনেক পূর্ব্বের রচনা। এই সকল সুপ্রাচীন পল্লীগাথায় গুপ্তযুগের আদর্শ পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, তাঁহাদের স্বর্গীয় ত্যাগ স্বীকার, সমাজের স্বাধীনতা ও উদার-বৃত্তি এবং নায়ক-দের দেশ-বিদেশে পর্য্যটন, অদম্য সাহস ও বিপদকে অবাধে বরণ করিয়া লওয়া

—বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পথে নিঃশঙ্কভাবে যাতায়াত ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান—এ সমস্তই গুপ্তযুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ও জাতি-ভেদের কড়াকড়ি নিয়ম আদৌ নাই, আছে—আত্মনির্ভরতা ও কর্ম্মশীলতা; অনেকটা বৌদ্ধ-ভাব এই সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত সাহিত্যের মূলনীতি হইল—আচার ও ব্রাহ্মণ্যজয় ঘোষণা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হইল,—কালিদাসের কবিত্ব আড়ালে পড়িল এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে নূতন টীকার সাহায্যে দাঁড় করাইয়া সমাজ সংগঠন করিতে কুল্লূকভট্ট ও রঘুনন্দন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। সুতরাং এ যুগের সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে কতকটা কবিত্বসম্পদ্ হারাইয়া ফেলিল। এই শাসনের অতল জল হইতে মনুষ্যত্বের প্রকৃত দাবী উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা যে "বেদবিধি-বহির্ভূত" ধর্ম্মপ্রচার করিলেন—তাহা লুপ্ত গৌরব যুগটিকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৌড়ীয় যুগ
অথবা
শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্য

১। 'পঞ্চগৌড়' ২। অনুবাদ-শাখা ৩। লৌকিক ধর্ম্মশাখা ৪। পদাবলী শাখা ৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা

মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বপর্য্যন্তও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূভাগ—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল ; এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম ছিল 'পঞ্চগৌড়'। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়দেশ অতি প্রাচীনরাজ্য।[১] পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, স্যাক্সন্‌দিগের 'ব্রেটওয়াল্ডার' ন্যায় গর্ব্বপূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্‌সাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান।[২] গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার এই গর্ব্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক গুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল 'সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত' জয় করেন। ইঁহারা এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজ-চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন

পঞ্চগৌড়।

---

১. গৌড়ের রাজধানী ৭৩৯ খৃ. পূ. অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলেমি গংগারিডাই সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। একরাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'—এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নাম গ্রহণ করে। Major **Rennell's Map of Hindoostan** দ্রষ্টব্য।

২. বিল (Beal) সাহেব-কৃত হিউএনসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর, শব্দের স্থলে **"Lord of the Five Indies"** দৃষ্ট হয়। (উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ?)

গীতিসমূহে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয়, কালক্রমে কবি ও স্তুতিজীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'-র ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা 'পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত ; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার-রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল ? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন ?

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম, ঈদ, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ্ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই ; কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১] কবি বিদ্যাপতিও নসির শাহ্ এবং গৌড়েশ্বর 'প্রভু গিয়াসউদ্দিন সুলতানের' প্রশংসা

[১] "শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান"—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

করিয়াছেন। নসির যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে।[১] কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন; কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাবচিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। মুসলমান সম্রাটই কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন শাহের প্রশংসা-সূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২] হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন এবং চট্টগ্রাম জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রী-পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটি খাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

এই সকল অনুবাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কবি আলাওল আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য

---

১. "সে যে নসিরা সাহ জানে। যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

২. (ক)—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
(খ) চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।
(গ) "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক'—বিজয়গুপ্ত।
(ঘ) "সাহ হুসন, জগতভূষণ, সেহ এহি রস জানে।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে॥"

মাগনঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী-কাব্যের অনুবাদ রচনা করেন। মাগনঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগনঠাকুর মুসলমান ছিলেন। সোলেমান নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গল্পপুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি নামক অপর একজন কবি পূর্ব্বোক্তভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজ-সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।

সুতরাং আমরা জগদানন্দের সঙ্গে কবি ষষ্ঠীবরের,[১] রঘুনাথদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামের, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিবসংকীর্ত্তন-লেখক রামেশ্বরের,[২] বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের,[৩] কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগনঠাকুরের সঙ্গে কবি আলাওলের[৪] ও রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের[৫] এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক কবি ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ (২য়) ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদন্ত স্বুবর্ণজড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্য্যাদার এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

---

১. "অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে ॥"—
সঞ্জয়—বে. গ. পুঁথি, ৭৮৯ পত্র।

২. "যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন ॥"—রামেশ্বরের শিব-সংকীর্ত্তন।

৩. "বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায় ॥"—
অনন্তরামকৃত ক্রিয়াযোগসার, হস্তলিখিত পুঁথি।

৪. বিরহ মত্তমাতঙ্গ বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে সসৈন্য হইল ভঙ্গ। অতি রসিক সুজন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলাওলে ভণে।—পদ্মাবৎ, ২০৪ পৃ.।

৫. "কহেন ভবানী দাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।" লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, রজনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের সংস্করণ (২৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড), ১২২ পৃ.

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন এই অধ্যায় 'গৌড়ীয় যুগ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চ-গৌড়েশ্বরের উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,— * "নিগু'ণ অধম মুঞি, নাহি কোন গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥"; * পরাগলী মহাভারতে— * "নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি। পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥" (কবীন্দ্র, বে. গ. পুঁথি, ১ম পত্র); * উক্ত মহাভারতে— * "প্রিয়পাত্র তাহান বিখ্যাত ছুটি খান। পঞ্চম গৌড়েতে যার নামের বাখান॥" (কবীন্দ্র, বে. গ. ২২৭ পত্রে); * মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে— * "পঞ্চগৌড়ে নামে দেশ পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, চট্টগ্রামের সংস্করণ ৮ পৃষ্ঠা) * ও অন্যান্য নানা পুস্তকে পঞ্চ গৌড়ের গৌরব কীর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছি। কৃত্তিবাস আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন,— * "পঞ্চ গৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥" * গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা 'গৌড়ীয় সাধুভাষা' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।

২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃত্তিবাস

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক। গৌড়েশ্বর-গণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহাদের কোন কোন পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাদের তারিখ ১০০ বৎসর পিছাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ, সেগুলিতে যে অব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি শকাব্দ বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহা শকাব্দ নহে, মল্লাব্দ। এই মল্লাব্দ হইতে শকাব্দ একশত বৎসরের প্রাচীন। এই সকল পুঁথির অধিকাংশই বাঁকুড়া পাত্রসায়ের নিবাসী রামকুমার দত্ত সংগ্রহ করিয়াছে এবং সেই সকল পুঁথির তারিখ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি মল্লাব্দ। সুতরাং হীরেন্দ্রবাবু যে পুঁথি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন মনে করিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম ২০০ বৎসর মাত্র এবং

এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদিত উত্তরাকাণ্ডকে খুব প্রাচীন নজির বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটি খুব সম্ভব কৃত্তিবাস লেখেন নাই ; অন্ততঃ কৃত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিতে "অঙ্গদের রায়বার" শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা পাইয়াছি, তরণীসেনের যুদ্ধের পালাটিও কবিচন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাল্মীকির গণ্ডী কেন অতিক্রম করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা. শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব ও শ্রীরামের চণ্ডীপূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে অনুবাদগুলি কতকাংশে বাল্মীকির প্রতিভা-বজ্রবিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সূত্র নিষ্ক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাদের কোন্‌গুলি বিশ্বাসযোগ্য ? 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' যে পূর্ব্ববঙ্গে পৌঁছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ঐক্য হইতেছে ; আমরা * "ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ছটফট। শীঘ্র করি রঘুনাথ গেলেন নিকট।" (পরিষদের পুঁথি) * ও * "বরিষা গোরাই গেল শরৎ প্রবেশ। রাম বলেন না হইলে সীতার উদ্দেশ॥" (পরিষদের পুঁথি, ৯৬ পত্র) * প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্তচিহ্ন অনুভব করা যায়। * খুল্লতাত পড়িল দুই তিন সহোদর। রুষিল অতিকা বীর যমের দোসর॥" (পরিষদের পুঁথি, ২২৭ পত্র)[১], এই দুই ছত্রও প্রায় একরূপ। কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই দুই ছত্রের পরে * "চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যানন্দন॥ রাবণ

১. পরিষদের জন্য আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি. সে রামায়ণখানি খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের হাতের লেখা এবং অনেক স্থল পাঠ-বিকৃতিপূর্ণ। কিন্তু এস্থলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব্ববঙ্গে যে ১২।১৪ খানা রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম।

সন্তান বলি দয়া না করিবে। দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥" * আছে, এইরূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরূপ হইল কেন? সুমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, কমলাক্ষ রামের 'কমল-আঁখির দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডীপূজার উদ্যোগ প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন; খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল-অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক বিকৃত বলা যায় না। বীরবাহুর সম্বন্ধে— * "ধরণী লুটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥" *, এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত কৌপীনসার শিখাযুক্ত বৈষ্ণবের কথাই মনে পড়ে, নতুবা রাক্ষসের পক্ষে এরূপ দৈন্য কল্পনা করিবার কোন সুযোগ কবিগুরু বাল্মীকি দেন নাই। শুধু রাম লক্ষ্মণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীরবাহু * "প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।" * এই কপিগণ যে চৈতন্যপ্রভুর পারিষদ্‌বর্গের ন্যায় স্পষ্টরূপে গুণচূড়া, ললিতা রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে রাবণের মুখে * "জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার। করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥ অপরাধ মার্জ্জনা করহ দয়াময়। কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়॥ * রামের নিকট এই মিনতি পড়িলে অনুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী চৈতন্যপ্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভুলিয়া তাহাকে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তরণীসেনের উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতেছেন। গঙ্গা-মৃত্তিকার হরেকৃষ্ণ ছাপ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, * "অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারি পাশে। তরণীর ভক্তি দেখে কপিগণ হাসে॥" * হাসিবার ত কথাই, এবম্বিধ হরি-সংকীর্ত্তনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলের পরিবর্ত্তে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আসিলেন, তাহাতে

রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব।

কপিগণ কেন হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন? তৎপর তরণীর রাম-শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন; এইখানেই বঙ্গীয় রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে। এই রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ত নিত্যানন্দ ও চৈতন্য-প্রভু সাজিয়া কেবল ভক্তের অশ্রুজল লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেই উচ্ছ্বাসে নিজেরাও কাঁদিয়া বিভোর হইতেছেন; কখনও সমাগত যুদ্ধার্থীর ভক্তি দেখিয়া বলিতেছেন,— * "রাম বলেন ভক্ত জানহ নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥" * কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন,— * "ক্ষুদ্র পুরী লঙ্কা দিয়া ভাণ্ডিবে আমারে। না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোঁসাই তোমার শরীরে।" * বলিয়া ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিকরেণু-রঞ্জিত সংকীর্ত্তন-ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল-বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; চক্ষুজল এতদ্দেশের একটি প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণ উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহা ঠিক বিকৃতি বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যদিও রাক্ষস বীরবাহুর শ্রীরামচন্দ্রকে * "রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন" * বলাতে রাক্ষসী বীর্য্যবত্তার বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূলনীতি উল্লঙ্ঘন করে নাই। বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্যকরী হইয়াছিল; এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্ত্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে, এই জন্য যোজনা হইলেও উহা বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধু 'লাফ' স্থলে 'ফাল', 'মা' স্থলে 'মাও' প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দগুলির দিকে অনুকূলতা দৃষ্ট হয়; পরিবর্ত্তন শুধু শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্ত্তন ত দেখা যায় না। তবে এক কৃত্তিবাস পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উপস্থিত হইলেন কেন? যদি প্রকৃতপক্ষেই

পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্ত্তন করিতে পারি? তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণবভাবের বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ সূচনা পাইয়াছি,—এই রচনাতে কবিগুরু বাল্মীকির বীণার ধ্বনি ফিরিয়া শুনিতেছি।

"বাল্মীকি বলিয়া গোসাঞি তুমি অন্তর্য্যামি।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি॥
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত।
যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান।
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র স্র্য্যের সমান॥
ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ সেই বলবান।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান॥"

ইত্যাদি,—বে গ. পুঁথি, ৪ পত্র।

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির ভূমিকায়ও এইরূপ দৃষ্ট হয়, ইহা অনেকটা মূলের অনুযায়ী। যাহা হউক, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণ সম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। ঐ সকল উপাখ্যান বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না।

কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন; তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা,

প্রেমাশ্রুপূর্ণ-চক্ষু ; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,— * রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিলে কিরূপে শয়ন করিবে ?' * রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু! প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও "চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা"[১] থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে, আর্য্য-ভুজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত! শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছিল,— * "বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধনুষ্পাণি রামমূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া নির্জ্জনে চমকিত হই।" * যখন গদ্গদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোক-রক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন না, পথে রক্তবিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতাবধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ন্যায় করাল-বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, ত্রিপুরান্তক হরের ন্যায় কিংবা যুগান্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সেই অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিতে রামের মনোহর চিত্র ভীষণতাশ্রিত অপূর্ব্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত,—পদ্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, রাত্রিজাগরণ-ক্লান্তা প্রভাতকালে শ্লথচরণা রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্মানের ন্যায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘ মণ্ডল, হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এবং বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার (ক্ষাত্রেয় তেজঃ, ব্রহ্মচর্য্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী,—বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সুন্দর হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা

১. লঙ্কাকাণ্ড, বিদ্যুৎজিহ্ব কর্তৃক মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ।

রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা। ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিতব্যয়ী বণিক্ ক্ষুদ্র দীপাধারটি অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে ; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিস্ফুট মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানের উপর উৎপীড়ন হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন, পুস্তকে হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন ; পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ[১] দৃষ্ট হয়। এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে ? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতি-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি ? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতি অর্থকরী নহে।

পাঠবিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্ব্বাংশেই পরিতাপের বিষয় হয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষার একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্ত এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চসারের গীতি কয় জনে পড়ে ?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করা আবশ্যক। আধুনিক শব্দের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল-রামায়ণ শ্রবণে সুখী হইবে কি না বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃত্তিবাসকে সমুচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার না হয় ?

১. "Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later MSS, always giving a smoothed-down version of the ancient dialects."—Mahamahopadhyaya Hara Prasad Shastri's Pamphlet on Old Bengali Literature, P. 3.

আমরা যে সব রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব-গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিল্বপত্র হয়ত এই জয়গোপাল কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, কৃত্তিবাস হয়ত তাহা পাইলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,—সুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥"

রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাদ্যার বন্দনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। আমরা "The Bengali Ramayanas"[১] নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বাল্মীকির পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রামায়ণ আখ্যান প্রচলিত ছিল; রামায়ণ-গাথা উত্তর ভারতে যে আকারে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাবণের সঙ্গে সেই উপাখ্যানের কোন সংস্রবই ছিল না; এবং ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে দাক্ষিণাত্যের বহু গাথায় দ্রাবিড় জাতীয় বীর রাবণ নায়করূপে পরিকীর্ত্তিত ছিলেন। "লঙ্কাবতার সূত্রে" তিনি বুদ্ধের সঙ্গে অনেক তর্ক, বিতর্ক করিয়া অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণিত আছে। জৈন-রামায়ণে দৃষ্ট হয়, ইনি যোগসাধনায় এরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন, যে পঞ্চ-ভূত ইহার আয়ত্তাধীন হয় এবং ইনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ বাল্মীকির পূর্ব্বেই উত্তর ভারতের রাম-গীতি এবং দাক্ষিণাত্যের রাবণ-গাথা একত্র করা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-গুরুকে হিন্দুগণ দস্যুরূপে অঙ্কন করিয়া

কবির অন্যান্য রচনা।

১. এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

যে মিশ্র-গাথার উদ্ভব করেন—বাল্মীকির প্রতিভা-মন্ত্র তাহার উপর রামায়ণরূপ বিশাল অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমি "The Bengali Ramayanas" পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাল্মীকি-পূর্ব্ব রামায়ণ-উপাখ্যানের অস্তগামী স্মৃতি এই বাঙ্গালা রামায়ণগুলিতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল প্রবাদ ও গাথা সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—যাহা বৃদ্ধ বাল্মীকির শুক্লকেশ ছাপাইয়াও প্রাচীনত্বের দাবী করিতেছে, তাহাদের চিহ্ন এই বাঙ্গালা রামায়ণে পাওয়া যায়। রাবণ ও হনূমান সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিতেই সেগুলি বিশেষরূপে বিদ্যমান। এই স্থানে তাহার পুনরায় অবতারণা করিয়া আমরা এই পুস্তক অতিরিক্ত মাত্রায় ভারাক্রান্ত করিব না। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে য়ুরোপে প্রচলিত অনেক আখ্যানের সঙ্গে বাঙ্গালা রামায়ণোক্ত কোন কোন কাহিনীর অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। গেলিক দেবতা বা অপদেবতা Balor-এর সঙ্গে ভস্মলোচনের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। Balor-এর একটি চক্ষুর দৃষ্টির এরূপ মারাত্মক গুণ ছিল যে, তাহা যাহার উপর ক্ষেপণ করিত তাহাই ভস্ম হইয়া যাইত। সে সর্ব্বদা সেই চক্ষু চস্‌মা পরিয়া ঢাকিয়া রাখিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেই চস্‌মা খুলিয়া ফেলিয়া শত্রুর দিকে চাহিত।[১] ভস্মলোচনও যে তাহার মারাত্মক চক্ষু চর্ম্মের ঠুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখিত ও রণক্ষেত্রে আসিয়া ঠুলি খুলিয়া শত্রুগণের দিকে তাকাইত, তাহা বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। গেলিক উপাখ্যানগুলিতে King Lludd-এর রাজ্যের একটি তস্করের কথা আছে। সে ঠিক মহীরাবণের মত মন্ত্রবলে সমস্ত লোককে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিত।[২] এই ভস্মলোচন বা মহীরাবণের বৃত্তান্ত কোন সংস্কৃত পুস্তকে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই উপাখ্যান-মালা সম্বন্ধে আদান-প্রদান কার্য্য কবে হইয়াছিল এবং ইহাদের কোনটির জন্য য়ুরোপ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী এবং কোনটি ভারতবর্ষ য়ুরোপ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা এখন কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধৃত করিতেছি। এই আত্মবিবরণটি প্রথমতঃ ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধি একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি হইতে

১. Charles Squire—Celtic Myth and Legend, p 49.
২. ঐ ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

নকল করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপর সাহিত্য পরিষৎ-সংগৃহীত একখানি পুঁথিতেও আমরা ইহা পাইয়াছিলাম। হারাধন দত্তের পুঁথিখানি অতি প্রাচীন, ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত। তাহা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :—

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ[১] মহারাজা
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।[২]
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এখানা।
ফুলিয়া[৩] বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্র বাড়য় সন্ততি॥

---

১. আমার বোধ হয় "বেদানুজ" পাঠ ঠিক নহে। "পূর্ব্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা" ইহাই আদত পাঠ, 'যে' কে 'বে' ভ্রম করিয়া গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে, বস্তুতঃ দনুজ মহারাজাই সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, বেদানুজ নামক কোন রাজার অস্তিত্ব জানা যায় না।

২. নৃসিংহ ওঝা আদিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইঁহার পরবর্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিরই কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়।

৩. নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর[১] ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥

---

১. মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরকৃত রাধার 'বারমাস্যা' নামক একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ১২৩ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের দোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষা জোড়া॥
গোবিন্দ, জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (?) মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিয়া প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে[১] যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥[২]

১. নিবড়ে, অতীত হইলে।

২. বড়গঙ্গা যশোহরে; "পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গার পার"—অন্নদামঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ নং পুঁথিতে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়—

"ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার॥
রাড়ার মধ্যে বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
যার ঠাঁই কিত্তিবাস পড়িলা আপনি॥"

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার।[১]
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুর স্থানে মেলানি[২] লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম[৩] রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥

'রাড়ার মধ্যে' অর্থ রাঢ়ের মধ্যে ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাস "আচার্য্য চূড়ামণি" নামক অপর একজন অধ্যাপকের নিকটও পাঠ করিয়াছিলেন।

১. উগ্মাকার—তেজস্বী।
২. মেলানি—বিদায়।
৩. ভেট (উপহার) দিলাম, পাঠাইলাম।

গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিণে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আয়াসে॥[১]
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা[২] পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥[৩]
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥

১. আওয়াস, গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত,—"তার দেখ পদ্মাবতীর আওয়াস। সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ॥" —আলাওল।

২. খরা,—রৌদ্র, যথা,—খনা,—"জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা শস্যের ভার না সহে ধরা।"

৩. সানে—সঙ্কেত, 'সখীসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে',—রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা।

নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥[১]
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥

---

১. পাটের পাছড়া, পট্টবস্ত্র। 'পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—"বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া"—মা. চ. গা., ১০ শ্লোক।

"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়।
ধড়ার আঁচল লুটি পাএ পড়ি যায়॥" —শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের স্থজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥[১]

কৃত্তিবাস "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস"—এই ভাবে স্বীয় জন্মের তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র "পূর্ণ মাঘ মাস" অর্থ মাঘ সংক্রান্তি ধরিয়া, রবিবার শ্রীপঞ্চমী ও মাঘ সংক্রান্তি এই তিনের যোগে "১৪৩২ খৃ. ২৯শে মাঘ" প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা হইতে জ্যোতিষিক সূক্ষ্ম গণনা করিয়া "এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ" এই ছত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ১৩৬৫ (১৪৪৩ খৃ.) শকের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তারিখটি পরে সংশোধিত ১৩৩৭ শক (১৪১৫ খৃ.) বা ১৩২০ (১৩৯৮ খৃ.) কৃত্তিবাসের বিদ্যারম্ভ কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই দিন উত্তর গমন ("হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ") ও বিদ্যারম্ভ—উভয়ের পক্ষেই সুপ্রশস্ত।[২]

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের বিষয় এই যে, পাঠটি প্রকৃতপক্ষে "পূর্ণ মাঘ মাস" নহে—অপিচ উহা "পুণ্য মাঘ মাস" হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রথমতঃ "পূর্ণ মাঘ মাস" কথার একটা পরিষ্কার অর্থ হয় না। উহা যে কোন কালে "মাঘ সংক্রান্তি" বুঝাইয়াছে এরূপ কোন অভিধানে বলে না—এবং বঙ্গসাহিত্যে সেরূপ প্রয়োগও দুর্ল্লভ। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পুঁথিতে অনেক সময়েই "ণ্য" "র্ণ" মত লিখিত হইত। বিশেষতঃ, "পুণ্য মাঘ মাস" কথাটির পল্লীদেশে এরূপ প্রচলন আছে যে, এই কথাই কৃত্তিবাস ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তিভূমি এই ভাবে চূর্ণ হইয়া গেলে, আমাদের অপর কোন প্রমাণের উপর কৃত্তিবাসের জন্মের সময় গড়িয়া তুলিতে হইবে। উদ্ধৃত আত্মকথার সেরূপ প্রমাণ কি আছে দেখা যাউক। শ্রীযুক্ত এইচ. ষ্ট্যাপলটন সাহেব এবং আমি এতৎসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণটি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ৪র্থ খণ্ড।

ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় (Vol. II., No. 12, p. 448) সেই বাদানুবাদের কতক দেখিতে পাইবেন। ষ্ট্যাপলটন সাহেব বঙ্গীয় মুসলমান রাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি তাঁহাদের রাজত্বকালের যে সব তারিখ দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

আর একটি কথা, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের প্রসঙ্গে "সপ্তদ্বীপসার নবদ্বীপ" বটতলার রামায়ণের এই পাঠ দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, হয়ত এই ছত্রটি দ্বারা কবি চৈতন্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার ১৭নং এবং ১৩নং পুঁথিদ্বয়ের ক্রমান্বয়ে ১৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, বটতলার রামায়ণের ঐ ছত্রটি ঐ পুস্তকদ্বয়ে নাই, ভগীরথের প্রসঙ্গে নদীয়ার নামটি আছে মাত্র। উহাতে 'সপ্তদ্বীপ সার নবদ্বীপ' কথার উল্লেখ নাই। শা পুরের উল্লেখও তাহাতে নাই। ভাগলপুরের 'কাহাল' নামক গ্রামের নাম, ইন্দ্রানি ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে, নবদ্বীপের নাম পাইয়া পরবর্ত্তী পুঁথিলেখকেরা নিশ্চয়ই ভক্তি প্রদর্শন জন্য ঐরূপ যোজনা করিয়াছেন।

নৃসিংহ ওঝা বঙ্গদেশব্যাপী যে ঘোর "প্রমাদের" কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্বের ধ্বংস ও মুসলমান প্রভাবের অভ্যুদয় সূচিত করিতেছে। শমসুদ্দিন ফিরোজ শাহ্ হিন্দু-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ১৩০২ হইতে ১৩২২ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই সময় তুর্কী গাজি জাফর খাঁ— যিনি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরোধী থাকিয়া শেষে আমাদের ধর্ম্মের প্রতি এতদূর অনুকূল হইয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন— তিনি ২৪ পরগণা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন—সুতরাং এই অঞ্চলের ফুলিয়া গ্রামে নৃসিংহ ওঝা বাস করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা সম্ভবতঃ ১৩১০ খৃ. অব্দে পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। কৃত্তিবাস উৎসাহ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ ; বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, উৎসাহ বল্লালের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন সম্ভবতঃ ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎসাহের জন্মকাল ধরিলে তিন পুরুষের ১০০ বৎসর পরিকল্পনা পূর্ব্বক আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের জন্মকাল পাইতেছি। এদিকে ১৩০৭ শকে (১৪৮৫ খৃ.) লিখিত, ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃ. অব্দে) গঙ্গানন্দী, সদানন্দী, এবং মালাধারী মেল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গঙ্গানন্দ ও সদানন্দ কৃত্তিবাসের জ্ঞাতি-ভ্রাতা, কিন্তু

মালাধর তাঁহার আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। যদি কৃত্তিবাস বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের কেহ জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া মালাধরের নামে মেল প্রবর্ত্তিত হইত না, মালাধর ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্যশান্তিজনপ্রিয়ঃ।" এতাদৃশ ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মেল গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প—সেকালে কোন পরিবারের সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়ই এরূপভাবে উল্লঙ্ঘিত হইতেন না। সুতরাং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কেহ জীবিত ছিলেন না। বিশেষতঃ, ১৪৮৬ খৃ. অব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, তাঁহার বহু পূর্ব্বে অদ্বৈত ও শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের জন্মকাল ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে এবং নরহরি সম্ভবতঃ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে তাহার উল্লেখ অবশ্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে থাকিত। জয়ানন্দ, অগ্রবর্ত্তী কবি স্বরূপ অপরাপর কবির সঙ্গে কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় কোন বিবরণেও ফুলিয়ার কবির কোন নাম নাই। সুতরাং এদিক হইতেও মনে হয় কৃত্তিবাস বহু পূর্ব্বে ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির ভণিতায় লিখিত আছে, তিনি অরণ্যকাণ্ড লেখার সময়ই রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণে মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস যে রাজ-সভার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হিন্দুরাজার। রাজার সমস্ত কর্ম্মচারী ও মন্ত্রী হিন্দু, রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবি "চন্দনের ছড়া" দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি গৌড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট। "গৌড়েশ্বর" উপাধি শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতা বা স্তাবক-কৃত প্রশংসাবাদসূচক নহে। "নয় দেউড়ী" পার হইয়া, সুবর্ণ-যষ্টি-ধারী রাজদূত তাঁহাকে রাজ-সভায় উপস্থিত করাইল, তথায় দ্বারী উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার আগমন জ্ঞাপন করিল ; কৃত্তিবাসকে এত্তেলা দিয়া রাজ-দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সচিবগণ কবিকে জানাইয়াছিলেন, একমাত্র গৌড়েশ্বর যাঁহাকে আদর করিবেন, তাঁহারই গুণগাথা

সমস্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে। রাজার বহু সচিব, সভাপতি ও ধর্ম্মাধিকারগণের বর্ণনা ও "সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে" প্রভৃতি ছত্র পড়িয়া মনে হয়, তিনি সাধারণ জমিদার ছিলেন না, অপিচ এই সভায় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, এই সভা মুসলমান প্রভাব বর্জ্জিত ছিল না ; মুসলমান বিজয়ের পরে একমাত্র রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কিংবা তৎসন্নিহিত কোন কাল কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ ধরিয়া লইলে কবি এই কালের মধ্যে কোন সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেদিক হইতেই আলোচনা করা যায়, কৃত্তিবাসের সময় আমাদের আনুমানিক কাল হইতে দূরবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।[১] এই আত্মবিবরণে * "দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার" * এবং গৌড়েশ্বরকে "মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ দৃষ্টেও আমাদের মনে হয়—কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন।

কৃত্তিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন, সে দিন নগরীতে 'ধন্য ধন্য' শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই ধন্যবাদের প্রতিধ্বনি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত্ত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ উৎসাহ যেরূপ আত্মমর্য্যাদা, তেজস্বিতা এবং বৈরাগ্যের সঙ্গে রাজকীয় "স্বর্ণগাভী" দান উপেক্ষা করিয়াছিলেন কৃত্তিবাসও সেইভাবে গৌড়েশ্বরের দান প্রতিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি গৌরব চান, পার্থিব অর্থ নগণ্য, "আমার রচনা অনিন্দ্য এই শুধু শুনিতে চাই।" সে কথা গৌড়েশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রতি গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে ; তৎসম্বন্ধে মৎ-সম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃত্তিবাস মুখটি বংশের অনেক প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ বা গৌড়েশ্বরের প্রসাদ-চিহ্ন ঘোটক এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি লাভ করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, কৃত্তিবাস তাহিরপুরের জমিদার কংস-নারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কংস-নারায়ণের শেষে যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর পরের লোক বলিয়াই অনুমান হয়। কৃত্তিবাস-বর্ণিত কয়েকটি রাজসভাসদের সঙ্গে কংস-নারায়ণের আত্মীয় কয়েক জনের নামের ঐক্য দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। এই পুস্তকের পূর্ব্ব এক সংস্করণে আমরা এই নামের ঐক্য দৃষ্টে ভ্রমে পড়িয়াছিলাম,—কেদার খাঁকে 'কেশব খাঁ', শ্রীবৎসকে 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি ভাবে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াও কৃত্তিবাসকে হুসেন শাহের সমকালবর্ত্তী করিতে হয়—সুতরাং এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

হইয়াছিলেন ; কেহ বা মার্কণ্ড ও ব্যাসের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও ঋষিতুল্য চরিত্রবান্ ছিলেন। কেহ বা সহস্রসংখ্যক অনুচর পরিবৃত হইয়া অমাত্য বন্ধুদের সঙ্গে সৌভাগ্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে আসীন ছিলেন। যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ কবি অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ স্বয়ং পড়িয়া দেখিবেন। কিন্তু আমরা বলিব, কৃত্তিবাসই এই মুখটি বংশের মুকুটমণি ছিলেন ; তিনি যাঁহাদের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উল্লেখের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ; তাঁহারা তাঁহার অমৃত স্পর্শে অমর হইয়াছেন, নতুবা এই পাঁচশত বৎসর পরে কে তাঁহাদিগকে চিনিত? এমন কি যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চগৌড়-ব্যাপক অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া কবি রাজকীয় অনুগ্রহে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস তাঁহার সভায় পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা এত আগ্রহের সহিত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে চাহিতেছি ; এবং তিনি যখন কবিকে দান দিতে চাহিলেন, কবি সগর্ব্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই সময় পঞ্চগৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কবির মস্তকশোভী বাণীপ্রদত্ত নির্ম্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্য কেদার খাঁ—যিনি কবির শিরে চন্দনের ছড়া ঢালিয়া বাণীর বরপুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া সত্যই হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধন্য যিনি কবিকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ হিত-সাধন করিয়াছিলেন।"

(খ) অনন্ত রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে 'অনন্ত রামায়ণ' খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন ; ইহা বক্কলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণশীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্দ্ধারণের উপায় নাই ; বক্কলে লিখিত ও "দেখিতে অতি প্রাচীন" ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান বড় নিরাপদ নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফঃস্বলের ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্ত পল্লীর প্রচলিত ভাষা লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহায্যে আমরা তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে

লইয়া পৌছাইতে পারি। তবে অন্যান্য প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা-পরীক্ষা ভিন্ন, সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্ত রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; আমরা ইহা ন্যূন পক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান, কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুঁথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতগুলি শব্দ দৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিম্বা তৎ-সন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী; 'চ' স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে 'চরণ' স্থলে ছরণ, 'বচন' স্থলে 'বছন', 'চাস' (চাহিস) স্থলে 'ছায', প্রভৃতি রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য শব্দও শ্রীহট্ট প্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয়; তবে এ কথাও একবার মনে উদয় হয় যে কবি না হইয়া পুঁথিলেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন;—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না।[১] আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কি

১. সম্প্রতি পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই অনন্ত
আসামবাসী। ইনি 'অনন্ত কন্দলী' নামে আসামবাসিগণের নিকট পরিচিত। ইঁহার
রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে।
সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ইঁহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগের নিকট অনুরোধ
আসিয়াছে। কিন্তু যে যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামীভাষা
বঙ্গভাষা হইতে পৃথক ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহট্টে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক
ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্রীকরণনন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে কখনই কি বঙ্গসাহিত্য
হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে তাঁহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে কম
দুরূহ নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ
পাইলে আমরা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অতি অল্প দিন হইল
বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার
প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।

কবি অনন্তের অপর নাম রাম সরস্বতী; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমরা
অনন্ত কন্দলীকে এই পুস্তকে স্থান দিলেও আসামের গৌরবের দাবী করিতেছি না।
চট্টগ্রামের কবি পরমেশ্বরকে আমরা যেরূপে আত্মসাৎ করিয়াছি—অনন্তকেও সেইভাবে দাবী
করিব। তিনি যে ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমান্তের ভাষা; তিনি
আসামবাসী, কিন্তু বঙ্গভাষাভাষী, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে আসাম-প্রচলিত লিখিত ভাষার
সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় কবিদের ভাষায় তেমন কোন পার্থক্য নাই।

পশ্চিমোত্তর সীমান্তস্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।

অনন্ত রামায়ণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, শুধু কাব্যামোদী পাঠক দু'এক পৃষ্ঠা পাঠান্তেই ক্লান্ত হইয়া সুললিত বটতলার কৃত্তিবাসী আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, *"এই বুলি মকমকে কান্দে রঘু রাই।" * (রঘুরায় ইহা বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন) প্রভৃতিরূপ রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি স্মরণে পাঠক হাস্য না করিলেই রসের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। তবে বন্ধুর দুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরূপ আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের সুপ্রশস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপত্তিস্থল দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্টিক সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্য এ্যান্দ্রির মত লোক ক্ষিপ্তবৎ জীবন উৎসর্গ করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রাণান্ত উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি সুবিমল আত্মতৃপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুঁথি পাঠের উৎকট ধৈর্য্যেরও তদ্রূপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোৎসর্গ না করিতেছে এমন নয়।

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া স্বাক্ষর (ভণিতা) দেওয়ার সময় নিজেকে "মূর্খ"—"মহামূঢ়" প্রভৃতিরূপে বর্ণনা দ্বারা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে আসামের ধর্ম্ম-নেতা শঙ্করের কথাও ভণিতার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়,—যথা * "জয় জয় শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকাম। কীর্ত্তনের ছন্দে বিরচিল গুণ নাম।" *—যে স্থলে অপরাপর পুঁথিতে 'ধুয়া' শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনন্ত "ঘোষা" শব্দ ও শ্রোতৃবর্গের স্থলে, 'সভাসদ্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

অনন্ত রামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি যতই কেন নিজের অবনতিসূচক ব্যাখ্যা দ্বারা মূর্খত্বের ভাণ করুন না, আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কোন অনর্থক বাগাড়ম্বরে তৎকৃত রামায়ণ স্ফীত হইয়া উঠে নাই, রূপবর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়া তুলেন নাই। অনুবাদ

মূলানুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল অপেক্ষা কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ; সংস্কৃতের বহ্বায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অনুবাদটি সরস রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাহাদুরী বটে। অনন্ত রামায়ণ জটিল দুরূহশব্দবহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ। ভাষার বন্ধুরতাহেতু সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে পুঁথিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্ত রামায়ণের অদ্ভুত ভাষাময়ী কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোমার কহিবে সুলক্ষণি॥ জনকনন্দিনি মঞি নাম মোর সীতা। দশরথ-পুত্র শ্রীরামবিবাহিতা॥ পিতৃবাক্য শুনি রাম বনে আসিলন্ত। লক্ষ্মণে সহিতে মৃগ মারিবে গৈচন্ত॥ আসি লভ ফুল জলো পূজিবা চরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োক মহাজন॥ উদবিগ্ন মনে সিতা বোলে খর করি। তপসি নহিকো মঁয়ি জানিবা সুন্দরি॥ জগত রাবণ জাক শুনি আছ কর্ণে। যাহার সদৃষ বড়া নাহি তৃভুবনে॥ হেনয়ো রাবণ আজি ভৈলোঁ তব পাশ। রামক তেজিয়া বান্ধে কর মোতে আশ॥ যত পাটেশ্বরী মোর সব তোর দাসী। জোহ খোজ সেহি দিবো থাকিবে উপাসি॥ মানুষ রামকে বান্ধে দূরে পরিহর। মঁঞি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর॥ হেন সুনি ক্রোধে সিতা বলিলন্ত বাণি। দূর গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি॥ নিকোঁট গোটক তোর এত মান সায়। ছুকর ডাকুলি ছুঁয়া গঙ্গা স্নানে যায়॥ রাঘবয় ভার্য্যাতে তোঁহোর ভৈল মন। তিথাল খান্তাত জিহ্বা ঘষস দুর্যন॥ হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ॥ আনো বহুতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেন্থ জুআই॥ আরণ্যকাণ্ড।

কবি যখন নিজেই বলিতেছেন, রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদিত হইল, তখন উদ্ধৃত অংশে*"তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াচ সম্পদ্যতে দিবি॥ নিকম্পপত্রা স্তরবো নদাশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।"* প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজঃপুঞ্জ কথাগুলি না পাইয়া আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই,—*"কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি" ও "জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরম্" * প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য ও শব্দঝঙ্কারচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে। কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাল্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন। অনন্ত রামায়ণ, পরাগলী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের চক্ষে ধন্য। এই সকল কবিই বাঙ্গালা ভাষায় গঠন করিয়াছেন। কৃষকগণের প্রাকৃতকে সংস্কৃত শব্দের সৌন্দর্য্যে

মণ্ডিত করিবার প্রথম চেষ্টা ইঁহারাই করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার দৈন্য আমাদের চক্ষে প্রবল ভাষানুরাগের ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ইঁহারা বন্ধুর ক্ষেত্রকে হলকর্ষণে সমতল করিয়াছিলেন, এজন্যই আজ এই ক্ষেত্র নবশস্প ও পুষ্পে হরিৎপ্রভা-মণ্ডিত হইয়াছে।

(গ) অনুবাদশাখা

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরণনন্দী

৪৫০ শত বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, আর ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন; মধ্যবর্ত্তী দেড়শত বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, এই বিশ্বাসে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয়, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যকরূপে প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বহুসংখ্যক অনুবাদ-রচকগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য মহাভারতের অংশরচকগণের নামোল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। অনুমান ও কল্পনার দূরবীক্ষণযোগে এই সকল কবি-নক্ষত্রগণ এ সময় হইতে কত দূরে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এস্থলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব না।

মহাভারতের অনুবাদ-রচকগণ।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হুসেন শাহের সময় লিখিত হয়, সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন;—*"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান।" বে.গ. পুঁথি, ৮৮ পত্র। * সুতরাং কবীন্দ্র-রচিত মহাভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্র-রচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশী

বিবধ অনুবাদের সাদৃশ্য।

মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত'-অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়-রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতানুবাদক কবি কে? কোন আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ বিষয়ের খাঁটি সত্য অবধারণের দ্বিতীয় পন্থা নাই; তবে আর একটি অনুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়,—মাগধ ভাটগণ প্রাচীনকাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন। এখন শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-রচিত। ইহার ঐতিহাসিক কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষরযুক্ত দুই চারিখানা সঞ্জয়-ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পর কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র-রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার অনেক বেশী; সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয়-রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়; যযাতি ও

সঞ্জয়-কৃত মহাভারত।

দেবযানির মিলন-বর্ণনা আমরা উভয় কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিব :—

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবিএ॥"

—সঞ্জয়, বে. গ., ১১ পত্র।[১]

"একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা।
ঋতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা॥
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল॥
সানন্দিত বন দেখি, মিলয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।
মলয় সুধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও,
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে॥
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি,
মৃগয়া কারণে সেই বনে।

---

১. বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের জন্য যে হস্তলিখিত সঞ্জয়ের পুঁথি খরিদ করা হইয়াছে তাহার শেষ পত্র এইরূপ :—

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক, শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃর ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নপত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীস্থলগ্রাম লেখকের নিজগ্রাম।"

ভ্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পাএ,
কন্যা সব দেখি বিদ্যমানে ॥
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
জিনি রূপে রম্ভা উর্ব্বশী।
অধরে বাঁধুলি জ্যোতি, দশন মুকুতা পাতি,
বদন জলয়ে যেন শশী ॥
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে,
ভ্রূযুগে কাম ধনু ধারা।
চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি;
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা ॥
শয়ন করিয়া আছে, রতিকাম অভিলাষে,
বিচিত্র প্যাতিয়া নানা ফুল।
শর্ম্মিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও
কোন সখী যোগায় তাম্বূল ॥"

—কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ব্ব ৪ পত্রে, অনুশাসন পর্ব্ব ৩ পত্রে, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ৩ পত্রে ও সৌপ্তিক' পর্ব্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্ল্লভ। আমি একখানি মাত্র স্বর্গীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রদাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয়-ভারতের অন্তর্বর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধ পর্ব্বটি সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথ কবি দ্রোণপর্ব্ব সংলগ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য-বিন্যাস উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট,

ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী ; কিন্তু সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণরাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত 'তালের বড়ার' ন্যায় নামমাত্র তালের কীৰ্ত্তিই ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন পুঁথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়-কৃত' মহাভারত। নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের অবস্থাও এইরূপ।

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল কেন? কবি ষষ্ঠীবরের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, এবং রাজচন্দ্র দাসের উজ্জ্বল পংক্তি-নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ হয় ইহা প্রাচীনতম কীর্তি, এই জন্য।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে! মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোকহিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, প্রতিপত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়[১] ; * "অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল।" (বে. গ. পুঁথি, ৪৬২ পত্র) * প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয় মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন।

কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না।

এই সঞ্জয় কে? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই। একবার ভাবিয়াছিলাম বিদুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্যপ্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ-বর্ণনা করিতেছেন, এ কথা মহাভারত মাত্রেই থাকিবে। এই সঞ্জয় কি সেই সঞ্জয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয়-কবি নিজেই সতর্ক হইয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন :—

সঞ্জয়ের পরিচয়।

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥"
—বে. গ. পুঁথি, ৫৭৭ পত্র।

১. বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পুঁথির ১৫৯, ১৭০, ১৮২, ৪৪৬, ৫০২, ৫০৫, ৫২৫ প্রভৃতি পত্র দেখুন।

"সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয় ॥" ৫৮৭ পত্র।

"সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা শুনি,
শুনিলে আপদ হৈলে তরি।" ৫৩৬ পৃ.

"প্রথম দিনের রণ ভীষ্মপর্ব্বে পোঁথা।
সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা ॥" ২৩৩ পৃ.।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ; তাঁহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই দু'টি ছত্র পাওয়া যায়,— * "ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম ॥" ৪৩৬ পত্র। * যে বংশে শ্রীহর্ষ, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব-সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন? অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ বংশীয় এক ঘর বৈদ্য এখনও বিক্রমপুরে বিদ্যমান। ইনি হয়ত সেই কুলই উজ্জল করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ উক্তি কোথাও নাই। কেহ বলিতেছেন, সঞ্জয় শ্রীহট্ট দেশের ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সঞ্জয়ের কবিত্ব।

সঞ্জয়কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য সুলভ নহে। গ্রাম্য-ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর, তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিবার ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষ্ণু পাঠকেরই থাকিতে পারে; কিন্তু সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে পাঠক কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন; গ্রাম্য সরল সৌন্দর্য্যে অনুবাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে। অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের ক্রোধ ও অপমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনার প্রখরতার পরিচয় দিতেছে। আমরা নিম্নে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রৌপদীর অপমান

রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল ধাই,
সভাতে আনিল একেশ্বরী।

একবস্ত্র রজস্বলা, দ্রুপদ-নন্দিনী-বালা,
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি ॥
মন্দ বোলে সভাজন, ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ,
উচিত না বোলে কোন জনা।
কাঁদয়ে সুন্দরী রামা, রূপ গুণে অনুপমা,
নয়নে বহয়ে জলকণা ॥
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কোন গতি
উত্তর না দেও সভাজন।
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি,
অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ ॥

তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর।
বজ্রসম গদা হস্তে কম্পে থর থর ॥
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা।
কুরুবল মারি আজি আঁজি যমে কঁরো পূজা ॥
কোথায় আছরে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে।
কোন ধর্ম্ম সেবি রাজ্য পাইল দুর্য্যোধনে ॥
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেরি।
কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্রা করয়ে রজস্বলা।
কোন অধর্ম্মে সভাতে কাঁদয়ে সুন্দরী বালা ॥
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ।
অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জ্জুন ॥
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর।
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির ॥
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাতৃ সব।
আপন অধর্ম্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম।
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥

—সঞ্জয়, বে. গ. পুঁথি, ১১৫ পত্র।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন

তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সবাইরে লাগিল পুছিতে॥
কে আজি অর্জ্জুনে দেখাইতে পারে।
রত্নের শকট ভরি দিনু আজি তারে॥
বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত।
যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥
লেজ কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ।
তাক দেই অর্জ্জুনের যে দেখায় মোত॥
ছত্র হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণা।
তাক দিমু অর্জ্জুনক দেখায় যেই জনা॥
শ্যাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিতা।
একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা॥
তাক দেই যে লোকে দেখায় অর্জ্জুন।
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে সুবর্ণ॥
সবৎসা তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ।
তাক দেহো যে আমারে দেখায় অর্জ্জুন॥
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত গ্রাম একশত।
তাক দেহো যেই অর্জ্জুন দেখাএ মোত॥
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান।
তাক দেই অর্জ্জুন দেখাএ আগুয়ান॥
ছয় শত হস্তি যে সুবর্ণ বিভূষিত।
সাগর তীরেতে জন্ম বীর্য্যে সুসারিত॥
চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুরচিত।
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত॥
এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুঞ্জিতে।
মগধের এক শত দাসী দেই তাতে।"[১]

১. এই অংশ পড়িয়া একিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগামেমননের চেষ্টা মনে পড়ে—

"Ten weighty talents of the purest gold.
And twice ten vases of refulgent mould ;
Seven sacred tripods whose unsullied frame.

শল্যের উত্তর

"কোপ বাড়িবার শল্য বলে আর বার।
ফুটিলে অর্জ্জুন বাণ না গর্জ্জিবে আর॥
সুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে।
অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে॥
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিলে ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতূহলে॥
সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দারুণ।
রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জ্জুন॥
চোঁকা ধার ত্রিশূলেতে ঘষ কেন গাও।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহর বোলাও॥
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থূল॥
সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল॥
সূতপুত্র হইয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে।
মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে জেনে॥
গর্ত্তের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়া।
সিংহকে ডাকহ তুমি শৃগাল হইয়া॥
সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক।
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর।
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্ব্বর॥
সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন।
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জ্জন॥"

—সঞ্জয়, বে. গ. পুঁথি, ৪৭৭ পত্র।

**Yet knows no office nor has felt the flame.
Twelve steeds unmatched in fleetness and a force,
And still victorious in the dusty course;
Seven lovely captives of the Sesbian line.
Skilled in each art, unmatched in form divine.
All these, to buy his friendship shall be paid". etc.
—Iliad, Book IX (Pope's Translation.)**

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী

১৪৯৩ খৃ. অব্দ হইতে ১৫১৯ খৃ. অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুসেন শাহ্ গৌড়দেশ শাসন করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, হুসেন শাহ্ প্রথমে স্থবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী-খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অমনোযোগী হওয়াতে স্থবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন শাহ্ উচ্চবংশজাত ছিলেন, তিনি রাজসরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৩ খৃ. অব্দে সম্রাট্ মুজাফর শাহ্ নিহত হইলে, গৌড়ের সম্রাট্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিতভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থকার সেই সময়ের লোক, তিনি কল্পনা হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং ইতিহাস আলোচনায় এ কথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়।[১]

সম্রাট্ হুসেন শাহ।

যদিও প্রথমতঃ হুসেন শাহ্ উড়িষ্যার দেবদেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন[২], তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এ কথা অনেকটা বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন শাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট্ বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসিবল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেন শাহ্ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী মোহরের ন্যায় হুসেনী মোহরও লোকপ্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান্। রাজকৃষ্ণবাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"হুসেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন,

(১) "It is however, certain, that on his first arrival in Bengal, he was for some time in a very humble position."—Stewart History of Bengal.

২. "যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে॥"—চৈ. ভা. অন্ত্য খণ্ড।

এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় বা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যের ও তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল।"

হুসেন শাহ্ বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন; যে সভায় রূপ সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ্ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে হুসেন শাহের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন শাহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—
* "শ্রীযুক্ত হুসন, জগত ভূষণ, সেহ এ রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভনে যশরাজ খানে।"[১] * পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্ব্বে পত্রে পত্রে হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়।

পরাগল খাঁ।

এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজের সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার—ভাবী সম্রাট্ নসরৎ শাহ্, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ।

ফণী নদীর (আধুনিক ফেণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন 'পরাগলপুর' এখনও বর্ত্তমান, 'পরাগলী দীঘি' অতি বৃহৎ; এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোকস্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত কীটদংষ্ট্রাবিদ্ধ লূতাতন্তুজড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত-স্মৃতির উদ্ধার করিয়াছে[২]; সে পুঁথিখানি—

---

১. সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃ.।

২. কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুঁথি ক্রয় করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি, তাহার একখানি ২০০, আর একখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন।

'পরাগলী ভারত'

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত

তাহার ভূমিকা এইরূপ :—

"নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি।"

—কবীন্দ্র. বে. গ. পুঁথি, ১ পত্র।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছ্বলিত কৃতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন ;—

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ
পুণ্যকীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান।" বে. গ. পুঁথি, ৮৮ পত্র॥

কোন কোন স্থলে * "শ্রীযুত পরাগল পদ্মিনী-ভাস্কর।"* এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়।

পরাগলী ভারত। পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তকখানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক ; শুনিয়াছি পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক ; ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন

"তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপ ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী॥
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী॥
দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরিন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলু অনুপাম॥
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল।
সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল॥
সত্য কহ আহ্মাতে[১] কপট পরিহরি।
কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী॥
দুই উরু গুরু তোর অতি সুললিত।
নাভী গভীর তোমার বাক্য সুললিত॥
দশন ডালিম্ব বিজুলি নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ॥
কিবা গন্ধর্ব্বের তুহ্মি হয়সি বনিতা।
নাগকন্যা তুহ্মি কিবা নগরদেবতা॥
বিদ্যাধরী কিবা তুহ্মি কিন্নরী রোহিণী।
অনুসূয়া কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী।
তোমারূপ দেখি আহ্মি লইতে না পারি॥
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর।
সেইখানে দ্রৌপদীও দিলেন্ত উত্তর॥
আহ্মি দেবকন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী।
সহেজ সৈরন্ধী আহ্মি কেশকর্ম্ম করি॥

---

১. 'আমি' স্থানে 'আহ্মি' ও 'তুমি' স্থানে 'তুহ্মি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সমস্ত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কপিতে 'আমি', 'তুমি' রূপ পাইয়াছে।

মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল।
তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল ॥
তেকারণে আঁইলু হেথা বিরাট নগর।
সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর ॥
সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি ॥
নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে ॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ॥
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব ॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেনমত দেখি আহ্মি তোহ্মারে বারণ ॥"[১]

—কবীন্দ্র, বে. গ. পুঁথি, ৫৭ পত্র।

শ্রীহরির রূপ বর্ণন

"পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন ॥
মেঘের বিদ্যুৎ তুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এ চারি করেত ॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ ॥"—৪৪ পত্র।

---

১. কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ-গ্রন্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। নানাভাবে উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আসিবার অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে, মূল ব্যাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।—

সুদেষ্ণোবাচ

"মুদ্ধিন্ ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥

ভীষ্ম পৰ্ব্ব—যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ

"দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেতে লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে॥
কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন।
বিদ্যুৎ সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন॥
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী-ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্ত কথা সুনন্ত লস্কর॥"—১০৫ পত্র।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট্ হুসেন শাহ্ সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর গৌরব বর্ণনা করিয়া কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য য ইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং স সন্নমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা॥
অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষান্ বধায়ৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে শুভ্রে অহিতং স্যাত্তথা মম॥
যথা চ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসং তব শুচিস্মিতে॥"

"তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল ॥" বে. গ. পুঁথি, ৮৮ পত্র।

ছুটি খাঁও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন; এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনীর লতার ন্যায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি কিরূপে করিতে হয়, বিশেষরূপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদসেবা করিয়াছেন। আমরা 'সাহিত্য' পত্রিকায়[১] যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলেও উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নসরত শাহ তাত[২] অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥
তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে ॥
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাঁক কি কহিব অতি ॥
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত ॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র-গমন ॥

১. সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

২. নসরৎ শাহ, চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পিতা অপেক্ষা তিনি সে দেশে বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি, পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। নসরৎ শাহ, বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতেও নসরৎ শাহের উল্লেখ দেখিতে পাই—"সে যে নসিরা শাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে।" সাধনা, শ্রাবণ, (১৩০০, পৃ. ২১২)।

চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সন্ধান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খাঁন॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি অভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥
আপনে নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরণ নন্দী কহিলেন পয়ার রচিয়া॥

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সেগুলি ছুটি খাঁর পদে পুষ্পবিল্বদলে অর্চ্চনা। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, ইহা ঝুঁটা ফলের অঞ্জলি; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন—ত্রিপুরপাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ্য করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব। সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়, দ্বিতীয় চার্লসের নিকট একবার এক কবি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দীর কবিত্ব।

নন্দী কবির কবিত্ব ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুকপ্রদ হইয়াছে আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিতেছি। ভীম যুবনাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্য মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

"বহু ভক্ষ হও ভীম স্থূল কলেবর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর॥"

ভীমের উত্তর

"কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালন্ত সব খাইলা তুহ্মি।
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আহ্মি॥
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী॥
তুহ্মি নারীজিৎ না হও আহ্মি নারীজিৎ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত॥

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোৎলার রাগ মনে পড়ে। কাশীদাস এস্থল মসৃণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণত্ব হ্রাস হইয়াছে।

একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা পাইয়াছি; "কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী।"

এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকরণ নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানারূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়া ভিন্ন অনেক সময়েই পথ আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না।

জৈমিনি-ভারত।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্ত্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় সকলেই জৈমিনি-সংহিতা[১] দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছিলেন। ব্যাসের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে এই পর্য্যন্ত। বঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহাদের অগ্রণী; তাঁহারই শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধন্বার সভায় বৌদ্ধকুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন। মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভব-সাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসকৃত এই সেতু প্রায় ভবসমুদ্রের ন্যায় দুর্গম; তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগকে ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে,—

"জৈমিনি-ভারত স্তুত তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধে কুমারসম্ভবে।"

(গ) অনুবাদ-শাখা—মালাধর বসু

মালাধর বসু।

কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি' প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ-তীর্থে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু

১. জৈমিনি-ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার ঐতিহাসিকগণের মতে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্ব্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান শেষ না হইলে, এই মত অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক।[১] বসু-পরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন; মালাধর বসুর পৌত্র বসু রামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বর শমসুদ্দিন ইউসুফ্ শাহ্ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। 'পুরন্দর খাঁ', 'গুণরাজ খাঁ' এই সমস্ত রাজ-দত্ত খেতাব। আমরা একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে 'কবিত্ব-ভূষণ' উপাধিবিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই 'কবিত্বভূষণ' রাজদত্ত উপাধি অথবা পুঁথিলেখকের প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না; যাহা হউক, 'গুণরাজ' উপাধি সে সময় দেশে প্রচলিত ছিল; আমরা ষষ্ঠীবর কবিকেও 'গুণরাজ' উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। অধ্যাপকগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকেও 'কমলাক্ষ' নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ের সম্রাট্ নিগুর্ণকে 'গুণরাজ' উপাধি দেন নাই; বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজেকে 'নিগুর্ণ' 'অধম' প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন।

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন ও সাতবৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাধান করেন।[২] এই

---

১. মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভণিতার অংশটি এইরূপ:—"শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সেহ এ রস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান।" প্রাচীন তাম্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পুরন্দর এবং যশোরাজ খান যে এক ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইতেছে না; অথচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগে ইন্দ্রতুল্য, এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞারূপে গণ্য না করিলেও চলে। যাহা হউক, সামান্য একটি পদের সন্দেহাত্মক ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মালাধর বসু আদিশূর-আনীত দশরথ বসুবংশীয়। বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। দশরথবংশীয় কৃষ্ণ বসু (বল্লালসেনের সমসাময়িক), ২। ভবনাথ, ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। শ্রীপতি, ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)। মালাধরের উর্দ্ধতন ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খাঁ অধস্তন পঞ্চম স্থানীয়।

২. "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গোবিন্দবিজয়' নাম দৃষ্ট হয়; শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু', বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত টীকা টিপ্পনীর সহিত বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংস্রব না আছে এমন নহে; নিম্নে উদাহরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূল ও অনুবাদ।

মূল হইতে অনুবাদিত :—

১। "কোন সময় বনেতে প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যূষে হরি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

কতিপয় বালক বংশী বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ভক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকেরা কোকিল-সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক-সঙ্গে উপবেশন ও ময়ূর-সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।"—শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়[১] :—

"প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥

১. মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় ২০০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্তী অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

একত্র হইল সব যমুনার তীরে।
নানামতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে ॥
কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ॥
কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে ॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকান্থাই ॥
কথা বা স্থগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি।
কত হৃদে মস্তকে শ্রবণে কেশে পরি ॥"

মূল হইতে অনুবাদিত :—

২। "কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় ক্বাথ-নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অথবা গোপী গোধুম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক্ক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।" ১০ স্কন্ধ, ২৯ অ.।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—

"সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া ॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে ॥

ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ্ন জন॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবারে যায়।
তৈল দেহি কোহ্ন জন গুরুজন পায়॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে॥"

এই সকল অংশ আমরা বাছিয়া উঠাই নাই ; মূলের সঙ্গে ইহার মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত বহির্ভূত।

রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন ; চির-শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণহীনা সৌন্দর্য্য প্রতিমার আড়ালে পড়িয়া গেলেন ; সদ্যঃচ্যুত-অনাঘ্রাত মালতী-পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল। চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইল দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে, ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন ; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য তাঁহারই চরণ কমলের সুরভিমাখা। রাই কানু নাম বঙ্গসাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার শিরে বজ্রাঘাত করা হয়! এই দেশে সেই সব সঙ্গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই। যদিও রাধার নাম ভাগবতে নাই, তথাপি কোন কোন পুরাণে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ছাড়াও) রাধার উল্লেখ আছে। রাধা-তন্ত্র, রাধা-চক্র প্রভৃতি সংজ্ঞা ও তদ্বিষয়ক প্রাচীন পুঁথি দুর্লভ নহে। কাহারও কাহারও মতে সৌরমণ্ডলীর আবর্ত্তন হইতে রাধাকৃষ্ণলীলার পরিকল্পনা হইয়াছে ;—সূর্য্যকে লইয়া গ্রহ উপগ্রহগণ আকাশ-পথে যে ভাবে পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই 'সৌরযাত্রা' এবং পরিশেষে 'কৃষ্ণযাত্রা' কল্পিত হইয়াছে। সূর্য্য-দেব রাধা, অনুরাধা, চিত্রা, বিশাখা প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই মিলনই শেষে "রাস" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অর্থবাচক হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু অর্থ সূর্য্য। কালক্রমে সূর্য্যের পূজা ও তৎসম্বন্ধীয় লীলা বিষ্ণুতে (কৃষ্ণে)

আরোপ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণ এই সূত্রে রাধা, অনুরাধা, চিত্রা, বিশাখা প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রাকৃত পৈঙ্গল প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ রাধা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত না হইলেও লৌকিক সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আমরা বঙ্গসাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার নানারূপ গ্রাম্য-আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইতেছি।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু যেন নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেবশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকাংশে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলী মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না: চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন -

"কি ছার চকোর চাঁদ—তুহুঁ সম নহে।"

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার-খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্ত্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুর-চূড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন—

"কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে গোপনারী।"

এবং "কাঁধে কেরয়াল করি হাসয়ে মুরারি॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন এবং তজ্জন্য যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ্দ এইরূপ:—

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নুপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥

কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখী বলে॥
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহ্ন জন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ॥
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।
কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান॥'

—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন— * "প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।" * রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজেকে বড় অপমানিত মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া,—

"কানুবলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই॥"

—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

এইখানে প্রাণের খেলা,—মাধুর্য্যের এক নব পন্থা যাহা পদকর্ত্তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্তসংযোগ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। এই দানলীলা ও পার খণ্ড মৌলিক সামগ্রী, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষার কোন্ উৎস হইতে ইহা প্রবহমান হইয়া বঙ্গসাহিত্যে অমৃত-স্রোতঃ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহাদের অন্যতম।

৩। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা

(ক)—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি (খ)—'শিবের ছড়া' (গ)—চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা দেবী (ঘ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়—ইহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত। ইহাদের ছড়া-পাঁচালী মুখস্থ করা এক সময় গৃহস্থবধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইহারা কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সব দেবতার ছড়া-পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়া কাল সহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে অনবদ্য কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এই সব ছড়া-পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।

লৌকিক ধর্ম্মের দেবতা।

ছড়া ও পাঁচালী।

লৌকিক-দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগের রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা, কিম্বা পিতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ্‌নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উন্নীত হইলেন; একজনের নাম হইল, মঙ্গলচণ্ডী; আর একজনের নাম হইল, সত্যনারায়ণ। এই চণ্ডী শুধু বিপদ্‌ত্রাণকারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু মূর্ত্তি ধারণ

লৌকিক দেবতা-পূজার উৎপত্তি।

করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বরাভয়দাত্রী, সঙ্কটবারিণী। সত্যনারায়ণ বালগোপাল কিম্বা কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ দেবতা; ইনি অর্থসম্পদ্দাতা, কুবের-স্থানীয়।

সাহিত্যে ব্যাঘ্র ও সর্প।

বঙ্গদেশ যখন নীল সমুদ্রগর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং আর্য্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। সিংহবাহুর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রযুদ্ধ চণ্ডীকাব্য ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে পাইয়াছি, কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের সঙ্গে একটি ভীষণ ব্যাঘ্রযুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই সকল উপাখ্যান-বর্ণিত ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের আলাপ-ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক কল্পনার কথা নহে; সেই প্রতিযোগিতায় অসি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল এবং অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। সভ্যতার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গুলির নিকট অসি হটিয়াছে; হায়, কবে প্রীতির নিকট অসি, গুলি, শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার করিবে!

সুন্দরবনের জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রাচার্য্যদের সঙ্গে বিরোধ করাও মনুষ্যের পক্ষে বরং সহজ, অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে; কিন্তু কেউটার দন্ত অলক্ষ্যে দংশন করে। বিশেষতঃ, ব্যাঘ্র শুধু বনবাসী শত্রু; সর্প গৃহস্থের গৃহ-শত্রু; কোন ছিদ্র হইতে বিষ উদ্গীরণ করিবে, নিশ্চয়তা নাই; এইজন্য ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণ রায়' অপেক্ষা সর্পের দেবতা 'মনসা-দেবী'র প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বৌদ্ধগণের হারিতীদেবীও স্কন্দপুরাণ এবং পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক-জ্বর-পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্য্যগণের পূজিত সিন্দুরমণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণাল-তন্তু-সদৃশী, মার্জ্জনী-কলসোপেতা, শূর্পালঙ্কৃতমস্তকা শীতলাদেবী হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার পূজাপ্রচারার্থও কয়েকখানি নাতিবৃহৎ কাব্য বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

(খ) শিবের ছড়া

অধ্যায় ভাগে আমরা যে সকল দেবতার নাম করিলাম, তন্মধ্যে শিবঠাকুরের নামও উল্লিখিত দৃষ্ট হইবে। কিন্তু শিবঠাকুরও তাঁহার বেদোক্ত রুদ্রমূর্ত্তি ও পুরাণোক্ত সাম্য-সমাধি-মূর্ত্তি—উভয় ভাবই ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় কৃষকের নিকট কৃষাণ দেবতারূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা একবার উল্লেখ করিয়াছি। স্ত্রীলোকগণ ধান ভানিবার সময় এই শিবের ছড়াই গান করিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই শিবের ছড়ায় শিবঠাকুর ক্ষেতের মশা ও জোঁক তাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় শিব কৈলাস পর্ব্বতে সমাসীন হইয়া গৌরীর নিকট গ্রহতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। বামাচারীদের তন্ত্রে ইনি গৌরীর নিকট বশীকরণের উপায় বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং এরূপ কল্পতরুকে বঙ্গের কৃষাণগণ কেনই বা অব্যাহতি দিবে? তাহারা ইহাকে দিয়া নানা প্রকার ধান্য, তূলা, মূলা, কাপাস সকলই বুনাইয়া লইতেছে! বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ সময়ে ঠাকুর দেবতারা গ্রাম্য ছড়ায় কাস্তে হাতে হাঁটু গাড়িয়া ক্ষেতের কার্য্যে নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার পর পৌরাণিক যুগের প্রভাব তাঁহারা বেশসংস্কার করিয়া উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লিখিত হইবে। শূন্যপুরাণে আমরা শিবকে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছি, রামেশ্বরের কবিতায়ও তাঁহার সেই ভাব কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রামেশ্বর কোন প্রাচীন কবির রচনার এই অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন না করিয়া স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। আমরা সেই অংশ হইতে অল্প একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিক চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়াব ঝড়াউড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুতে যার নুড়ি॥
দল দূর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেসুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥
খর খর খুজিয়া খড়ের ভঙ্গে বাড়।
কুলি করি থাইল ধান্যের ধরে ঝাড়॥

কিতামুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট পট।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্দ্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥"

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত শূন্যপুরাণের[১] নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মিলাইয়া পাঠ করুন ঃ—

"জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিক্‌খার লাগি ভাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিন পাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্‌খাএ ভাত॥
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসচাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরি কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাঞি কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিষা চাষ কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হরেক গোঁসাঞি পঞ্চামর্তর আস॥

১. রামাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে শূন্যপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশিত পুস্তকের ভাষা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধম্ম পূজার বেলা॥
এতেক স্থবিধা হর মনেতে ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল॥
স্থনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাগিলেত এ তিন গোজাল॥
আস জোতি পাস জোতি আওদর বড় চিন্তা।
দুদিকে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিআ সাজাইল মই॥
তাবর দুভিতে ঢাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই স্থনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাঞি পিথিবী মঙ্গলিল।
জতগুলি ভূম পরভু সকলি চসিল॥"

'বাগ্দিনীর পালা' নামক যে অমার্জ্জিত প্রেমচিত্র পরবর্ত্তী শিবায়নসমূহে স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা স্থপ্রাচীন শিবের গানের অংশ বলিয়া মনে করি।

একটি স্থপ্রাচীন শিবের গানে আমরা এই পদগুলি পাইয়াছি :—

"ভাঙ খাইবে ধুত্‌রা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া।
পিরথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া॥
ভাঙ খাইবে ধুত্‌রা খাইবে খাইবে শতাবরি
দিবারাত্রি থাকবে ভুইন কুচনীরার বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
আপেক্ষা না মিট্‌বে তব কামিনীর সাঁত॥
শ্মশানে মশানে থাকবে মাখবে ভস্ম ছালি।
সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি॥
ভূত পেরেতের লগে একত্রে করবে বাস।
অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস॥
বলদের কান্ধে উঠবে পিন্‌বে বাঘের ছাল।
কুচনীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল॥"

একটি প্রাচীন গোরক্ষ-বিজয়ের গীতে আমরা শিবের এই বিবরণটি পাইয়াছি। শস্য-শ্যামলা উর্ব্বরা বঙ্গভূমির কৃষিকুলের দেবতাকে কৃষাণেরা যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল—তাহা এইরূপ। এই চিত্রে প্রদত্ত শিবের নৈতিক চরিত্র, কৃষিতত্ত্বের জ্ঞান এবং নেশা-খাওয়ার কাহিনী—সমস্তই কৃষক শ্রেণীর দেবতার যোগ্য। ইহাই প্রাচীন শিবের ছড়া। তথাপি এই রুচি-গর্হিত অমার্জ্জিত গানের মধ্যেও শিবের "আনন্দময়"ত্বের যে আভা পড়িয়াছে—ভোলানাথের সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতার যে আলেখ্য মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে দেব-ভাবের কতকটা ইঙ্গিত আছে। তাহাই পরবর্ত্তী শিবসাহিত্যে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

লৌকিক ধর্ম্মশাখা
(গ) চাঁদ সদাগর ও বেহুলা

মনসাদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসা দেবীর ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, 'মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল, কিন্তু এই উপর্য্যুপরি বিপদ্‌রাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাঁদ সদাগর ভ্রূক্ষেপহীন। পুত্রশোকোন্মত্তা সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীরগুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্তু সদাগরের বজ্রাদপি সুকঠিন পণ ভঙ্গ হয় নাই। মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল কিন্তু ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে, পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই। তাহার দুঃখবজ্রখিন্ন বীরোচিত উন্নত মস্তকে ক্ষাত্রতেজঃ আগ্নেয় লিপিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে; এ ধনুর্ভঙ্গ পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। চাঁদের নৌকা সমুদ্রবক্ষে ঝটিকা-তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত; বিপদের মূল মনসাদেবী। এই শত্রু তর্জ্জনী হেলন দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাঁদ এ বিপদেও হেঁতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই :—

চাঁদের চরিত্র।

"এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥

মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যত্মপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর॥" বিজয়গুপ্ত।

চাঁদ সমুদ্রে পড়িয়া লোণা জলে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইল। এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্ম ফুল ফেলাইয়া দিলেন; তাহাকে মারিতে পদ্মার ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না। চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রির ঈষৎ বিদ্যুতালোকে মুমূর্ষু অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম সংস্রব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় হাত ফিরাইল, লোণা জলে মরিতে ডুব দিল।

পদ্মাবতী নামের সংস্রব-ত্যাগ।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত। ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ গণ্ডুষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিলেন। * "বর্ব্বর ভাড়ায়ে খাও কাণি" * বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ অন্ন-ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

অনাহারে বিড়ম্বনা।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত চাঁদ শেষ পুত্র লখীন্দরকে লাভ করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাসরে মনসাদেবীর সর্প লখীন্দরকে দংশন করিল। বিবাহ-শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল।

লখীন্দরের মৃত্যুজনিত শোক।

কিন্তু পদ্মাপুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে পরাভবও চাঁদের ন্যায় বীরের উপযুক্ত। মনসাদেবী ইতিপূর্ব্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' জল হইতে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু চাঁদবীর লুব্ধ হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই। এই শাল্মলীতরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ চাঁদবেণে রোধ করিতে পারিল না; সনকার

চাঁদের পরাভব।

মর্ম্মভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে ; কিন্তু বেহুলা রমণী হইয়াও তাহারই মত এক জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছে ; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া স্থলকুম্ভীর ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জিহ্বা ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বগণবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে ; চাঁদ কোন্ প্রাণে এমন পুত্র-বধূকে বহুকৃচ্ছ্র-অর্জ্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে ?

এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন,—স্নেহে বশীভূত ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্মাপুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলিদানে নিযুক্ত, 'চেঙ্গমুড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। এ অঞ্জলি একদিকে যেমন বিষহরির নিকট গর্ব্বিত সদাগরের পরাজয় বলিয়া গণ্য, তেমনই অন্যদিকে ইহা পতিব্রতা সতী সাধ্বী পুত্রবধূর শিরে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি ; গুণশীলা পুত্রবধূকে চাঁদবেণে কষ্ট দিতে পারন নাই। মনসাদেবী যখন চাঁদ সদাগরের হাতে হেঁতালের লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্ডপে নামিতে সাহসী হন নাই, তখন বেহুলা বিনয় করিয়া শ্বশুরের হাত হইতে লাঠিগাছি ফেলিয়া দিলেন। বেহুলার সেই বিনয়-মধুর গঞ্জনা কোকিলকূজনের ন্যায় মিষ্ট।

বেহুলার জয়।

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥
একথা শুনিয়া হৈল চাঁদবেণের হাস।
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস॥
বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেন ফেল দূরে॥"

ক্ষেমানন্দ।

বেহুলা

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহুলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বেহুলা রূপে গুণে অতুল্যা ; তথাপি ভাগ্যদোষে বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামিহীনা হইল। স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি জালিয়া, নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়াছিল ; একটি একটি করিয়া কৌশল-ক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী

বেহুলা বাসর-গৃহে।

করিয়াছিল, কিন্তু বিধিলিপি নির্ম্মম, অখণ্ডনীয়। ঈষৎ নিদ্রাবশে বেহুলার চক্ষুপুট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কালসর্প এমন সময় লখীন্দরকে দংশন করিল, লখীন্দর ডাকিয়া বলিল,—

"জাগ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?"

কেতকাদাস।

স্বামীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসতী।

বেহুলার কালনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিত হইয়া যখন স্বামীকে খুঁজিতে হাত বাড়াইল, তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শবস্পর্শে শিহরিত হইয়া বেহুলা কাঁদিয়া উঠিল; সেই ক্রন্দনে শাশুড়ী সনকা ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে গালি দিয়া বলিল,—

"সনকা কাঁদিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিঁতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালী॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পা পড়িল ধূলি॥
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী।
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥"

ক্ষেমানন্দ।

নিরপরাধিনীর অপরাধ।

কিন্তু বেহুলা সে গালি শুনে নাই; স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, লজ্জিতা নববধূ লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইতেছিল। তারপর আর এক দৃশ্য। বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসিতেছে। বেহুলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী! যে শাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন, তিনি সাধিতেছেন,—

"সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥

কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্তে জিয়াইবে ॥"

কেতকাদাস

একখানি পদ্মাপুরাণে আছে, সনকা কাঁদিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণের বেহুলা ফিরিয়া ঘরে এস, আমি তোমার মুখ দেখিয়া লখীন্দরের শোক ভুলিব।"

তাহার ভ্রাতৃগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

"হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর।
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড় ॥
এই ক্ষণে চল বেহুলা মুক্ত সাহের বাড়ী।
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী ॥
শঙ্খ বদলে দিব স্থবর্ণের চূড়ি।
সিন্দূর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥"

বিজয়গুপ্ত।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন প্রদানপূর্বক তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে, আলিঙ্গনবদ্ধা লতিকা আর তাহার আশ্রয়-তরু ছাড়িবে না ; শব ক্রমে গলিত হইল,—

"দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায়ে বড় শোক।
ধরিয়া মড়ার গায় হানে এক জোঁক ॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায় ॥
* * * *
অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা স্থন্দরী ॥"

কেতকাদাস।

এই দুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া খাইতে আসিয়াছে, অপরদিকে,—

"পথের পথিক যত পথ বাইয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥

ত্রিজগৎমোহিনী কেন মড়া লৈয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥"

কেতকাদাস।

কত লোক তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে,—সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দূরের জোরে বেহুলা চলিতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে? একজন বৈদ্য অশিষ্ট প্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাঁহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহুলা দৈববরে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পটত্রয়ের জন্য করুণার অশ্রুবিন্দু রাখিয়া গেলেন। সুখে দুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্ব্বদা আরও প্রস্ফুট হইয়াছে। শবের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৈশ আঁধারে সতীলক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ আলো নিবু নিবু, এ সময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

বেহুলার সতীত্ব।

"যতেক শৃগাল, হয়ে এক পাল
একত্রে বেহুলারে ডাকে।
মড়া ফেলাইয়া, যাহ না ফিরিয়া
প্রাণ পাই তোর পাকে॥"

কেতকাদাস।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ শব তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্বামীর—ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন,—

"এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী,
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি,
মড়া নাকি প্রাণ পায়॥"

কিন্তু

"শৃগাল কথনে, বেহুলার মনে,
কিছু নাই অভিমান।"

কেতকাদাস।

আঁধারে ব্যাঘ্র গলিত শব খাইতে মুখ ব্যাদান করিল, বেহুলা বলিলেন ;—

"অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে।
আগেতে আমারে খাও, প্রভুরে খাইও পাছে ॥"

বিজয়গুপ্ত।

নৃত্যগীতে অনুরাগ পদ্মিনী রমণীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে। ছোটবেলা বেহুলা নাচিতে গাহিতে শিখিয়াছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা অমলা মুগ্ধ হইতেন। পুনরায় এই দুঃখের সময় হাস্যমুখে বেহুলা দেবসভায় নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতৃগণের জীবন পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘ দুঃখ-কথার অবসানে কবিগণ বেহুলার যে কৌতূহলদীপ্ত সুপ্রফুল্ল চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্যের মধ্যেও দুঃখমিশ্র একটু সকরুণ ভাব জড়িত আছে, সেই মলিন অথচ মধুর সৌন্দর্য্য আমাদিগের মর্ম্ম স্পর্শ করে। বেহুলা স্বামীকে লইয়া ডোম সাজিয়া পিত্রালয়ে গেলেন ; সেখানে রঙ্গচ্ছলে যে করুণ কান্না ও পুনর্মিলনের শোক-মন্দ আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সেই রঙ্গ ও কৌতুকখেলার মধ্যেও সাধ্বীর কষ্টসহিষ্ণু দৈন্য এবং পরিম্লান মাধুরীতে এক অপরূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

কৌতুকে করুণ রস।

কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। স্বামিবিয়োগের পর সাধ্বী হিন্দু-মহিলা উচ্ছ্বসিত অশ্রু নিরোধ করিয়াছেন কিন্তু ললাটের সিন্দূরবিন্দু মুছিয়া ফেলেন নাই, সতীত্বের প্রতিমা স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে ; এই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বেহুলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। প্রেম ও সৌন্দর্য্য রমণী-চরিত্রে শ্রেষ্ঠ ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ তদ্দ্বারা আদর্শ-রমণী সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রেমের অর্থ আত্মসমর্পণ ও স্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ চরিত্রমাহাত্ম্য, সেই স্থানেই আদর্শ সর্ব্বকালের উপযোগী হয় ; তদ্রূপ রমণী-চরিত্র সাহিত্যে বড় বিরল। বেহুলা-চরিত্র আঁকিতে কোন কবিগুরু বাল্মীকি লেখনী ধারণ করেন নাই। গ্রাম্য কবিগণ বংশদণ্ডাগ্রে, ব্লটিং কাগজের অভাব বালিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলট-কাগজের উপর বেহুলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন ; তথাপি উহা একটি আদর্শ সাধ্বীর চিত্র হইয়াছে। আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের সীমা নাই। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থে আত্মোৎসর্গ, উপবাস, ব্রতাদির

বেহুলা—ঘরের ছবি।

কঠোরতা ও স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ—এই নানাবিধ সদ্‌গুণের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেহুলার ন্যায় আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবিগণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাই। সাহিত্যদর্পণের সূত্র এরূপ উচ্চ রমণী-চরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে না এবং লেখা পড়ার হিসাবে নিতান্ত নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা শুনিয়া লিখিতে হইলে তাঁহার আর লেখা চলিত না। অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা। প্রকৃতি যেন স্বয়ং ইহাদের হাতে তুলিকা দিয়া তাঁহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ বাড়ী-ঘরের ছবি আঁকিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে বিশ্ব-চিত্রভাণ্ডারে এক অমূল্য আলেখ্য উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির পয়ার ও লাচাড়ীছন্দরূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি হীরককণা আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। সাহিত্যিক আবর্জ্জনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে উহারা জগতের আদর-দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় মূল্য লাভ করিবার সুবিধা পাইবে।[১]

(ঘ) কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি

মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাণা হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচনা করেন, কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামনিবাসী বিজয়গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

কাণা হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত।

“মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥

১. বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—
“স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম সংস্করণ, ১১৮ পৃ.।

গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তের গীত তাঁহার সময়ে একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি। সংপ্রতি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্ত্তৃক হরিদত্তের এই পুঁথিখানির উদ্ধার হইয়াছে। আমরা নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

পদ্মার সর্প সজ্জা

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥
কণক নাগে কৈল কণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥"

হরিদত্তের গীতি মনসাদেবীর মনঃপূত হয় নাই, বিজয়গুপ্তের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

পড়িয়া আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। হরিদত্তের গানে মিত্রাক্ষর ছিল না, তাহাতে কথার সঙ্গতি কিম্বা যতি প্রভৃতির কোনও আড়ম্বর ছিল না। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিজয়গুপ্ত-কৃত হরিদত্তের এই দোষারোপ পড়িয়া আমাদের মনে হয়, হরিদত্তের গীতিকা একটি পালা গান (ballad) ছিল, উহাতে সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও উহা যে পল্লীরসধারার নির্ঝর স্বরূপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে—যখন গৌড়দেশের উৎসব, সাহিত্য এবং আমোদ প্রমোদ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় সম্ভবতঃ হরিদত্ত তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের প্রভাব আমরা মনসাদেবীর কোন কোন হিন্দী কাব্যেও আবিষ্কার করিয়াছি। ভাগলপুরের এক প্রাচীন কবি "বাঙ্গাল ছন্দ" নাম দিয়া তন্নিম্নে যে কবিতাটি দিয়াছেন, তাহা হরিদত্তের একটি রচনার হিন্দী অনুবাদ।

বিজয়গুপ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া ভাসান-গান রচনায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল ; আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে গ্রন্থরচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুলভ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের অন্তর্গত আছে,—

"হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।
নাগরথে ছাড়ি দেবী গেল নিজ দেশ॥
স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে॥
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নান করি বিজয়গুপ্ত পূজিল মনসা॥
হরি নারায়ণে স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
যেইমতে পদ্মাবতী করিলে সম্বিধান।
সেইমতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ॥
ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।[১]
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥

১. প্রাচীন হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতেই এই শক দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত সংস্করণগুলির "ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক" ভুল। ষ্টাপলটন সাহেব ফুল্লশ্রীর সন্নিহিত গৈলা গ্রামে

উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক সীম ॥
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।[১]
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥"[২]

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

অন্য এক স্থলে—

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদ সাত ॥"

প্রথমাংশ বিজয়গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়,—

"গায়ক হৈয়া তাল থরে জন্মে নানা জাতি।
সেই বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ॥"

ইহা গুপ্ত কবির কাব্য-গায়কের বন্দনা—মূলের অন্তর্গত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ

প্রাচীন পুঁথিতে এই পাঠ দেখিয়াছিলেন। "ঋতু শশী বেদ শশী"—১৪১৬ শক, ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ্ রাজা হন। যখন মনসামঙ্গল রচিত হয়, তখন চৈতন্য-প্রভুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র।

১. এই ঘাঘর নদীটি বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ-সীমান্তে স্বল্পকায়া স্রোতস্বিনীর আকারে বর্ত্তমান আছে। কোটালীপাড়া ফুলশ্রী হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে। ঘণ্টেশ্বর নদীটি অধুনা গৌরনদী থানার পূর্ব্বদিকে ভিন্ন নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি ফুলশ্রী গ্রামের পরিসর পূর্ব্বে প্রায় সাড়ে চারি বর্গমাইল ছিল। ইদানীং এই গ্রাম গৈলাগ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়গুপ্তের বাসভূমি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুলশ্রী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবী জাগ্রত দেবতারূপে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট এখনও বিশেষভাবে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন।

২. বিজয়গুপ্ত স্বীয় জন্মভূমির পরিচয়-প্রসঙ্গে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

কর্ম্ম নহে। বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে 'জয়গোপালগণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ়ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও নানা হস্তস্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডুবন্ত দিবালোক এবং উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য কবির ভণিতারও অভাব নাই।

প্রক্ষিপ্ত রচনা।

বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের-পুটলি-কক্ষ 'বেজ মহাশয়' সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না। নিম্নে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

বিজয় কবির রসিকতা।

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ

"জামাই এনেছি পুণ্যবান্ কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা করে ঘরে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার করে॥
হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।

বিজয়গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে ॥”

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ

“ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর ॥
আঁচলে আঁচলে গিট বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই ॥
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে ঢঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ ॥
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্রছাল ॥
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥”

বিজয়গুপ্ত।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটির নির্দ্দিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে লক্ষিত হইবে। আমরা ভারতচন্দ্রের—

“জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥”

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের ছন্দ-গৌরবের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি। এইরূপ ছন্দে ভারতচন্দের বহু পূর্ব্বে কবি বিজয়গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥
বিশাই নাচে রে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়া রে মুখেতে গীত গাহে॥
বিকট দশনে ভ্রূকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে॥
বিজয়গুপ্ত মধুস্বরে সরস গায়।
পদ্মার চরিত্রে সবে ধন্দ হয়॥"

হামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালাছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পারিপাট্য সাধন করে, এই পৃথিবীতে তাহারই আদর অধিক।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে যাইয়া পরবর্ত্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে। সে সকল কবিগণ যাঁহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা অতীতের বিরাট ছায়ার পাশে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের খোঁজ করে? প্রশংসা, সম্পদ, যশঃ— সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম-তথ্যের খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জ্জিত হইলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের—বিশেষ বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে—ঘরে ঘরে এই পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে। বেহুলার অমানুষী কষ্ট-সহিষ্ণুতার মর্ম্মভেদী কাহিনীতে পল্লীবাসিনীগণের প্রাণ নিরবধি কাঁদিয়া উঠে এবং তাঁহাদের হৃদয়ে বেহুলা-সতীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল মহিমায় চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। পাঁচশত বৎসর যাবৎ বিজয়গুপ্ত

বাঙ্গালীর চিত্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তাঁহার রচনায় মেকী কিছুই ছিল না। খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি এত আদর পাইয়াছেন।

নারায়ণদেব

সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত লেখক ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯০ সন, কার্ত্তিক) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন

"নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন[১] অশক্য কথন॥
বিষম সায়স[২] ভইন কৈলা কি কারণ।
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন॥
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে।
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে॥
কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবর নগর॥
অগোরি[৩] চন্দন কাট্টে[৪] লখাই পুড়িমু।
লক্ষিন্দর কর্ম্ম[৫] ভইন এইখানে করিমু॥

---

১. ভইন—ভগিনী। ২. সায়স—সাহস।
৩. অগোরি—অগুরু। ৪. কাট্টে—কাষ্ঠে ৫. কর্ম্ম—শবদাহাদি।

নেউটিআ চল ভইন আপনার ঘরে।
একেশ্বর কেমতে যাইব দেবঘরে॥
মৎস্য মাংস এড়ি ভইন যত উপহার।
সর্ব্ব দর্ব্ব দিমু আমি তুমি খাইবার॥
সংখ সিন্দুর মাত্র না পড়িবা তুমি।
নানা অলংকার তোমা দিমু আমি॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
বিপুলা রাখিয়া আইলা জলের উপর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
বিপুলাও বোলে কিছু প্রবোধ বচন॥
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ।
কেমতে মুখেত জন্ত দিবাম তুলিয়া॥
অসতী হইব মনিষ্য লোকেতে প্রচার।
কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাথার॥
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর।
তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর॥
বিপুলা স্থনিআ বাক্য নিষ্ঠুর বচন।
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন।
স্থকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী।
নারায়নি করুণা স্থন একটি লাচাড়ি॥

কাঁদে নারায়ণি সাধু কহএ বিপুলা চণ্ডাআ।
প্রাণে না সর দুঃখ না দিমু এড়িয়া॥
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জিয়তা ভাসাইআ দিছে সইতে মরার॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপার করে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
নারায়ণদেবে কহে মনসা চরণ॥

বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া।
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেরুআ ভাসাইআ॥
ভাইত বিদায় করি বিপুলা স্থন্দরী।
ছড়াইয়া জাএ তরে ভুরাখান মেলি॥
নৈক্ষত্র সঞ্চারে যেন ভুরার চলন।
সম্মুখে বাঘের বাঁকে দিলা দরশন॥"

নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত।

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক যেভাবে কথা কহিতেন, সেই ভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া নারারণদেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণ-দেবের পুঁথিখানা গত ২০৯ বৎসর যাবৎ কোনরূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই' এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু 'জয়গোপালগণ; সেরূপ স্থবিধা পান নাই।[১]

চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি।

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পকনগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখীন্দরের কাণ্ডকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পকনগর ও তন্নিকটে বেহুলা-নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আসামভ্রমণ-প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবাঃ নির্দ্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি। উত্তরবঙ্গের লোকেরা বলেন, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানে চাঁদসদাগর ও লখীন্দরের বাড়ী

---

১. ২৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড, বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশীদাস ও কবিবল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উহার পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ,—

(ক) "দ্বিজবংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ॥"

(খ) "নারায়ণদেবে কয়, স্থকবি বল্লভে হয়" ইত্যাদি।

ছিল। কেহ কেহ দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী রনিৎ নদীর তীরে চাঁদসদাগরের বাড়ী নির্দ্দেশ করেন। আবার দিনাজপুর জেলায় কান্তনগরের নিকটবর্ত্তী সনকা গ্রামে চাঁদসদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ভূগোল-শিক্ষার্থীর একটু গোলে পড়িবারই কথা। চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব মূর্ত্তি; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে। পালা গানগুলিতে বহুস্থানে চাঁদসদাগরের উল্লেখ আছে। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও এদিক সেদিক হইতে উঁকি মারিতেছেন; সুতরাং চাঁদসদাগরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার আরম্ভও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন এবং এই অলৌকিক কাহিনীর উপর এমনই একটি কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন যে, তাহা সত্যের আকার ধারণ করিয়া আমাদের বিভ্রম জন্মাইতেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ সন্দেহ থাকিবে না। মনসাদেবীর সঙ্গে বিবাদে চাঁদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথাও পৃথিবীবাসিগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইষ্টকে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয়; যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে। চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন. চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু পল্লীগীতিকা ও রূপকথায় চাঁদবেণের উল্লেখ আছে; যে সকল বণিক সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া দেশ-বিদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, চাঁদসদাগর যে তাঁহাদের একজন অগ্রণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত খৃষ্টীয় সপ্তম-

অষ্টম শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন ; তখন বাঙ্গালার বাণিজ্য জগৎব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং আর্য্য-ধর্ম্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্ম্মগুলির একটা সংঘর্ষ ও বোঝাপড়া হইতেছিল। এই উপলক্ষ্যে নানারূপ উপগল্প চাঁদসদাগরের নামে প্রচলিত হইয়াছিল।

মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাঁদসদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল। এই বঙ্গদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীর্ত্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলের ইষ্টকস্তূপ বিশেষে চাঁদবেণের ভূতের সুবৃহৎ বাসাবাড়ী নির্দ্ধারিত হইল ; বর্দ্ধমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতাধোপানীর ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই। চাঁদসদাগর নামে কোন প্রথিতনামা বণিক বঙ্গদেশে এক সময় বৈশ্যকুলের অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রবধূ বেহুলা সতী-শিরোমণি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই উজানী নগর, গাঙ্গুর ও চম্পানগর কোথায় ছিল, কে বলিবে ? বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে তাঁহাদের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির উপর দাবী পড়িয়াছে—এই দাবী কোন্ ঐতিহাসিক বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন ?

কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি

মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষুদ্র ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে ; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭৯ খৃ.) পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল ; চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥" চৈ. ভা. আদি।

জনার্দ্দনের চণ্ডী।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা দ্বিজ জনার্দ্দনের একটি 'চণ্ডী' পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে, ব্রতকথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্যগঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক্ বিকশিত, বৃহৎ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে

তাহা অনুমিত হইবে। কাব্যজগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্য, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট ও বিচিত্র বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দ্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

১ম অংশ

"নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া।
পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে।
সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্যগিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে।
পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ।
মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী।
ব্যাধ পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণগোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণগোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হর্ষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী।
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা।
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥

মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ।
পঞ্চশত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন।
মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥
অল্প দ্রব্য আঙ্গুরী দিলা যে আমারে।
ইহা খাইয়া কি করিব বল তার পরে॥
মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদয়।
স্বর্ণ ভাণ্ডদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয়॥
চণ্ডিকা প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল।
তার পর ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল॥
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়া।
শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া॥
বন্ধনে পীড়িত হইয়া ব্যাধ মহাজন।
কাঁদিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিলা স্মরণ॥" ইত্যাদি।

এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত গীতি হয়ত চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি ভূমি।

এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধ বর্ণনা নাই। গুজরাটের সঙ্গে বঙ্গদেশে একটা সম্বন্ধ বহুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং বাঙ্গালী গুজরাটে যাইয়া একটা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, মৎপ্রণীত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কালকেতু গুজরাটে রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কোন ঘটনার কিছু সংস্রব আছে কিনা তাহা বিবেচ্য। ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্মাপুরাণের ঘটনার কেন্দ্রভূমিও এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পূজ্য-

পাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থ বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১]

২য় অংশ

"অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা।
চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল।
প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে।
গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে।
চণ্ডীকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি।
ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল।
কতকাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে।
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি।
বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে।
জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে।
হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে।
খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে॥
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ।
অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন।
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন॥

১. সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন।

* * * *

মঙ্গলচণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী।
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান।
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান॥
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান।
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান॥
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী।
জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিনী॥
অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার।
হেঁট মাথা করি গৃহে গেল আপনার॥
বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন।
মাথাএ বসন দিয়া, করিল শয়ন॥
অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন।
ম্লান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন॥
মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ।
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন॥"

শেষ শ্লোকের ক্ষুদ্র 'বিমাতা' শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের স্থত্রপাত; শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্ম্মাহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে, মাধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন!

রতিদেব ও অপরাপর কবি।

রতিদেবকৃত মৃগলুব্ধ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি[১],—উহা শৈব-ধর্ম্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-চিহ্নিত সাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে অতি কৃপাযোগ্যভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

'মৃগলুব্ধ' গীতি শৈবধর্ম্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, ষষ্ঠীর পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি

১. ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল। আমরা উহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি।

শীতলা-মঙ্গল

শীতলা পূজার আদি খুঁজিতেও আমরা শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে পারি। প্রাচীন শাস্ত্রের যে কোনও স্থলে যে কোন দেবতার সামান্য মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও দুঃখ বিমোচনের অনুরোধে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সেই সামান্য উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় সংস্কারোপযোগী দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের "তক্মন্" শব্দের অর্থ "শীতলা" বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত "অপ্‌দেবী"কে শীতলাদেবীর আদি মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের এই আভাস পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলাদেবীর বর্ত্তমান রূপ কল্পিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলাদেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে শীতলাদেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় দেখা যায়। ইহাতে আর একটি অনুমান করিবার অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে হারিতীদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। এতদ্দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ডোমপুরোহিতগণ হারিতী পূজা করিতেন, এই হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। হিন্দুশাস্ত্রে শীতলাদেবীর যে সুন্দর মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, শীতলাপণ্ডিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মূর্ত্তি সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে সুলেখক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "শীতলা পণ্ডিতগণের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দূরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত-ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডল-মাত্রাবশিষ্ট প্রতিমা মাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খনির্ম্মিত রুইতনের কৌটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা বসন্ত-চিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্ম্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপতোলা পেরেক চিহ্নের যেন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়।" ডোম-পুরোহিতের পূজার অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংস্রবের অকাট্য প্রমাণ।

এই শীতলাদেবীর সম্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়

নাই। তবে দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী[১], দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ[২], কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ

এই সকল পুস্তক ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের যে সব পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটি তেমন প্রাচীন নহে। তবে তাহারা যে তত্তৎবিষয়ের প্রাচীনতর কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ১৬৮৭ খৃ. অ. নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল' রচনা করেন। ইহাতে একটি উপাখ্যান অবলম্বনে যথারীতি ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের এক স্থানে সপ্তগ্রামের তদানীন্তন প্রভাব সম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে,—

"রাঢ় গৌড়ে দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল।
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ॥
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোকে ভাগীরথীর কূল।
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক॥
শত্রুজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে।
বেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে॥"

১. নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীযোড়ার জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন।

২. ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পুরুষোত্তম, প্রপিতামহের নাম শ্রীচৈতন্য, পিতামহের নাম শ্যাম এবং পিতার নাম গোপাল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হস্তিনা নগরে (হাতিনা), তৎপরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈদ্যপুরে আসিয়া বাস করেন। দৈবকী নন্দন দেবীর রূপবর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"বাম হাতে হেল্যা মুণ্ড উলুকবাহন।"

এবং ইহা ছাড়া সৃষ্টি-প্রকরণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে শূন্যপুরাণের ব্যাখ্যার নানা প্রকার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র

লক্ষ্মীদেবী স্থানবিশেষে গজলক্ষ্মী নামে পূজিতা। অতি প্রাচীনকালের লক্ষ্মীর যে সমস্ত বিগ্রহ এবং প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে অঙ্কিত দেখা যায়, তন্মধ্যে দুই পার্শ্বে দু'টি হস্তি-সমন্বিতা হইয়া শুণ্ডধৃত কুম্ভজলে তিনি অভিষিক্তা হইতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের লক্ষ্মীর এই প্রকার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। গজশুণ্ডধৃত কুম্ভজলে অভিষিক্ত হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই গজলক্ষ্মী নাম হইয়া থাকিবে। শিবানন্দ কর-রচিত 'লক্ষ্মীচরিত্র'ই এই শ্রেণীর প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কবির উপাধি গুণরাজ খাঁ ছিল। ইহা ছাড়া মাধবাচার্য্য এবং পরশুরাম কৃত "লক্ষ্মীচরিত্র" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবি জগমোহন-কৃত "লক্ষ্মীমঙ্গল"ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং অপরাপর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। জগমোহনের পর রণজিৎ-রামদাস ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একখানি 'কমলাচরিত্র' প্রকাশ করেন।

গঙ্গামঙ্গল

মাধবাচার্য্যের "গঙ্গামঙ্গল"ই প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত প্রভৃতি অনেক কবির "গঙ্গামঙ্গল" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যের পাঁচালী

সূর্য্যের পাঁচালীকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ —এই দুই জনের গ্রন্থই অধিকতর প্রচলিত। রামজীবন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদিত্য চরিত বা সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালীতে হাড়িজাতির প্রতি যে নিগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বরা সৌর-উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া থাকেন।

সূর্য্যের যে প্রাচীন ছড়াটি বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় গৃহের নববিবাহিতা বালিকাকন্যার ভরপুর চিত্ত-ব্যথা অতি করুণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বালিকা অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া স্বামিগৃহে যাইতেছে। এদিকে তাহার বিরহে মাতাপিতা কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইতেছেন। বালিকা নৌকায় শুইয়া সাশ্রুচক্ষে সেই করুণ কান্না শুনিতেছে এবং মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে বলিতেছে, যেন সে মায়ের

কান্না বেশীক্ষণ শুনিতে পায়। কিন্তু নৌকা এখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, আর সে কান্নার স্বর শোনা যায় না। সূর্য্য তাঁহার বালিকা বধূকে কত আদরে সান্ত্বনা দিতেছেন, কিন্তু সে শোক ভুলিতে পারিতেছে না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "তোমার দেশে গেলে আমি কাপড় কোথায় পাইব?" সূর্য্য বলিতেছেন, "তোমার জন্য আমি নগরে নগরে তাঁতি বসাইব, তাহারা তোমার জন্য কতরূপ শাড়ী তৈরী করিবে।" "আমি তোমার সঙ্গে যাইব, শাঁখা কোথায় পাইব?" "আমি তোমার জন্য আমার নগরে অনেক শাঁখারী বসাইব।" "আমি তোমার দেশে ভাত কোথায় পাইব?" "তোমার জন্য দিন রাত কৃষাণেরা হল বাহিয়া নানারূপ ধান জন্মাইবে।" কিন্তু বালিকা বধূর এইগুলিই চূড়ান্ত প্রশ্ন নহে। যে কথাটি বলিতে তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতেছে, চোখে জল উথলিয়া উঠিতেছে সেই কথাটি সে কম্পিত ওষ্ঠাধরে, গদগদকণ্ঠে শেষে বলিয়া ফেলিল: "তোমার দেশে যাব আমি মা বলিব কারে?" হৃদয়ের নিভৃত স্থানের ব্যথাটি ব্যক্ত করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। সূর্য্য তখন আদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার যে মা আছে মা বলিবে তারে।"—এই বাৎসল্য মধুর চিত্রের পরিণতি বঙ্গদেশের মর্ম্মস্পর্শী পরবর্ত্তী আগমনী গানে।

(৪) পদাবলী শাখা

ক। পদাবলী সাহিত্য খ। চণ্ডীদাস এবং রামী গ। বিদ্যাপতি

ক। পদাবলী সাহিত্য

পদাবলী সাহিত্য।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্ব্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতু মান, প্রেম-বৈচিত্র্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন,—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থে আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া

চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীত গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা নদীর মোহানার সহিত তুলিত হইতে পারে, এই গীতি কুলু কুলু স্বরে মানব জগতের সুখ দুঃখের কথা গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছায়, যেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়। সীমাবদ্ধ দুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয়, যাহা একেবারে অসীম।

আধ্যাত্মিকত্ব।

সহৃদয় ভিন্নদেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদন্তর্নিহিত মধুময় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপভোগ করিয়া করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পণ্ডিত গ্রীয়ার্‌সন্ মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—* "কিন্তু মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচনার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব ; সে সমস্ত পদে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম-বর্ণনার রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে!"[১]* ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন জন্য রাধার রূপক অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ নহি। তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদাবলীবর্ণিত রাধিকার ভাবগুলির সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন এবং তদ্দ্বারা পদাবলী যে ধর্ম্মসাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পারা যায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্মের এই রূপক সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিত নিউম্যান সাহেবের এইরূপ বিষয়ে একটি মতের উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব,— * "যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে রমণী-বেশে যাইতে হইবে। মনুষ্য সমাজে তোমার যতই

১. "But his (Vidyapaty's) chief glory consists in his matchless sonnets (Padas) in the Maithili dialect, dealing allegorically with the relations of the soul to God under the form of love which Radha bore to Krishna. These were adopted and recited enthusiastically by the celebrated reformer Chaitanya,"

Modern Vernacular Literature of Hindustan by Grierson

পুরুষকারের গর্ব্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"[১]

খ। চণ্ডীদাস ও রামী

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে[২] নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব ও বিস্ফী হইতে নান্নুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ; চণ্ডীদাসের নিবাসভূমি পবিত্র নান্নুরপল্লী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রেমের যে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এজগতে তাহার তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট নান্নুর-পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধিস্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয়; নতুবা আমাদের দেশের লোকে অন্যরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল—সমাধিস্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যশ্লোক মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।

চণ্ডীদাসের নান্নুর।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখ, দুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ; হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার আলোচনা সম্ভবপর হইবে কি না বুঝিতে পারি না। আর একটি বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে হয়ত আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিতাম না। আমি বহু বৎসর যাবৎ চণ্ডীদাসের গান গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি; এই মহাকবি আমার যতটা অন্তরঙ্গ, আমার দারা পুত্র স্বগণের কেহ তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ নহেন; তিনি আমাকে যতটা আনন্দ দিয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ ততোধিক আনন্দ দেন নাই। এই দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর পরিচয়ে আমি তাঁহার সুরটা চিনিয়াছি;

---

১. "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a *woman*; yes, however, manly thou mayst be among men"—Newman.

২. "বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবান। নবহু নবহুরস, ইহ পরিমাণ।"
এই পদটি কালবাচক নহে, পদের সংখ্যাবাচক। তিনি ১৩২৫টি নূতন নূতন রসের গান রচনা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহাই ইহার অর্থ।

এতদিন ধরিয়া যদি কাহারও কথা দিনরাত্রি শোনা যায়, তবে তাহার স্বরটা চেনা খুবই স্বাভাবিক।—আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাস, কে দীন চণ্ডীদাস, কে বড়ু চণ্ডীদাস, কে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কে বাশুলী সেবক চণ্ডীদাস, কে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাস-ব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না ; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। কয়েক বৎসর গত হইল একজন আমাকে কতকগুলি অজ্ঞাতপদ আনিয়া পরীক্ষা করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাসের পদ তাহা আমার তখন অজ্ঞাত থাকিলেও আমি দুই একটি ছত্র শুনিয়া ঠিক ধরিয়া দিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, আমার একটিও ভুল হয় নাই।

প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কবি এই চণ্ডীদাস।—শুধু চৈতন্য-চরিতামৃত নহে, বহুগ্রন্থে ও বহু মহাজনকৃত পদে কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন ; মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই চণ্ডীদাস প্রভুর তিরোধান হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির দেখা শোনা হইয়াছিল, ইহাও বহু মহাজনের পদে উল্লিখিত হইয়াছে—(পদকল্পতরুর ৫।২৪০৯, ১।২৪১০, ২।২৪১১, ৩।২৪১২, ৪।২৪১৩, ৫।২৪১৪, ৬।২৪১৫ পদ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং এই কথা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। বিদ্যাপতি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার তারিখ পাওয়া গিয়াছে।—পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রধান যুক্তিতে প্রমাণিত হয় যে চণ্ডীদাস ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন ; তিনি বাশুলী মন্দিরে, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভ দৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল ; তিনি বাশুলীর নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন, "আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি, আমি কত তপস্যা দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকি, আমার একি হইল, তোমা অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল ? আমি পতিত হইয়াছি, আমি কি করিব বলিয়া দাও।" বাশুলীর আদেশ তিনি শুনিলেন, "তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস, ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু কিংবা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।" তাহাই হইল, জয়দেবী ভাব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, রামীর প্রেমের দীক্ষা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নূতন পথ দেখাইল।

যাঁহারা বলেন এই প্রেমকাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা, সহজিয়ারা ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কখনও সমর্থিত হইবে না ; একটি একটি করিয়া তাহার কয়েকটি কারণ দেখাইতেছি ঃ

সত্য বটে সহজিয়ারা তাঁহাদের নরনারীর প্রেমের আদর্শ সমাজে চালাইবার জন্য বৈষ্ণবদিগের যত সাধু—প্রত্যেককে কিশোরী-পূজক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি তাহারা মহাপ্রভুকেও বাদ দেয় নাই। উগ্র সন্ন্যাসের অবতার রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এমন কি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মীরাবাঈকেও তাহারা তাহাদের স্বীয় দলভুক্ত করিতে চাহিয়াছে ; কিন্তু খাঁটি জিনিষ থাকিলেই মেকী থাকে ; শুধু মেকী চলে না। সহজিয়াদের পূর্ব্বেই "রসিক ভক্ত" নামক এক শ্রেণীর নারীপূজক কিশোরী-সাধনা করিতেন ; বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের মধ্যে এই সাধনা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্করের (৯৮২-১০৫৪ খৃঃ) নিকট তিব্বত-রাজা লাঃ লামা ইয়েসিও যে দূতগণ পাঠান, তাঁহারা তাঁহাকে বলেন, "নীলবস্ত্র-পরিহিত একদল ভিক্ষু স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করিয়া তাঁহার রাজ্যের লোকের মতিগতি ফিরাইয়া দিতেছে ; তাহারা নরনারী মিলনকেই ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে।"

এই দল বঙ্গদেশে আসিয়া বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল ; বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে ঘরে ঘরে ইহারা যোগিনী, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া তাহাদের মত প্রচার করিত। সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে 'দোয়াসিনী' বলিত। 'দোয়াসিনী'গণ মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা রোগ আরোগ্য করিত এবং শঙ্খের কুণ্ডল কাণে পরিত। চণ্ডীদাসের পদে এই যোগিনী ও দোয়াসিনীগণের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবাদ অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

রসিক ভক্তের মধ্যে কয়েকজন বৈষ্ণবগুরুর নামে এই নারী সেবা সহজিয়ারা মিথ্যামিথ্যি আরোপ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাপ্রভু এবং তৎশিষ্যদের সম্বন্ধে এই মিথ্যাবাদ সহজিয়াদের গণ্ডী বহির্ভূত ; কেহই বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু যেখানে দেখিব, চারিদিকের লোকে একই কথা কহিতেছে, তখন তাহা অপ্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই।

নান্নুরবাসীদের মধ্যে রামীর প্রেম সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সহজিয়ারা সৃষ্টি করে নাই, সেখানে রামীর ভিটা আছে। হয়ত গ্রামেও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ কথা আছে ; মানুষ অচল মহীরুহ নহে,

নানাস্থানেই সে গমনাগমন করিতে পারে ও বাড়ীঘরও নানাস্থলে তৈরী করিতে পারে। কিন্তু যে দেশ চণ্ডীদাসের লীলাভূমি সেই দেশের ব্যাপক জনশ্রুতি কখনও মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। বঙ্গের এই সকল নিভৃত পল্লী বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল না, সেখানে ঘন ঘন লোকবাসের পরিবর্ত্তন হইত না। শত শত বৎসর যাবৎ একই বংশ, একই পরিবার এক ভিটায় বাস করিত। পিতা পিতামহের নিকট এবং পুত্র পিতার নিকট গ্রাম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিত—তাহার অধিকাংশই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "নহ্যমূলা জনশ্রুতি।" ১৪।১৫ পুরুষের মধ্যে স্বীয় গ্রাম সম্বন্ধে প্রবাদগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট ভিটার প্রমাণের মধ্যে অপ্রত্যয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

সুচিরাগত সংস্কার ও ভিটার প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ, রামীর অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস লিখিত রামী সম্বন্ধে পদাবলীও সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে রামীর কবিতা ২০০।২৫০ বৎসরের একখানি পুঁথির পাতায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে উদ্ধৃত হইবে। সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় ২৩৭৫ নং আর একখানি প্রাচীন পুঁথিতেও ঐ কবিতাটি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে,—নান্নুরের এ সম্বন্ধে প্রাচীন জনশ্রুতির কথা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই জনশ্রুতি ও কবিতাগুলির কথা প্রায় একই রূপের। মহাজন-কৃত বহু পদে রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন পুঁথির প্রমাণ।

তৃতীয়তঃ, শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নহে, বৈষ্ণবগণ্ডীর বাহিরেও রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ পাইতেছি; পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ৪র্থ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে আধা বঁধু গীতিকা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরের প্রমাণ।

মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নরহরি সরকার তাঁহার চণ্ডীদাস-বন্দনায় রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতগুলি প্রবাদ, গ্রন্থোক্ত প্রমাণ, স্থান নির্দ্দেশ, বঙ্গদেশময় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক জনশ্রুতি —এ সমস্তই কি সহজিয়ারা সৃষ্টি করিয়াছেন? কই মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বচরগণের সম্বন্ধে সহজিয়ারা যে অপবাদ দিয়াছে, তাহা তো কেহই বিশ্বাস করেন নাই, তজ্জন্য সহজিয়ারা সর্ব্বত্র তিরস্কৃত হইয়া আসিতেছে। মোট কথা, খাঁটি ও মেকী

চণ্ডীদাসের নিকটতম কালের কবি নরহরির প্রমাণ।

সহজেই ধরা পড়ে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সঙ্গে চিন্তার প্রেম সত্যঘটনামূলক ও জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রেমও তাহাই। মালিনীর সঙ্গে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামের প্রেমও তাহাই। এই সকল প্রেম-কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং ইহা কেহ অবিশ্বাস করে নাই।

চণ্ডীদাসের সহজিয়া মত।

চণ্ডীদাস তাঁহার যে অতুলনীয়া ভাষায় রামীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিয়াছেন, সে ভাষা অন্যের অনায়ত্ত। তৎকৃত সহজিয়া পদের কতকগুলি এমন সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ যে, তাঁহার মত গীতি-কবিতার গুরুই লিখিতে পারিতেন। সহজিয়ারা কতকগুলি পদ তাঁহার ভণিতা দিয়া চালাইয়াছিল সত্য,—কিন্তু সেই সকল পদ বিচার করিলে সহজেই জাল বলিয়া ধরা পড়িবে।

দীন চণ্ডীদাস।

বঙ্গের কবিরা—বিশেষ বৈষ্ণব কবিরা অনেক সময় দৈন্য বুঝাইতে "দাস", "দীন", "দীন হীন", প্রভৃতি উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ বিভিন্ন ভণিতা দেখিলেই যে কবি স্বতন্ত্র, এরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। অনেক সময় গায়কগণও ইচ্ছানুসারে কবির ঐ ভাবের উপাধি ভণিতায় বসাইয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে পদকল্পতরুর ১।২১ পদে "দীন বলরামদাস", ১।৬৭ পদে "দীন গোবিন্দ দাস", ১।৩০০ পদে "দীন হান দাস", ১৩।১৬৮ পদে "পাপী রাধামোহন দাস", ২।১৪৮৩ পদে "দীন কৃষ্ণ দাস", ৩৩।২১১৫ পদে "হীন রামানন্দ", ৩৯।২০৫০ পদে "দীন হীন রামানন্দ দাস", ৪৯।২০৬১ পদে "দুর্ম্মতি বৈষ্ণবদাস", ৩৭।২১১৭ পদে "দীন নরোত্তম দাস", ৫।২১৪১ পদে "দুঃখিয়া শেখরদাস", ৫।২১৫১ পদে "দুঃখিয়া শেখর দাস", ৭।২১৪৩ পদে "পাপিয়া শেখর দাস", ১২।২৩১৩ পদে "দীন হীন হরিদাস", ৩৯।২২০৬ পদে "পামর মাধব দাস", ১৬।২২২৯ পদে "দীন হীন ঘোষ" (মাধব ঘোষ), ৭।২২৯০ পদে "দীন ঘনশ্যাম দাস", ২।২৩১৩ পদে "দীন হীন হরিদাস", ১।২৩১১ পদে "দীন কৃষ্ণদাস", ২।২৯৩৫ পদে "অকিঞ্চন বল্লভ-দাস", ৫।২৯৩৮ পদে "পতিত রাধামাধব" প্রভৃতি বহু পদে দৈন্যব্যঞ্জক উপাধির বৃষ্টি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ কোন একটি স্থানে "দীন চণ্ডীদাস" পাইয়া অনুরূপ বহু পদে শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকা সত্ত্বেও তাহা তথা-কথিত "দীন চণ্ডী-দাসের" বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদত কথা শুধু "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতায় পাইলে যে পৃথক চণ্ডীদাস দাঁড় করাইতে হইবে—তাহা আমরা স্বীকার করি না।

সর্ব্বত্রই যে একমাত্র চণ্ডীদাসই পদ লিখিয়াছেন, তন্নামের অন্য কেহ লেখেন নাই—ইহা হলপ করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে আমার বিশ্বাস পদকল্পতরুতে যে সকল পদ চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি খাঁটি। তৎসংকলয়িতা বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহার "কল্পতরু"র উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন এবং যেখানে যেখানে একই নামের ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বহুশ্রমজাত বিরাট অধ্যবসায়-প্রসূত মহাগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা পল্লবগ্রাহী বৈজ্ঞানিকের "অনুমান খণ্ড" বিশ্বাস করিব না। গোবিন্দ দাস ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদ এই ভাবে বৈষ্ণব দাস স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অপর কয়েকটি কবি সম্বন্ধেও এইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। 'দীন চণ্ডীদাস' যদি সত্যই ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দাঁড় করাইতে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুমানের উপর নির্ভর করিলে আদৌ চলিবে না।

ভাষার কথা যুগে যুগে বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তজ্জন্য চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবির পুস্তক এখনও চাষা ও মুদিরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। এরূপ ব্যাপক রস-জ্ঞান ভাষা রূপান্তরিত না হইলে কখনই সম্ভবপর হইত না। হরিদ্বারের গঙ্গার গৈরিকবর্ণ ও কাঁকর ত্রিবেণীতে পাওয়া যায় না—তাই বলিয়া গঙ্গা ভিন্ন হইয়া যান নাই। 'শ্যাম' ছিল না 'কানু' ছিল, তাহা লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া কি লাভ? স্বীকার করিতেছি, ভাষা কতকটা তফাৎ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের অতুলনীয় হৃদয়ের স্পন্দন বহু পদে এখনও পাওয়া যায়। শবচ্ছেদ করিয়া মাতৃ-অঙ্গের কোথায় কোন্ স্নায়ু ও অস্থি আছে, তাহা যে সকল ডাক্তার পরীক্ষা করিতে চান, আমি সেই সকল ডাক্তারের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে চাহি না; আমি চাই মাতার বাৎসল্য রসটি, উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র লক্ষ্য—কোন লণ্ডনের ডাক্তার আমাকে কি বলিতে পারেন, মাতার কোন্ অস্থিতে, কোন্ স্নায়ু বা শিরায় সেই বাৎসল্য রসটি থাকে?

চণ্ডীদাসের একটি সুর আছে, আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেই সুরটি আমি চিনি, তাঁহার কতকগুলি মুদ্রালক্ষণ আছে—যেমন একটি কথা দুইবার বা বারংবার করিয়া বলা,—যাহাকে ইংরেজীতে refrain বলে। *"একথা কহিবে সই একথা কহিবে। অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥" "কি

মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ ; "তোমারে বুঝাই বঁধূ তোমারে বুঝাই। ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই ॥ ; "এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে। না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে ॥" * তাঁহার নিকটতম পরবর্ত্তী কবি নরহরি এই সুরের অনুকরণ করিয়া লিখিয়াছেন— * "কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে।" • (এই পদটি আবার নরহরির পরে রায় শেখর কতকটা রূপান্তরিত করিয়াছেন)।

চণ্ডীদাসের পদে "অবলা" শব্দটির বড়ই প্রাচুর্য্য, *"হাম সে সরলা, অবলা অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি। বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।" ; "শুনহে চিকন কালা, কি বলিব আর চরণে তোমার অবলার যত জ্বালা।" ; "অবলার যত দুঃখ, প্রাণনাথ, সব থাকে মনে মনে।" ; "একথা কহিবে সই একথা কহিবে। অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে।" * প্রভৃতি শত শত পদে এই "অবলা" শব্দটি আছে। অবশ্য বহু কবির পদে অবলা শব্দটি এবং পদাংশের দুইবার অনুবৃত্তি আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে ইহার অত্যধিক প্রাচুর্য্য।

চণ্ডীদাসের ত্রিপদীগুলির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অপরাপর কবিরা সাধারণতঃ অষ্ট অক্ষরের, কখনও কখনও বড় অক্ষরের অর্দ্ধছত্রের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র যোজনা করেন, তৎসঙ্গে কবিতাটির অর্দ্ধছত্রের মিল থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস অনেকস্থলেই গোড়ায় একটিমাত্র অর্দ্ধছত্র দিয়া আরম্ভ করিয়া তাহা কবিতার ৪র্থ অর্দ্ধছত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, যথা— * "(সখি)" কি আর বলিব তোরে, অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলে ঘরে।" ; "এই এত কি সহে পরাণে। কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী, শুনিলি আপন কাণে।" ; "(বঁধু) কি আর বলিব আমি—(আমার) মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণ বঁধু হইও তুমি।" ; "(রাধার) কি হ'ল অন্তর ব্যথা, সে যে বসিয়া একলে, থাকয়ে বিরলে না শুনে কাহার কথা" ; "শুনহে চিকণ কালা বলিব কি আর, চরণে তোমার অবলার যত জ্বালা।" ; "(বঁধু) তুমি সে আমার প্রাণ দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি, কুল শীল জাত-মান।" ; "এই কে বলে পীরিতি ভাল, হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিয়া জীবন গেল।" ; "সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" * কখনও কখনও প্রথমটা ঠিক

প্রচলিত ত্রিপদীর মতই আরব্ধ হয়, তার পর দ্বিতীয় কবিতার প্রারম্ভে হঠাৎ ঐরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র প্রদত্ত হয়, *"কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মন ব্যথা, যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই, কাণাকাণি শুনি সেই কথা। সই লোকে বলে কানু পরিবাদ। কালার ভ্রমেতে হাম, জলদ না হেরি গো, ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ।"; "(সে যে) সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে, বসে থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে। রাই এমন কেন বা হৈল" * ইহাই চণ্ডীদাসের সেই সুরটি, যাহার সঙ্গে আমি পরিচিত। চণ্ডীদাসের এইরূপ শত শত পদ আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার অবকাশ নাই। পদকল্পতরুর ৬।১৭৩৪ পদটির সবটা এই ভাবের অর্দ্ধছত্র দিয়া আরম্ভ,—* "সই কহবি কানুর পায়, সে সুখ সায়র দৈবে শুকাইল, তিয়াসে পরাণ যায়। সই ধরিবি কানুর কর, আপনা বলিয়া বোল না তেজবি মাগিয়া লইবি বর। সখি যতেক মনের সাধ, শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে বিহি সে করল বাদ। সখি হাম সে অবলা তায়, বিরহ আগুন দহয়ে দ্বিগুণ সহন নাহিক যায়। সখি বুঝিয়া কানুর মন, যেমন করিলে আইসে সেজন দ্বিজ চণ্ডীদাস ভন।" * এই চণ্ডীদাসের সুর; কবির করুণ ও মিষ্ট সুরে ভ্রম হওয়ার অবকাশ নাই।

চণ্ডীদাস হৃদয়ের যে মর্ম্ম কথাটি কহিয়াছেন, প্রেমকে যে উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়াছিলেন, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়া প্রেমের যে স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন বঙ্গীয় গীতি কবিতায় সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। গালাগালি দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, * "এ হেন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়, হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।" * অভিশাপ দিয়াছেন * "আমার হৃদয় যেরূপ হইয়াছে তেমতি হউক সে": * ইহা হইতে বড় অভিশাপ আর তাঁহার নাই। বিষ দিয়া মার, অগ্নিতে দগ্ধ কর— কিছুতেই তত কষ্ট দিতে পারিবে না, কানু প্রেমে তিনি যত কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি যে কষ্ট পাইতেছেন সেই প্রেমের কষ্ট চূড়ান্ত কষ্ট,— * "আমার মত যেন সে হয়" * এই উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিহীন, একটি কথা তাঁহার সমস্ত হৃদয়ের গভীরতম ভাব-জ্ঞাপক। যখন কৃষ্ণকে তাঁহার মনের কষ্ট বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখনও বলিতেছেন—আর জন্মে যেন তুমি আমার মত হও, নতুবা এ দুঃখ বুঝিতে পারিবে না, মরিয়া যেন আমি শ্রীনন্দনন্দন হই,— তোমাকে ভালবাসিয়া যেন ছাড়িয়া যাই, তখন বুঝিবে * "পীরিতি কেমন

জ্বালা"। * অন্য কোন কষ্ট দুঃখের কথা বলিলে তাহার প্রাণের ব্যথা বুঝাইতে পারিতেন না, তাঁহার দুঃখ যেরূপ অপার, কানু প্রেমের আনন্দও সেইরূপ অপার। * "সখির সহিতে, জলেরে যাইতে, সেকথা কহিবার নয়। যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়"। * চণ্ডীদাসের অনেক কথাই মনের ভিতর থাকে—অতি অল্প কথায় তিনি ভাবরাজ্যের ইঙ্গিত দিয়া যান, —সমস্ত কথা বলেন না, পাঠককে তাহা পূরণ করিতে হয়। যখন সখীর সহিত রাধা জল আনিতে যান, তখন আনন্দে শরীর এলাইয়া পড়ে— * "সে কথা কহিবার নয়"। * যমুনার জল কেন ঝলমল করে?—যমুনার কূলে নীপ তরুর ডালে শিখি পুচ্ছ মাথায় কৃষ্ণ বসিয়া থাকেন, তাহার প্রতিবিম্ব পড়ায় জল ঝলমল করে, রাই উর্দ্ধদিকে লজ্জায় চাহিতে পারেন না—তিনি সেই কথা বলিতেছেন। পরবর্তী অনেক কবি তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন * "ঢেউ দিও না জলে বলে কিশোরী, দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী"। * কেন উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পারেন না, সে কথা আর এক কবি লিখিয়াছেন:— * "দাদা বলাই সঙ্গে ছিল"; * সুতরাং পরবর্তী সমজ্‌দার কবিরা চণ্ডীদাসের স্বল্পাক্ষরা কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি শুধু "সে কথা বলিবার নয়" * এবং * "যমুনার জল, করে ঝলমল" লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের অনেক পদে যে সর্ব্বোচ্চ প্রেমের ইঙ্গিত আছে, তাহাতে পার্থিব প্রেম অপার্থিবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া এখানে অসম্ভব। তিনি প্রেম সম্বন্ধে একটি সার কথা বলিয়াছেন— * "চণ্ডীদাস কহে, শুনি বিনোদিনী, পীরিতি না কহে কথা। পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলয়ে তথা।"

যখন জাতীয় কোন বহু কৃচ্ছ্রপূর্ণ তপস্যার ফলে ভাব রাজ্যের রাজা অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার আগমনী চারিদিক হইতে ধ্বনিত হয়। রাজা রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র নহেন, রাজ্যের ভাবরাশি তাঁহার মধ্যে স্বতই প্রকাশ পায়। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদে ও নানা দর্শনে যে সকল কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বুদ্ধ সেই সকল ভাবের প্রতীক স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভল্টেয়ার ও রূশো যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতীক স্বরূপ নেপোলিয়নের আবির্ভাব! চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জয়দেব মেঘদর্শনে রাধিকার আনন্দ ও কৃষ্ণভ্রম বর্ণনা করিয়াছিলেন, মাধবেন্দ্রপুরী মেঘদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িতেন ; কিন্তু চণ্ডীদাসের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলার আভাস সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়—ইহা তাঁহার আগমনী গান ; যেরূপ প্রভাত হইবার পূর্ব্বে উষাসুন্দরী সোণার শাড়ী পরিয়া দিগ্বলয়ে দেখা দেন এবং সূর্য্যোদয়ের আভাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেন, চণ্ডীদাসের গীতি সেইরূপ চৈতন্যের আগমন সূচনা করিয়াছিল। পল্লবগ্রাহীরা সেই সকল পদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাত্র।

নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত—শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী হইতে পূর্ব্বাংশে ১২ ক্রোশ ; বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে ; বক্রেশ্বর আদি উষ্ণ-প্রস্রবণ ময়ূরাক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা. দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ, বসোরার গোলাপ তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূমি—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ও সেই বেলফুলগুলির ন্যায় সুন্দর ছিল, তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পিতা 'বাশুলীদেবী'র পূজক ছিলেন[1], তজ্জন্যই বোধ হয় পুত্রের নাম 'চণ্ডীদাস' রাখা হইয়াছিল। এখনও নান্নুর গ্রামে বাশুলীদেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

চণ্ডীদাসের জীবনী।

চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেবমন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী)[2] কবির হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। যাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ন্যায় ভাবুক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্তি নাই। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে।

---

১. ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" লেখক কবির কোষ্ঠী কিরূপে সংগ্রহ করিলেন, তাহা জিজ্ঞাস্য।

২. ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম "রামতারা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃ.)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহা হইলে নরহরির 'তারা ধুবনী' বুঝিতে কোনও গোল হয় না।

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে[১], তাহাতে তাঁহার নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে। রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন; একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, * "শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥ তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কুলে॥" * কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না; তবে তাঁহার ভ্রাতা নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল; তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য বিনয় অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে * "নীচ প্রেমে উন্মাদ" * বলিয়া এবং * "পুত্র পরিবার আছয়ে সংসার, তাহারা সম্মতি নহে।" * ইত্যাদিরূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া * "তুমি একজন বট মহাজন, সকল করিতে পার" * ইত্যাদি আদরবাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-সূচক পান দান করিলেন।

এদিকে একথা শুনিয়া রামী— * "নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।" * এবং * "গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া, শয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়।" * কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। 'সীতামিশ্রী', 'আলফা', প্রভৃতি নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য যখন ভোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাহ্মণগণ গণ্ডুষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যখন * "দ্বিজগণ ডাকে, ব্যঞ্জন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।" * এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাত সূচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন, তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেম-সরোবরে তিনি শতদলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—

১. সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৭৩ পৃ. (১৩০৫ সন)।

তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে ; করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায় ; একদৃষ্টে তিনি ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,—নব পরিচয় এইরূপ। তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা ; কত বিনয়, কত অনুনয়, মধুমাখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের সৃষ্টি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া, আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি। প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে,—কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ঔষধ সুখ আছে।

চণ্ডীদাসে রাধিকা।

"যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥"

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে দুঃখে, সুধা বিষে, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার অশ্রুতে সুখ দুঃখ জড়িত, প্রভাত পদ্মের ন্যায় দু'টি চক্ষু আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, কিন্তু নৈশ শিশির-ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়ে,—কোন্‌টি পুলকাশ্রু কোনটি শোকাশ্রু, কোন্‌টি প্রাতঃ-শিশির, কোন্‌টি নৈশ-হিম-কণা—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

"গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥"

তাঁহার প্রসঙ্গে কাঁদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,—সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে ; আবার এই সুখ পাছে অপর কেহ দেখে,—পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বুঝে না,—তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক

ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না। এই সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূর্ব্ব-সুখ হইত না; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গাইবার ভয়;—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ—অভিমান; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনামাত্র—

"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনব।
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না॥"

এক পা ছুটিতে চায়, অপর পা চলিতে যাইয়া থামে। চণ্ডীদাসের রাধার মান করিবারও সাধ্য নাই; দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন মন্ত্রমুগ্ধ, শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,—

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

ইহা অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক, তিনি হৃদয়-নিভৃতে সেই পদকুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া সুখী হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির উৎকর্ষের পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

আর একটি কথা কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশঃ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা

পড়িয়াছিলেন। চারু চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়,—কিন্তু মানসসৌন্দর্য্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত। লেখা পড়া পুষ্পের ন্যায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র ভাব কি ভক্তির নিকট পৌছাইতে চেষ্টা করে? যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত, তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন;—প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব-ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গৌণবস্তু দ্বারা মুখ্যবস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমায় রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই হিসাবে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চণ্ডীদাস যে প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক ভাব।

চণ্ডীদাসের গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না:—সাধারণ প্রেম দ্বারা উহার সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করা সুকঠিন হয়; পূর্ব্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য-প্রচার—নাম মধুময়, তাহা * "বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" * নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী-ভালবাসার সাহিত্যে বিরল, কিন্তু * "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।" * এই নামজপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য,—ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না,—ইন্দ্রিয়-প্রশমিত মন নামের মধুভরা মোহ সর্ব্বদা শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্ব্বরাগ সাংসারিক প্রেমের পূর্ব্বরাগের উন্নততম আদর্শ, এইরূপ একটা কষ্ট-ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তারপর রাধিকার * "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" * নীল নিচোলপরিহিতা রাধিকা-মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাস (গেরুয়া)-পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত। তাঁহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে

করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। * "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুত্তলি যেন ভূতলে লুটায়।" * এই স্বর্ণ-পুত্তলী প্রেমিকের নয়ন-পুত্তলী কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণ-পুত্তলী গৌরহরির ছবিরই পূর্ব্বাভাস যেন এই পদে সূচিত হইতেছে। * "সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস,পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণ মানি॥"* পদটি * "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" * —প্রভৃতির ন্যায় নীতি-জ্ঞানের অত্যূর্দ্ধে স্থিত ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের মানুষী-প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় প্রেমভাব তত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। রামীর কথা কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাস মানুষী-প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্য্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্ম্মজগতের কথা কহিয়াছেন; * "কামগন্ধ নাহি তায়"— * কথাটি বহু পরিচিত; তাহা ছাড়া * "তুমি হও পিতৃ মাতৃ", "তুমি বেদমাতা গায়ত্রী", "তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস" * এসব কথা ধর্ম্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায়। ধোপানীর পায় যে পুষ্পাঞ্জলি—যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত স্বর্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌঁছিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্ব্বত্রই মর্ম্মস্পর্শী। * "বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবোলা নাম"— * পদে তিনি "অবলা" শব্দটিকে "অবোলা"রূপে ব্যবহার করিয়া নারীজাতির মূকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—অর্থ, যে মুখ থাকিতে কথা বলিতে পারে না—সেই "অবোলা"। চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সরল ও সুন্দর। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের * "ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধুলি তনু ভরই॥" * প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা রাধিকার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্ত্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার

সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্য প্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্ত্তি ভাষায় পুষ্প-পল্লবের বহু উর্দ্ধে নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্য্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্য সৌন্দর্য্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূত কোটি হৃদয়ের অন্তঃপুর উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতিতে 'নায়িকা রাধিকা' অপেক্ষা 'রাধাভাবে'রই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভাব-সম্মেলন।

চণ্ডীদাসের ভাব সম্মেলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল। * "বঁধু কি আর বলিব আমি" * —প্রভৃতি গান শুধু বৈষ্ণবদের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগিণীতে ব্রাহ্ম-গায়কের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়া থাকে। আমরা একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব ঃ

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ ;
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম তোমার চরণ মানি ॥"

চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র প্রমাণ পাইতেছি যে, মহাপ্রভু বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেহই তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহারা সকলেই তাঁহার গীতে মুগ্ধ ছিলেন। নরহরি সরকার (যিনি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের

পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের গান তাঁহার সময় ভুবনব্যাপী হইয়াছিল, ইহাতে অনুমান হয়, সেই সকল গান এতদূর খ্যাতিলাভ করিতে অন্ততঃ শতাব্দীকাল লাগিয়াছিল। নরহরি ১৪৬৫ বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, বিদ্যাপতির জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৩৫৮ খৃ· অব্দ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা ক্রমে লিখিতেছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এক প্রধান আবিষ্কার—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।" এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এত বেশী যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া লিখিতে হইতেছে। কেহ কেহ "কৃষ্ণ কীর্ত্তনে"র প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কেহ বা এই পুস্তকের মোহিনীতে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদগুলিকে জাল মনে করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই কবির একমাত্র খাঁটি লেখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। দুইদলের গোঁড়ামির ভিড় ঠেলিয়া সত্য উদ্ধার করিতে হইবে।

আপত্তিকারকের একজন বলিতেছেন, চণ্ডীদাসের রচনা পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, বীরভূম প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বিকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কতক কতক পদ ভাঙ্গিয়া অনন্তনামক গায়ক এই কাব্যখানি রচনা করিয়া আসাম হইতে চালাইয়াছেন। স্বকপোলকল্পিত অনুমানের উপর একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণের চেষ্টার একটা ভাণ করিতেছেন মাত্র—তিনি কি কোথাও পাইয়াছেন, অনন্তনামক একজন "গায়ক" ছিল এবং আসামে তার বাড়ী ছিল? যদিও আসামীর প্রাচীন ভাষার সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষার কতকটা ঐক্য আছে, সেইরূপ ঐক্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ভাষার সঙ্গেও পরিদৃষ্ট হইবে। যেরূপ কথার প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে কেহ আসামবাসী বলিয়া মনে করিতে পারেন—সেরূপ প্রয়োগ যখন তুল্যপরিমাণেই অপরাপর অঞ্চলের ভাষায়ও পাওয়া যায়, তখন বলা উচিত, কবি বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া সেই সেই দেশের ভাষার তিল তিল গ্রহণ করিয়া এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ তিলোত্তমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একথা নিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঠিক যথাযথ ভাষা যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে সেই ভাষায় বঙ্গদেশীয় অপরাপর প্রদেশের প্রাচীন কথিতরূপ যে আধুনিক সময় হইতে অনেক বেশী পাওয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, আসাম, উৎকল ও মিথিলার ভাষা-গত ঐক্য অনেকটা বেশী ছিল, সেই ঐক্য দেখিয়া চমকিয়া যাইবার কারণ নাই, বরং সেই ঐক্যের নিদর্শন পাওয়া যাওয়াতেই পুঁথিখানি প্রামাণিক বলিয়া মনে হইবে।

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত চণ্ডীদাসের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি রচনা কি কেহ অবিকৃত মনে করেন? গানের ভাষা ও ফুলের মালা কেহ বাসি ব্যবহার করে না, উহা নিত্যই নূতন। গায়কের কণ্ঠে প্রাচীন পদের ভাষা নিত্যই নূতন হইয়া যাইতেছে, ইহাই এ দেশের রীতি; কিন্তু তাহাতে কবির কৃতিত্ব হ্রাস পায় না; "করন্তি"র স্থানে "করে" "আহ্মির" স্থানে "আমি", "তোহ্মার" স্থানে "তোমার" প্রভৃতিরূপ পরিবর্ত্তন সামান্য বেশ-পরিবর্ত্তন মাত্র। বিগ্রহ নব-কলেবর ও নব অঙ্গরাগে পৃথক দেবতা হইয়া যান না। অন্য যে সকল পদ ও কবিতা চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার নূতন অঙ্গরাগ হইয়াছে মাত্র, কবিকে আমরা হারাইয়া ফেলি নাই, নববস্ত্র পরাইয়া বাহির করিয়াছি মাত্র।

ইহার প্রমাণ যদি কেহ চান—তবে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখুন। এক শত বৎসরের প্রাচীন চণ্ডীদাসের পুঁথির ভাষা হইতে দ্বিশত বৎসরের পুঁথির ভাষা কত প্রাচীন এবং শেষোক্ত পুঁথির ভাষার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও উত্তরবঙ্গের পল্লী-ভাষার সাদৃশ্য কত বেশী!

এখন আমরা "চণ্ডীদাস" রচিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে একখানি পুস্তক পাইয়াছি। সেই পুঁথিখানি যে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি আমি দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ৭।৮ হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখিয়াছি—তন্মধ্যে এরূপ প্রাচীন পুস্তক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। এই পুস্তকখানির অক্ষর দেখিয়া কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইহার হস্তলিখিত ১৩৮৫ খৃঃ[১] অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের, বরং তাহারও পূর্ব্বের, কিছুতেই তৎপরবর্ত্তী নহে। যিনি পুঁথিখানি দেখেন নাই, তিনি যদি শত শত

১. ইহা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, কিন্তু অন্যমতে পঞ্চদশ শতকের শেষার্দ্ধ। (১৪৫০-১৫০০)

অনুমানের বলে উহা উড়াইয়া দিতে চান, তবে তাঁহার কল্পনা-শক্তির প্রশংসা ভিন্ন আমরা তাঁহার আর কোন দাবী স্বীকার করিতে পারিব না। চণ্ডীদাসের একখানি প্রাচীন পুঁথি, (যাহার হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে নহে) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে উহার হস্তলিপি দুই কি ততোধিক লোকের হওয়াতে কিছু যায় আসে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এক শতাব্দীর পুঁথির অংশবিশেষ একই কাগজে পরবর্ত্তী শতাব্দীর লোক নকল করিয়াছেন। এরূপ নকল সচরাচর অতি অল্পকালের মধ্যে হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আরও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদরচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্ব্বে তাঁহার 'অনন্ত' নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাশুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য অবগত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই। চণ্ডীদাসের পদগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধৃত এবং কবির প্রচলিত পদের পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে, যথা :—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআঁরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞেঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করি মন মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥

চউঠ পহরে কাহ্নু করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩৩৪ পৃ.।

"প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপণ দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্বন দিয়া বদন উপরে ॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে।
তৃতীয় প্রহরে নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে ॥
চতুর্থ প্রহরে কান, করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥"

সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ১০১—২ পৃঃ

ভাষার সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে, এই প্রভেদ না থাকিলে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপির প্রাচীনতা অন্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম। এই একটি মাত্র পদই যে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের অনুরূপ, তাহা নহে। বিস্তর-পদে চণ্ডীদাসের পরিচিত সুর আমাদের কর্ণে বাজিয়া উঠিতেছে, সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণের পরিশিষ্টের ১০ পৃষ্ঠায় "মাকড়ের হাতে নারীকল। খাইতে সাধ, ভাঙ্গিতে নাহি বল।" এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৭২ পৃষ্ঠায় "মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকেল" প্রায় একরূপ।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বহুছত্রে আমাদের চণ্ডীদাসের পরিচিত পদ মনে পড়ে, যথা—

(১) "সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ৩৬৭ পৃ.

(২) যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়ি হাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ৩৪৪ পৃ.

(৩) যে ডালে করো মে ভরে সে ডালে ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে ৩৭২ পৃ.

(৪) একেঁ দহদহ ঘসির আগুন,
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি অলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩৪৯ পৃ.

(৫) তোহ্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিণী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ॥ ৩৬২ পৃ.

(৬) সাগর সঙ্গম জলে।
তেঁজিবোঁ মো কলেবরে।" ৩৬৮ পৃ.

কৃষ্ণকীর্ত্তনের এইরূপ বহু স্থানে আমাদের চির-পরিচিত কবির পদের প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠে। এখন আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান যুক্তির অবতারণা করিব।

চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন,—কৃষ্ণকীর্ত্তন যে তাহার অনেক নিম্নে! এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক-কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য কোথায়? এ যে গ্রাম্য ব্যভিচারী প্রেমের শীলতাশূন্য আবর্জ্জনা; এখানে সে ব্যোমস্পর্শী পবিত্রতা কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যুথিকাশুভ্র নির্ম্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্র-পট, আঁধারে

ছিল—ভাল ছিল ; চণ্ডীদাসকে যে এই কীর্ত্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল ; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়।

দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যার এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার রুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে ; জীবনেও পদ্মাবতী নাম্নী এক "সেবাদাসী" তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, সেক-শুভোদয় গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় যে, পদ্মাবতী লক্ষ্মণসেনের সভায় নৃত্য করিতেন। বনমালী দাসের জয়দেব-চরিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, এই রমণী পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। "পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" পদেও দৃষ্ট হয়, ইনি নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব তাহার তাল রক্ষা করিতেন। এই জন্যই জয়দেব "নবরসিকে"র একজন, বিবাহিত পত্নী দ্বারা সে উপাধি লাভ ঘটিত না। দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলিতে এই ভাবের পর-রমণীর প্রতি আসক্তির জয়-গীতিকা ঘোষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গ-রমণীগণের প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য এক তাম্রশাসনের কবি তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, ধোয়ীকবির পবনদূতে তিনি এই ভাবের দ্বিতীয় একখানি প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। এই যুগের তাম্রশাসন-গুলিতে হরপার্ব্বতী বন্দনায়, তাঁহাদের হাব-ভাব ও পরস্পরের আলিঙ্গন-বদ্ধ প্রেম-লীলা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা শীলতার অভাব ও রুচির বিকার সূচনা করিতেছে। সাহিত্যপরিষদে চিত্রশালায় হরপার্ব্বতীর সেই সময়কার একখানি বীভৎস প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিসমূহের দিকে চাহিতে চক্ষু লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শীলতা ও সংযম অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

রাজসভায় যে ভাব-বিকার উপস্থিত হয়, সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌঁছায়,—তখন তাহা অতি বিকট হয়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি ঘোর রুচিবিকার দেখা গিয়াছিল। আমার ধারণা যে, সেনবংশের পতনের পর কামরূপ ও মিথিলা এই দুই কেন্দ্র হইতে রুচির ধারা সমস্ত বঙ্গদেশে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কোচবিহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি,—তাহার নাম কৃষ্ণ-ধামালী ; ইহা দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর নাম "আসল" ও অপর শ্রেণীর নাম "শুকুল" (শুক্ল)। "আসল" ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে,—তাহা এত অশ্রাব্য যে গ্রামের ভিতরে তাহা গাহিবার প্রথা নাই। এই কৃষ্ণ-ধামালীই যে বঙ্গদেশের জনসাধারণের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার তৃষ্ণা এক সময়ে মিটাইয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই—প্রাচীন রাজবংশী জাতি এবং যোগীরা বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকা এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

"আসল কৃষ্ণ-ধামালী" সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু "শুক্লা" ধামালীকে সুন্দর করিয়া, সাধু-ভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-ধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি বর্ত্তমান যুগের কবি এবং ভবিষ্যৎ যুগের নির্দ্দেশক। তিনি স্বীয় যুগকে আঁকিতে যাইয়া হঠাৎ দিব্য সংজ্ঞা বলে ভাবী যুগের ছায়াপাত করেন। চণ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? তিনি সে যুগের বাঙ্গালা-ভাষার অমার্জ্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন, সেই আলো তাহার লালসার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছিল এবং সেই আলোকপাতে "তাঁহার রাধা-বিরহ" অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। "জন্মখণ্ড", "তাম্বূল-খণ্ড", "দানখণ্ড", "বৃন্দাবনখণ্ড" - গাহিতে গাহিতে তিনি বাগ্দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে "রাধা-বিরহ" আশ্চর্য্যরূপ উপাদেয় হইয়া উঠিল। এখন রামীর দুর্ল্লভপ্রেম সেই মন্ত্রের প্রেরণা দিয়াছিল কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।

শুধু তাহাই নহে, আমরা বারংবার জানিয়াছি যে চণ্ডীদাস বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা নকুল আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। নরহরি সরকার চণ্ডীদাস বন্দনায় তাঁহাকে "পরম পণ্ডিত" ও "সংগীতে গন্ধর্ব্ব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে সেই পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আমরা বিশেষ কিছু পাই নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা তদুচিত সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক (১২৫টি) পাইতেছি, তৎকৃত গীত-গোবিন্দ ও ভাগবতের

অনুবাদ পাইতেছি। সুতরাং একদিকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে যেরূপ গ্রাম্যভাব ও ভাষার পরিচয় পাইতেছি, অপরদিকে সেইরূপ পাণ্ডিত্যের বিশেষ নিদর্শনও পাইতেছি। সেই যুগের 'কু' 'সু' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সেই যুগের কবির নিকট আমাদের প্রত্যাশা করাই উচিত। নতুবা গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-ধামালীর সঙ্গে কবিবরের যোগ বুঝিতাম না। তাঁহাকে আকাশের উচ্চস্তরে গান করিতে দেখিতাম, কিন্তু যে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তিনি বিমানবিহারী হইয়াছিলেন তাহার সন্ধান না পাইয়া চিরবিস্ময়েই থাকিয়া যাইতাম। চণ্ডীদাসকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের গুণে বুঝিতে পারিতেছি। ধরাতল হইতে উত্থিত হইয়া তিনি কিরূপে ধরাতলের উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক কিরূপে গৌরবের তুঙ্গে গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল—তাহা এখন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ক্ষীণ পঙ্কিল স্রোতঃ গায়ে ধূলি কাদা মাখিয়া পল্লীপথে যাইতে যাইতে সহসা কিরূপে সমুদ্রের মোহনায় যাইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করে, তাহা দেখিতে পাইতেছি; পাড়াগাঁয়ের পথ দিয়া আসিয়াছে বলিয়া সে এখন আর পাড়াগাঁয়ের কেহ নহে। সে এখন অনন্তের অঙ্গ। কবি পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়া জয়দেব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি তখন বলিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রে বলে সূর্য্য পদ্মিনীর নায়ক, কিন্তু হিমে যখন পদ্মিনী শুকাইয়া মরে, তখন সূর্য্য সুখে থাকেন, এ কেমন ধারা প্রেম?"; "তোমাদের শাস্ত্রে বলে ফুলের বঁধু ভ্রমর, 'না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল?' এ কেমন ধারা প্রেমের আদর্শ?"; "শাস্ত্রে বলে, চাঁদ ও চকোর প্রণয়ী, দুইজনের পদমর্য্যাদা এক নহে, এরূপ অসম যুগলের মধ্যে কি প্রেম হয়?" শ্লোকে আছে জ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্র ঝরিয়া পড়ে, যেমন ফল হওয়ার হেতু ফুল, কিন্তু ফল হইলে ফুল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম জন্মিবার পরে তিনি একদিকে যেরূপ পল্লী কবির ভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, পাণ্ডিত্য হইতেও তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রেম যে কত বড় জিনিষ তাহা তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন অন্য কোন কবি সেরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। *"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের প্রকৃতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনয়ে তারে॥" * এই প্রেম-সাধনাই ভগবদ্ভক্তির মূল। প্রেম অখণ্ড;—জননীর স্নেহ, জনকের আদর, পত্নীর প্রেম, —সমস্তই এই ভাবের স্ফূর্ত্তি, ইহাদের উপর বিভিন্ন নামের শিল মোহর

দেওয়া—ইহাদিগকে পৃথক করা প্রেম-বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে, এই বুঝাইবার জন্যই যেন তিনি রামীকে "পিতৃমাতৃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রণয়ী কোন কারণেই স্বীয় ভালবাসার বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারেন না। * "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গায় যে। সাধন অঙ্গ না পায় সে।" * প্রেম-পাত্র যাহাই করুক না, সে কোন অবস্থায়ই ত্যজ্য নহে। এইরূপ কথা আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি মানুষ হইতে বড় দেবতা কল্পনা করিতে পারেন নাই। এইজন্য বলিয়াছেন ঃ— * "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" * তিনি লিখিয়াছেন—শত শত বাশুলী তাঁহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া যে জ্ঞান দিতে পারিতেন না,—রামী তাঁহাকে তাহা দিয়াছে। বাশুলীপূজকের মুখের উক্তি কি নির্ভীক, কি সত্য !

যদিও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রুচি গর্হিত, ভাব গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট, তথাপি এই পুস্তক যিনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহার চক্ষে পাড়াগাঁয়ের অমার্জিত কিন্তু অকপট সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইবে,—আদর্শের খর্ব্বতা তাঁহাকে সেই গ্রাম্য-রস উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। যে পদটি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মণিহারে সেই কৌস্তভটি এখানে দেখাইবার সুযোগ পরিত্যাগ করিব না। পৃথিবীর সমস্ত গীতি-কবিতার করুণা ও মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতায় যেন ইহার সৃষ্টি ; ঠিক এই পদের অনুরূপ পদ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে আছে,— * "কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও। বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও।" * প্রভৃতি পদের সঙ্গে মিলাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই শ্রেষ্ঠ পদটি পাঠ করুন।

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২৯৪ পৃঃ

সেই বংশীধর আনন্দস্বরূপ, তিনি নিজের আনন্দে গান করিতেছেন, তাঁহার সেই বাঁশীর স্বরে আমার কুল মান তাঁহার পদে বিকাইয়া দিয়াছি। আমার সাধ হইতেছে, তাঁহার পদে নিজেকে নিছিয়া ফেলিয়া দাসী হইয়া থাকি। সেই স্বর শুনিয়া চোখের জল দিনরাত্রি পড়িতেছে। বড়াই, তুমি বল তিনি কে, আমি তাঁহার পদে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে মধুর আহ্বানে যেন চুলের মুঠি ধরিয়া গৃহ হইতে পথে বাহির করিতেছেন?

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি যে বিশেষ প্রামাণিক তাহার একটি নিদর্শন এই যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা বিষ্ণুপুর রাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। ইহা সকলেই জানেন যে, বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবদের একটা বড় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই রাজভায় থাকিতেন, তাঁহারা কোন জাল বৈষ্ণব-পুঁথি সেই লাইব্রেরীতে কখনই স্থান দিতে সম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক হস্তলিপি মনে করিয়াই সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর কি তৎপরবর্ত্তী কোন রাজা উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সময় হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে কবির কীর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-গণের মধ্যে কোন ভুল ধারণা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

চণ্ডীদাসের অপরাপর পদের তুলনায় যদি এই কৃষ্ণকীর্ত্তন সাধারণতঃ হীন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়, তাহাতেও উহা অবিশ্বাস্য বলিবার কোন কারণ নাই। যে হোমারের অমর কীর্ত্তি ইলিয়ডের যশঃপ্রভায় সমস্ত য়ুরোপ আলোকিত, তিনি বাল্যকালে ভেকের গল্প লিখিয়াছিলেন। যিনি চাইল্ড হেরল্ড ও ডন জুয়ান লিখিয়া স্কটের যশঃপ্রভা স্বীয় প্রতিভা-চন্দ্রের নিকট শুকতারার মত মলিন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি বাল্যে "আলস্যের অবসর" (Hours of Idleness) কাব্য লিখিয়া সমালোচকের কশাঘাত খাইয়াছিলেন। স্বয়ং রাম-প্রাসাদ, যাঁহার ধর্ম্ম-সংগীত হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, বাল্যে বিদ্যাসুন্দরের পঙ্কে ডুবিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে যে প্রেমিক-যুগল সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ও বিষবৃক্ষ একই হস্তের দান বলিয়া কাহার মনে হইবে?

কেহ কেহ কৃষ্ণকীর্ত্তনকে খাঁটি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আগ্রহে তাহার সমস্ত প্রচলিত পদগুলি জাল বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। প্রচলিত পদের মধ্যে

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ বেশী পাওয়া যায় না, সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস্য, রামীর সঙ্গে তাঁহার প্রেম উপকথা, উহাতে কোন সত্য নাই,—এই ভাবের উক্তি হইতে বিস্ময়কর যুক্তি আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষের মানচিত্রে যদি কামস্কট্‌কা না থাকে তবে কামস্কট্‌কার অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব, এ যুক্তি কতকটা সেইরূপ। নরহরি সরকার সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খৃ. অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের ধুবনীর প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের পদ সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কারণ তিনি উহা দিনরাত্র শুনিতেন; নরহরি সরকার স্বয়ং লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ চৈতন্যের শৈশবাবস্থায় এই সমস্ত গান বিশ্বব্যাপক হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বৈষ্ণবেরা এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং ৪৫০ বৎসরের নজির পাওয়া গেল। চৈতন্যদেবপ্রমুখ সকলেই কি চণ্ডীদাসের জাল কবিতা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন? কারণ, চৈতন্য-প্রভুর প্রিয় গানগুলি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এইগুলিকে এখন "জাল" বলা হইতেছে। যাঁহারা বলেন চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, তাঁহাদের কথা বরং কতকটা সত্য হইতে পারে।

চণ্ডীদাসের মৃত্যুসম্বন্ধে আমরা বহুপূর্ব্বে বীরভূম জেলায় প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। প্রবাদটি এই,—

"নান্নুরে বাশুলীমন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহের চিহ্নাদি সহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবনবিজয়ী কীর্ত্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়-মন্ত্র—তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাহেবের বেগম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোনক্রমেই বেগমসাহেবাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর, সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মর্ম্ম-প্রবেশী সংগীত তাঁহার লজ্জা ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।"

নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হইতেছিল, তখন সহসা প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব-সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন।"

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা, ২৭ পৃ.।

সুখের বিষয় চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি সম্বলিত একটি প্রমাণ বসন্তবাবু সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা রামীর রচিত একটি গীতিকা, কবিতাটি সাহিত্যপরিষদের পুস্তকাগারে আছে এবং উহা মৎকথিত উক্ত প্রবাদকে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছে। এই পদটি আমরা রামীর রচনার উদাহরণ স্বরূপ অন্যত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন। সেই গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হন। নবাবের নিকট তিনি নির্ভীকভাবে এই কথা স্বীকার করেন। নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে এইরূপ কশাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণহননের দণ্ডাজ্ঞা ছিল; সুতরাং রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বেগম এই দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হন। সেই মূর্চ্ছা তাঁহার ভঙ্গ হইল না। বেগমের মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি মৃতদেহের পদযুগল স্পর্শ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন।

এই অপূর্ব্ব শোক-গীতিকা হইতে ইহাও জানা যায় যে, চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামী অনুযোগ দিয়া বলিতেছেন, "বাশুলী তোমায় শুধু আমাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন?"

বোধ হয় ক্রুদ্ধ নবাব কর্ত্তৃক প্রবাদোক্ত বাশুলী মন্দির ধ্বংস পরে সাধিত হইয়াছিল।

একটি দেশব্যাপী জনশ্রুতি যখন দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপিসম্বলিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দেখিতেছি না।

রাণী বাদশাহ্‌কে বলিয়াছিলেন—"যাঁহার সুস্বরে ভুবন মুগ্ধ—যিনি প্রেমের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-স্বরূপ, তাঁহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না, তাঁহাকে বিনষ্ট করিলে পৃথিবীতে এ লজ্জা রাখিতে পারিবে না।" রামী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাজ-পাটে বসিয়াও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক।" কবির এই দুই প্রেমিকার কণ্ঠের ধিক্কার বাণী আজ সমস্ত বাঙ্গালী জাতি গৌড়ের বাদশাহের প্রতি প্রয়োগ করিবেন এবং বাঙ্গালার ইতিহাস-লক্ষ্মী যদি সেই সম্রাটের নামটি একবার বলিয়া দেন, তবে আমরা তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্চগব্যে শোধন করিয়া গৃহে স্থান দিব।

রামীর পদ

প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রস্রবণস্বরূপ রজকিনী রামীর পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রামীর ভণিতাযুক্ত পদ আমরা চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদের সারল্য ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য বটে।

১. "কোথা যাও ওহে, প্রাণ-বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথি, ক্রুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জালিয়া, যদিবা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ॥"

২. "তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডলশোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি অঁাধার॥"

রামীর পদ দুইটির মধ্যে আমরা একটুকু আধ্যাত্মিকত্ব খুঁজিয়া বাহির করিব,—প্রথম পদে * "মথুরা যাইবে" * 'পদটির অর্থ 'সমাজে উঠা' ও * "তোমার সারথি ক্রূর অতিশয়" * পদে অক্রূরের নামে নকুলঠাকুরের হৃদয়-হীনতার উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চণ্ডীদাসের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখখানি দেখিবার সুবিধা পাইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পদটিতে চক্ষের নিমেষ থাকার সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে বর্ণিত চক্ষুসম্বন্ধে আক্ষেপোক্তির একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়। সুতরাং এই রচনা চণ্ডীদাসের বহু পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত পদটির ভাব হয়ত বহু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার পল্লী-গাথায় বিদ্যমান ছিল। রামী ধোপানীকে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-কবি বলিয়া গ্রহণ করার পূর্ব্বে কতকটা আলোচনার প্রয়োজন।[১]

[৩] চণ্ডীদাসের মৃত্যু

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস।

চাতকি পিয়াসীগণ না আইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ, ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ-মঞ্চ[২] পাতালপুর আবির্ভূ'ত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান॥

---

১. কিন্তু চণ্ডীদাসের মৃত্যুর কাহিনীর সুপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে রামীর ভণিতা পাইয়া আমাদের মনে হইয়াছে, এই পদ দু'টিও তাঁহারই রচনা।

২. মঞ্চ=মর্ত্ত্য।

গান শুনি পার্চ্ছার[১] বেগম
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডীদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্যা ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাণিত হস্থি আনি পিষ্ঠে পেলি[২] বান্ধ টানি
পিষ্ঠে খুদে বৈরী ছাড় গিয়া।[৩]
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালন্তে[৪] না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রাণি কহে ছাড়িয়া না জায়।[৫]
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান
হুঁহু প্রাণ একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥
স্থন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালঙ প্রাণী
এবার তরাবে তুমি মোরে।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য[৬] এ রাজা গুঁয়ারে[৭]।
আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি শত ডংসে[৮] গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকি এ আত্মাভাবে।
এই করি আস মনে উর্ধ্বারিবে পতিত জনে
সে তবে দুর্ল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ জায়
কে দায় করিবে মোর হীত।

১. পার্চ্ছার=পাৎসাহের।
২. পেলি=ফেলি।
৩. পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া শত্রুকে বধ কর।
৪. ভালন্তে=ভাল করিয়া।
৫. জায়=যেও।
৬. মাল্য=মরিল।
৭ গুঁয়ারে=নিষ্ঠুর।
৭. ডংসে=দংশে।

কান্দি কহে চণ্ডিদাস দস দসার আস
পুনু কর রজক কুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে য়াস্থ তবে প্রাণে মরি ॥ ২ ॥
স্থন বন্ধু চণ্ডিদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত
সভাতে গাইলে গীত
মনের মরম করি সার।
অনুরাগে কি না করিলে ফুৎকার।
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে।
আসক আনলে পড়াইলে ॥
বৈরি কাটে তোমার গায়।
তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল।
রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥
পরসিত এ জনার মন।
কতেক করাছ কদর্থন[১] ॥
রামি কহে যদি সঙ্গে নিবে।
তুরিতে পরাণ তেজ তবে ॥ ৩ ॥
স্থন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্মফাঁস না যায় খণ্ডন ॥
ছাড়ি পরিবার মোর সঙ্গ কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাস্থলি বচন না কৈলে সঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত ॥
আমা মুখ চাঞা গজপিষ্টে স্থঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।

১. কদর্থন=কষ্ট।

রাজা গৌড়েশ্বর দুষ্ট কলেবর
কেহ না বুঝাল তাকে ॥
নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না স্থনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা।
স্থদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুণ সঞ্চান ঘাতে।
এ দুস্থ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে ॥
কহেন রামিণী স্থন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাস্থলি বচন, করিলে লংঘন
স্থনহ রসিক পতি ॥ ৪ ॥
পার্চ্ছার বেগম কয়
স্থন মহিনাথ মহাশয় ॥
তুমি অবলার বচন রাখ।
রসিক মণ্ডল দেখ ॥
আমি সে অবলা নারি।
তোমারে কহিএ বিনয় করি ॥
জোড় করে কহে রামি ॥
স্থন নৃপ চূড়ামণি।
স্থন রসের স্বরূপ সে ॥
কেন বিনাস করহ তাহার দে।
সে সামান্য মানুষ নহে।
রতি স্থিতি তার দেহে।
জাহার সুস্বর গানে।
বিন্ধিল আমার প্রাণে ॥
কেন কৈলে এমন কাজ।
ভুবনে রাখিলে লাজ।

রাজা হে জবন জাতি।
কি জানে রসের গতি।
চণ্ডিদাস করি ধ্যান।
বেগম তেজিল প্রাণ।
স্থহি শ্রস্তা[১] ধবিনি[২] ধায়
পড়িল বেগম পায় ॥ ৫ ॥

একখানি পাতা। উপকরণ—তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তি, অক্ষর প্রাচীন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ পুস্তকাগারে রক্ষিত।

গৌড়ের এই সম্রাট্ কে? আমার মনে হয়, রাজা গণেশের পুত্র যত্নই (জালালউদ্দিন) চণ্ডীদাসহন্তার কুপ্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছেন। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী ও স্বজাতি-দ্রোহী। বিশেষ তাঁহার অন্দর মহলে অনেক হিন্দু বেগম ছিলেন, তাঁহারা যদিওবা স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীতের অনুরাগিণী হওয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন একটিরই হওয়া স্বাভাবিক। অন্ততঃ খাঁটি মুসলমান রমণী হইতে তাঁহাদেরই হিন্দুগানের সমজদার হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। জালালউদ্দিনের রাজত্বকালও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক।

গ। বিদ্যাপতিঠাকুর

মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইহাদের গাঞি 'বিষয়িবারবিস্ফী', সুতরাং বিদ্যাপতিঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত ও জাঁকালো রকমের—'বিষয়িবারবিস্ফী বিদ্যাপতিঠাকুর' মহারাজ শিবসিংহের সভাসদ্ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন। শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সম্মেলন হইয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পরিচয়।

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে 'বিস্ফী' নামক গ্রামখানি প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তদ্বংশীয়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সৌরাটি নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ এখন বিদ্যমান আছেন।

১. শ্রস্তা—ত্রস্তভাবে। ২. ধবিনী—ধুবনী, রজক-কন্যা।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্‌ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরম সুহৃৎ গণপতিঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতিঠাকুর[১] বিদ্যাপতির পিতা। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর-প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বীরেশ্বরপদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকরকর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল "মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক"। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির উর্দ্ধতন ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের মতে কর্ম্মাদিত্য) হইতে সকলেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

পূর্ব্বপুরুষগণের খ্যাতি।

মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ণ নাম 'রূপনারায়ণ-পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।' রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈবসর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে তৎকর্তৃক 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাঁহার সর্ব্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ভৈরবসিংহ মহারাজের (হরিনারায়ণ) রাজত্ব সময়ে যুবরাজ রামভদ্রের

কবির গ্রন্থাবলী।

---

১. "জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে,
বিদ্যাপতি ইহা ভাণ॥"

পদসমুদ্র।

(রূপনারায়ণ) উৎসাহে বিরচিত হয়।[১] পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি 'দানবাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[২]

কবি সম্বন্ধে তর্ক।

বিদ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাম্রলিপি ও মিথিলার রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানারূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদানপত্রের কাল ১৪০০ খৃ. (২৯৩ ল-সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ খৃ.। সুতরাং শিবসিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূর্দ্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৩ বৎরেরও অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নবজয়দেব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নবযুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান। ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃ.) কবি বিদ্যাপতি 'মহাপণ্ডিত' উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২৭ খৃ.) তাঁহাকে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে হয়। আর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে ঐ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়সে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করিতে হয়। বিদ্যাপতির কবিতায় শেষোক্ত রাজার নাম দেখিলেই তাঁহার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ নাই, যেহেতু রাজা হইবার বহু পূর্ব্বে নরসিংহদেব যুবরাজ অবস্থায় কবির সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন।

---

১. দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় "স্বস্তি" স্থলে "অস্তি" পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

২. "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার
কোটি হুঁ ন ঘটয় দিবস অভিসার॥"

Grierson, Maithil Songs, J. B. A. S., Extra No. 193

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন' ছিল,—"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" প্রভৃতি পদ দৃষ্টেও সেরূপ বোধ হয়।

এরূপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখিবার সামর্থ্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়; বিক্ষী গ্রাম দানকালে কবির অন্যূন ২০ বৎসর বয়স এবং 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে তাঁহার অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়স—দুই কষ্টকল্পিত "অন্যূনের" সাহায্যেও এই জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠায় এইরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

ভূমিদানপত্রের সত্যতা।

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছিলেন:—

"এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্তভাগে আরও ৩টি অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা—সন (হিজরি) ৮০০ ॥ সম্বৎ ১৪৪৫ ॥ শাকে ১৩২১ ॥ আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টি অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোন সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজরি সন, বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।"[১]

অল্পদিন গত হইল, শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব ভূমিদানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদানপত্রে যে সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত করেন। আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভূমিদানপত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, অথচ তাহাতে সেই অব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাম্রলিপির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, তাম্রলিপির অক্ষর;—উহা দেবনাগর, কিন্তু তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাম্রশাসনে যে

১. ভারতী, ১২৮৯, আশ্বিন।

অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিলী। সে সময়ের লিপিমালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাম্রলিপিব্যবহৃত অক্ষর যে সে সময়ের নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাম্রশাসনখানি জাল, কিন্তু উহা এক হিসাবে জাল নহে। আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়; রাজা টোডরমলই তাহার অনুষ্ঠাতা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ যে ভূমিদানপত্রের বলে বিস্ফী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের নিকট যে একটি নকল ছিল, সেই নকল দৃষ্টে নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকিবে এবং আকবর প্রবর্ত্তিত সনটি তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্ফী গ্রাম তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত পদেই জানা গিয়াছে —শুধু রাজকর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বিদ্যাপতির বংশধরগণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাম্রশাসন প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। ইহাও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট এ অনুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে।

রাজপঞ্জী।

রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সিংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ অব্দ, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির নিজকৃত একটি মৈথিল পদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যায়, শিবসিংহ ১৪০০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন;—

"অনল রন্ধ্র কর লক্খণ ণরবই সক্ক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিআে বার বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
দুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুণ্ণ বলিও।
সতবলৈ গঙ্গা মিলিককলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিস যবন সকল দল চলিও একদিস সোঁ জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পূরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
সুরতরুকুসুম ঘালি দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাধ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভৈঁ গগন ভরু॥
আরম্ভীঅ অন্তেট্টি মহামখ রাজসূঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘর দান কহাঁ॥

বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্টো উছবৈ বিসরি গও॥[১]

"হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্বে রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধ-ভাগী হইয়াছেন। রাজ্য রাজশূন্য হয় নাই, তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে,—দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরুকুসুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।"

রাজপঞ্জীর নির্দ্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের আরও নানারূপ আপত্তি আছে।

আর দুইটি প্রমাণ।

এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর দুইটি প্রমাণ বাকী। মিথিলার তদানীন্তন রাজধানী গজরথপুরে শিবসিংহের সভাসদ্ বিদ্যাপতি ঠাকুরের আদেশে একখানি সংস্কৃত পুঁথি (কাব্যপ্রকাশের টীকা) দেবশর্ম্মা নামক জনৈক বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার এইরূপ:—

"সমস্তবিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সম্ভুজ্যমান-তীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীবিদ্যাপতিনামাজ্ঞয়া গৌয়ালসং শ্রীদেবশর্ম্ম বলিয়াসসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা পুস্তীতি ল সং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির কালসমস্যায় একটি নূতন আলো প্রদান করিয়াছেন। এই পুঁথি ১৪৯৮ খৃ. অব্দে লিখিত হয়। কবিরচিত "লিখনাবলী" নামক সংস্কৃত পুস্তকে ২৯৯ ল সং অথবা ১৩৩০ শকের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়; এই গ্রন্থ

১. পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩০-৩১ পৃঃ।

কবির পরিণত বয়সের লেখা বলিয়া মনে হয়; তাহা হইলে ঐ শকে অর্থাৎ ১৪০৮ খৃ. অব্দে কবি প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি বিচার করিয়া আমরা কবির জীবনকালসম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিব।

প্রথমতঃ, কবির আদেশে দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত কাব্যপ্রকাশের টীকার নকল। ইহা ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই সময়ে কবির বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ বিদ্যাপতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে আদেশ করিয়া কাহারও দ্বারা পুঁথি নকল করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, ইহা অবশ্য একটি অনুমানমাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, তদ্‌রচিত সংস্কৃত লিখনাবলীতে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ।

তৃতীয় প্রমাণ, কবির স্বহস্ত-লিখিত ভাগবত, উহা ১৪০০ খৃষ্টাব্দের লেখা।

চতুর্থ প্রমাণ তাঁহার পদাবলীতে নসির শাহের উল্লেখ। নহির শাহ্ ১৪২৬ হইতে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপঞ্জীর সন তারিখ সম্বন্ধে অনেক গোল আছে। ভূমিদানপত্রের ১৪০০ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত তারিখগুলির সমন্বয় করা যায়। সুতরাং যদি বলা যায়, কবি ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সকলগুলি প্রমাণ দ্বারাই আমাদের আনুমানিক সময় সমর্থিত হইতেছে।

কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী।

খাস মিথিলায়ও বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব।[১] মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠও বিকৃত, সুতরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলীদিগের দাবী তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চবিভাগের এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্মণাব্দ

১. সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রচলিত ছিল, ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীকবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠ-বিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অনুচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিলে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন। আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি দাঁড় করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার শিষ্যত্ব আমাদের নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল—সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলারাজ ইক্ষাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলবস্তুতে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বীপের অজেয় টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। 'বৃজ্জি' প্রাচীন মিথিলার এক ক্ষত্রিয় বংশের শাখা। কেহ কেহ বলেন ব্রজবুলি এই বৃজ্জিদের ভাষা, এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ "এক বাঙ্গালী, দোসর তোতরাহ"[১] বলিয়া যদি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহ্য করা আমাদের অনুচিত হইবে না।

মিথিলার ঋণ।

আমরা ঈশাননাগর-কৃত অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি এবং অদ্বৈতপ্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বিদ্যাপতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই। অদ্বৈত ১৪৩৪ খৃ. অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্ণিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার বয়স ২০/২১ বৎসর ছিল, সুতরাং ১৪৫৫ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে এই দেখাশুনা হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ

বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতাচার্য।

১. বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা ৮০।

ছিলেন ও তাঁহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগরাগিণ্যাদি উৎকৃষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম বিশ্বাস কি ছিল, জানা যায় নাই। তিনি 'দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্ম্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন। বিস্ফীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখনও আছেন। কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবতখানি বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রীতির সাক্ষী,—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস। একটি শিব-বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, "হরি উৎকৃষ্ট চাঁপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি সামান্য ধুতুরা ফুলেই প্রীত হও।" তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন। একটি সুন্দর চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্টভাবে মনে উদয় হইত—তাই তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর। নায়িকার সুন্দর চোখ দু'টি তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন, দেখুন, * কজ্জল-শোভিত সলিলার্দ্র চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ঈষৎ সিন্দূরের লেপ পড়িয়াছে[1]; চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছে না[2]; কজ্জলযুক্ত চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণতারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে।[3]

বিদ্যাপতির উপমা।

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর সুন্দর

---

১. "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥"

২. "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"

৩. "চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥"

পদার্থগুলি পৃথক্ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। চাঁপাফুলের ঘ্রাণেও বেহাগ-রাগিণীর কথা মনে পড়িতে পারে। এ সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন। জগতের এই লতাপুষ্পপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য। সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমাযোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি —সৌন্দর্য্যের একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইরূপ,—

"রাধা কখনও (বালিকা-সুলভ উচ্চহাস্য) হাসিয়া ফেলেন, কখনও (নবাগত যৌবনের ভাবে) তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি খেলা করে। কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাঁহার গতি (যুবতীর ন্যায়) মৃদুমন্দ ; ফুলধনুর পাঠশালায় ইনি নূতন শিক্ষার্থী ; নিজের শরীরের প্রতি আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিষয়ক কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিকে নত করিয়া একাগ্র-কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন ; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ-বিন্যাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেমসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই দিকে আকৃষ্ট হন।"[৪]

---

৪. "ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥"
"হৃদয়জ মুকুল হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥"
"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥

আর একখানি ছবি লজ্জার ;—

"একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথালুভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে কৃষ্ণ (কমলনয়ন) গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক্ ঢাকিতে অন্যদিক্ মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই, * * * কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিতে পাইলেন।"[১]

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গির ছবি দেখিয়া কবি আলো চিত্র তুলিয়াছেন। তুলির আঁকা বর্ণ মুছিয়া যায়, কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না ; তাই ৫০০শত বৎসর পরেও এই নারী চিত্রগুলি সদ্য প্রস্ফুট মালতীর ন্যায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায়—

বিরহ। শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমেবাঁধা আট-সাঁট নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা জীবনের চাঞ্চল্য দেখাইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহানন্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি

ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥"
"মুকুর লেই যব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে···বিহার॥"
"শুনিতে রসের কথা থাপরে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥"

১. "একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
* * *
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥"

রুচির অনুরোধে আমরা অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। তজ্জন্য আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই। নিখুঁত সুরুচিসম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ-মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য প্রভৃতি অধ্যায়ে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।

বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর কবিতায় এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।[১]

শ্রীহরি মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা ম্রিয়মাণা, কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার হাত দু'খানি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া রাধা যেন না বলিয়াই বুঝাইলেন, "আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না।" কৃষ্ণ সেইরূপ শপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিলেন। বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, রাধার শুষ্ক ও শীর্ণ কুসুমকান্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্ষু রাধিকা কাতরে বলিতেছেন,—

"চন্দ্রকরে নলিনীলতা শুকাইয়া গেল, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে? তপনতাপে অঙ্কুর জ্বলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে? হরি হরি, একি দৈব দুঃখ! সিন্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দূর করিবে? আমার কর্ম্মদোষ ভিন্ন চন্দনতরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে কেন? চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন এবং চিন্তামণি স্বগুণহারা হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না এবং কল্পলতিকা আমার পক্ষে বন্ধ্যা হইল।"[২]

কৃষ্ণের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধার মৃত্যু-যাতনাও আমাদিগকে অনুরাগ-মাধুর্য্যে মোহিত করে। সে বিরহ-কথা মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা বিশ্বাস-মধুর

---

১. ইঁহাদের মিলন সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি প্রাচীন পদ আছে, তন্মধ্যে 'রূপনারায়ণ' নামক সঙ্গীর উল্লেখ আছে। ইনি যে শিবসিংহ তাহা নিশ্চয়রূপে কিছুতেই বলা যায় না। এই উপাধি বা নামে একমাত্র শিবসিংহই পরিচিত ছিলেন না।

২. "হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী-মাসে॥
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।"
"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।"

এবং মৃত্যুর বিভীষিকা হরণ করে। * "শ্রবণহুঁ শ্যামনাম করু গান। জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥" * প্রভৃতি কেমন মিষ্ট! সেই চিরশ্রুত "নারায়ণং তনুত্যাগে" চরণার্দ্ধ মুমূর্ষু ভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, ইহাও কি তাহারই কবিত্বময় রূপান্তর নহে?

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে। বিরহের দুঃখের পর মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির গীতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের উক্তি পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে। রাধিকা চন্দ্রকিরণে কোকিলের কুহুস্বরে পাগলিনী হইয়াছিলেন—এখন বলিতেছেন— * সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক।[১]

কৃষ্ণ আসিবেন—প্রাণবঁধুকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে প্রীত হইবেন এবং তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু সরল মর্ম্মের কথা—যাহাতে প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইয়া সাড়া দেয় এবং যাহার অবিসম্বাদিত দাবী চোখের জলের উপর—সেরূপ কথা বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস বেশী কহিয়াছেন। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত হইয়াও শিক্ষার আড়ম্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ-মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে।

চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাসপ্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণব

---

১. সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে, তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

"কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কিছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥"

সম্প্রতি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নসমাধানের সময় হইয়াছে, আমরা এ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিতে পারি না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা ধারণা হইয়াছিল, যে সংস্করণে কবি ভণিতাযুক্ত অথবা প্রবাদ বা অনুমান-মূলক কবির পদ বেশী থাকিবে—এক কথায় যে সংস্করণ যত বৃহদাকৃতি হইবে—ততই তাহা উৎকৃষ্ট হইবে।

কোন সম্পাদক বিদ্যাপতির পদসংখ্যা ২০।৩০টি দিলেন, জগদ্বন্ধু ভদ্রের পর গ্রীয়ারসন এবং তৎপর সারদা মিত্র পদসংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, তার পর অক্ষয় সরকার মহাশয় আরও কিছু উপকরণ বাড়াইয়া নৈবেদ্য সজ্জা করিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অতিকায় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এবার সত্যের ক্ষেত্র হইতে অনুমানের রাজ্যে পা দিয়া স্বীয় এলাকা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কথিত আছে বিদ্যাপতির এক উপাধি ছিল 'কবিশেখর', অপর এক উপাধি ছিল 'কবিবল্লভ',—তিনি কবিদের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কবিভূষণ প্রভৃতি উপাধিও তাঁহারই যোগ্য। কে কখন তাঁহাকে এই সকল উপাধি বা ইহাদের কোন একটি দিয়াছিলেন—তাহার ঠিকানা নাই। সম্পাদকগণ এই সমস্ত বিভিন্ন ভণিতার পদ দু' হাতে কুড়াইয়া তাঁহাদের সংস্করণ ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন—ভণিতাহীন বহু পদ তাঁহারা শুধু তাঁহাদের বিমানবিহারী অনুমানের উপর জোর দিয়া বিদ্যাপতির পদান্তর্বর্ত্তী করিয়া লইলেন। এই সকল পদে যদি দুই একটি পদে ব্রজবুলির ছিটা কোঁটা তাঁহারা পান, তবে তো কথাই নাই—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা মিলিয়া যায়,—বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চালাইতে তাঁহাদের আর দ্বিধা মাত্র থাকে না।

যেন বঙ্গদেশে কবিবল্লভ, নৃপবল্লভ, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধি আর কাহারও ছিল না, যেন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বাঙ্গালী কেহ কোন দিন যৈছে, তৈছে, যবঁহু কবঁহু লিখেন নাই।

এই ভাবে বহু বাঙ্গালী কবির পদ গ্রাস করিয়া বর্ত্তমান বিদ্যাপতির সংস্করণগুলি বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছে। অনেক কবির উৎকৃষ্ট পদগুলি বিদ্যাপতির কাব্যসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এত বড় কবি যে, তাঁহার এই ধার করা সৌন্দর্য্য পরিবার কোনই দরকার নাই, অথচ বঙ্গের অনেক কবি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সম্পাদকগণের খামখেয়ালীতে হারাইয়া ফেলিতেছেন।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, "জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু—নয়ন না তিরপিত ভেল" পদটি কখনও বিদ্যাপতির নহে, উহা বাঙ্গালী 'কবিবল্লভ' নামে কোন কবির। নগেনবাবু আমাকে জানাইয়াছিলেন, উহা মিথিলায় পাওয়া যায় নাই। তথাপি কি ভাবিয়া তিনি উহা তাঁহার পদসংগ্রহের শেষে স্থান দিয়াছেন, তিনিই জানেন। বহু পদ খাস বাঙ্গালার, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, অথচ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে, যথা "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।" বাঙ্গালার পল্লীর অলি গলিতে শত শত গানে এই পদটির ভাব বিদ্যমান থাকিয়া উহা যে বাঙ্গালার নিজস্ব তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

অপরের পদগুলি বাদ দিয়া একটি খাঁটি বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া বিদ্যাপতির যে নবকলেবরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বাদ দিতে পারি না। বৈষ্ণব মহাজনেরা উহা করাইয়াছেন, উহাকে ভক্তিগঙ্গায় স্নাত করাইয়া বিদ্যাপতিকে তাঁহারা যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাণ্ডিত্যের পল্লবগ্রাহিতা দেখাইতে যাইয়া আমরা মূঢ়তা বশতঃ পরিহার করিতে পারি না।

কীর্ত্তনের আসরে দেখিতে পাইবেন, বৈষ্ণবগায়কেরা বিদ্যাপতির পদে কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবের আখর দিয়া তাহা আধ্যাত্মিক গৌরবে গরীয়ান্ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ পাতে বিদ্যাপতির রূপে স্বর্গীয়চ্ছটার প্রভা পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটি ভণিতার উল্লেখ করিতে পারি :—"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী। সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি।" বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়ারা শেষ ছত্রে যে আখর দেন, তাহার অর্থ এই :—যেজন কৃষ্ণপদে নিজকে সমর্পণ করিয়াছে—তাহার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হইতেই পারে না। "সুজন"

শব্দকে কৃষ্ণভক্তের আসনে আসীন করাইয়া তাঁহারা পদটি ভক্তিরসাত্মক করিয়াছেন, শত শত পদে এই ভাবের আখর পড়িয়াছে।

৫। সামাজিক ইতিহাস বা কুলজী-সাহিত্য

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যত্নে বঙ্গীয় বিবিধ সমাজের বহুসংখ্যক কুলজীগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট এই উপকরণরাশি বিশেষরূপে মূল্যবান্। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময় এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্ম্মবিধ্বংসী। এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্খলিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাঁহারা গলিত শবের মাংস, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিতেন। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সর্ব্ববিষয়ে এতদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইল, তাহাতে 'আচার'ই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে এখন খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটাআঁটি ও নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধযুগের স্বেচ্ছা-চারিতার প্রতিক্রিয়া। এখন আচার অনেকটা প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যা, যশঃ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন। কৌলীন্যের ইহাই প্রথম লক্ষণ। লক্ষ্মণ সেনের সময় কৌলীন্য বংশগত হইল। বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কুলীনগণ যেরূপ স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বীরোচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ ও বাণীনাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী আমডালা নিবাসী করবংশীয় কোন জমিদার কায়স্থ পদ্মার গর্ভে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার দুই কন্যার

বিবাহের প্রস্তাব করেন; এবং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাঁহাদিগকে পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ পদ্মাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বীয় কৌলীন্য গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। জগন্নাথ প্রাণের ভয়ে জমিদারকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হ'ন। কোন এক পরাক্রান্ত জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করার দরুণ মনের কষ্টে একটি কুলীন বৈদ্য প্রাণত্যাগ করেন, এরূপ কুলজীগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অথচ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিবাহ-বন্ধন দ্বারা কোনও কুলীন ব্যক্তির জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। কুলগৌরবের সামান্য হানি হইত, কিন্তু সেই ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না; কিছুতেই উক্তরূপ বিবাহে সম্মত হইতেন না। বৈদ্য গণবংশীয় এক ব্যক্তি চৌষট্টিখানা গ্রাম উপঢৌকন পাইয়া দাসড়ার দত্তকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হ'ন এবং সেনহাটী নিবাসী অপর এক কুলীন বৈদ্যসম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একটি জমিদার তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বহুবৎসর দরবার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত জমিদার এই উদ্দেশ্যে যখন প্রথম সেনহাটীতে পদার্পণ করেন, তখন কতকগুলি অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি সুবৃহৎ হইয়া যে সময়ের মধ্যে বহু লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইয়াছিল, ততদিনের চেষ্টায় কুলীন বৈদ্য ঐ জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিকষ কুলীনগণ যেরূপ সমস্ত বিপদ্ ও লোভ উপেক্ষা করিয়া কুলগৌরব অটুট রাখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। অথচ, কুলীনগণ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ্‌শূন্য ছিলেন। নানা প্রকার কষ্ট ও দারিদ্র্য যাতনা সহ্য করিয়াও তাঁহারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আদর্শ যতই সামান্য হউক না, যাহা মনুষ্য-চরিত্রকে ত্যাগের গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, যদ্দ্বারা আত্মমর্য্যাদাবোধ উদ্বোধিত হয়, তাহাই সম্মানার্হ। এই হিসাবে বংশগত কৌলীন্য একান্তপক্ষে নিষ্ফল হয় নাই। মুসলমানদিগের বিলাসলোলুপ দৃষ্টি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু নেতৃগণকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কুলজীগ্রন্থে সেই সব বিপদের আভাস আছে। পারিবারিক কলঙ্ক অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করিয়াও হিন্দুসমাজ কিরূপ উদারভাবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা-পূর্ব্বক সমাজবন্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে আমাদিগের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণই থাকিবে না। কুলজীগ্রন্থের কতক কতক বল্লাল

সেনের সময় হইতেই রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় কুলজী-গ্রন্থের অনেকগুলি বিগত ৪০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালায়। সংস্কৃত কুলজীগ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির মধ্যেই বেশী। সেগুলির এস্থলে নাম করিলাম না। অসংখ্য কুলজী পুস্তকের মধ্যে আমরা নিম্নে কতকগুলির নাম দিতেছি :—

(১) দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধ
(২) ঐ কৃত প্রকৃতিপটল-নির্ণয়
(৩) বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ণব
(৪) দনুজারি মিশ্রকৃত মেলরহস্য
(৫) পরিহর কবীন্দ্র-রচিত দশতন্ত্র প্রকাশ
(৬) মেলপ্রকৃতি নির্ণয়
(৭) মেলমালা
(৮) মেলচন্দ্রিকা
(৯) মেলপ্রকাশ
(১০) দোযাবলী
(১১) কুলতত্ত্ব-প্রকাশিকা
(১২) কুলসার
(১৩) নীলকণ্ঠ ভট্টকৃত পিরালীকারিকা
(১৪) নলুপঞ্চাননের কৃত গোষ্ঠী কথা
(১৫) ঐ কৃত কারিকা
(১৬) রাঢ়ীয় সমাজ নির্ণয়
(১৭) রামদেব আচার্য্য-কৃত কুলপঞ্জী
(১৮) কুলানন্দকৃত রাঢ়ী ও গ্রহ বিপ্রকারিকা
(১৯) কুলানন্দকৃত গ্রহবিপ্রবিচার
(২০) শুকদেব-কৃত ঢাকুরি
(২১) ঘটকবিশারদ কান্তিরাম প্রণীত কুলপঞ্জী
(২২) মালাধর ঘটকরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা
(২৩) ঘটককেশরী বিরচিত কারিকা
(২৪) ঘটকচূড়ামণি-কৃত কারিকা
(২৫) ঘটকবাচস্পতি-প্রণীত কুলপঞ্জিকা

(২৬) সার্ব্বভৌম-কৃত ঢাকুরি
(২৭) শম্ভুবিদ্যানিধি প্রণীত ঢাকুরি
(২৮) কাশীনাথ বসু-কৃত ঢাকুরি
(২৯) মাধব ঘটক-বিরচিত ঢাকুরি
(৩০) নন্দরাম মিশ্র-কৃত ঢাকুরি
(৩১) রাধামোহন সরস্বতী-কৃত ঢাকুরি
(৩২) দ্বিজ রামানন্দ-রচিত মল্লিক-বংশ কারিকা
(৩৩) দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসর্ব্বস্ব
(৩৪) একজাই কারিকা
(৩৫) বঙ্গকুলজী সারসংগ্রহ
(৩৬) দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজী
(৩৭) দ্বিজ রামানন্দ-কৃত বঙ্গজ ঢাকুরি
(৩৮) রামনারায়ণ বসু প্রণীত মৌলিক ঢাকুরি
(৩৯) কাশীরাম দাস-কৃত বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরি
(৪০) যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুরি
(৪১) তিলকরাম-বিরচিত গন্ধবণিক কুলজী
(৪২) পরশুরাম-কৃত গন্ধবণিক কুলজী
(৪৩) দ্বিজ পরশুরাম রচিত তাম্বূল বণিকের কুলজী
(৪৪) মাধব-কৃত তন্তুবায় কুলজী
(৪৫) কিঙ্করদাস-প্রণীত সদ্ধর্ম্মাচার কথা
(৪৬) মণিমাধব-কৃত সদ্‌গোপ-কুলাচার
(৪৭) রামেশ্বর দত্তের তিলি পঞ্জিকা
(৪৮) মঙ্গল-কৃত সুবর্ণ-বণিক কারিকা
(৪৯) শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর-প্রণীত ত্রিপুরারাজমালা

এই সকল কুলজী পুস্তক পাঠে বিবিধ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহাতে শুধু সামাজিক কথা নহে, প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক রহস্যেরও ভেদ করা হইয়াছে। আমরা কুলজীপ্রসঙ্গ ইহার পরে আর উল্লেখ করিব না। সুবিখ্যাত কুলাচার্য্য নলুপঞ্চানন বঙ্গীয় সেন-রাজাদিগের জাতিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সেন-রাজাদিগের তাম্রশাসনে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এতদ্‌সম্বন্ধে নলুপঞ্চাননের

অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে পাঠক ঐতিহাসিক সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই অংশটি শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"এক দিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিত্য যাজে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক্ নহি শূদ্রযাজী॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি।
এক ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥
রাজা হলে রাজন্যগণ ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা॥
ভূপাল অনঙ্গপাল আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতির মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত সতী দেখ চেয়ে॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদ জ্ঞান হীন।
যাজক পিণ্ডভোজী প্রথাত অপ্রাচীন॥
বল্লাল কয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথাত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥

* * *

ভূমিপ হইলে সবার ইচ্ছা হয় ক্ষত্র
গৌরব-হেতু "রাজন্য" বলায় যত্র তত্র।
সবারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে॥

* * *

বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥"

(৫৮—৮৯ পৃ.)

উপরের তালিকায় আমরা 'রাজমালা'র নাম উল্লেখ করিয়াছি।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর।

ত্রিপুরার মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃ.) রাজমালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ন্যালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা রাজমালা অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি আমরা একখানি প্রাচীন রাজমালা পুঁথি দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে উক্ত পুঁথি হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি নিম্নে প্রদান করিলাম :—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুঁথি॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
অতঃপর নৃপাচার্য্য না হইয়াছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুঁথি॥
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান॥

সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ-কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী॥
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ-কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ প্রতি॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন॥
রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণমালিকা।
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়॥"

ইতি দুর্য্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না। যে সময় রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখাইবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যযাতি রাজার পুত্র দূর্য্য যার নাম।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্র বংশ সার॥

তাহান তনয়ে রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।
তস্য পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে ॥
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তস্য পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি ॥
তস্য পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল ॥
তস্য পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি ॥
তস্য পুত্র সুধর্ম্ম ছিলেন মহারাজ।
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে প্রজা ॥
তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান ॥"

এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রাচীন রাজমালা ত্রিপুরা রাজার ব্যয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আর্য্যাবর্ত্তের—বিশেষ বঙ্গদেশের বহু দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের খনিবিশেষ। এমন একখানি পুস্তকের বিষয় অনেক বাঙ্গালীই বিদিত নহেন, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। কহ্লণের রাজ-তরঙ্গিণী হইতে বাঙ্গালা রাজমালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশী ছাড়া কম নহে। আমাদের ভাষা রত্নপ্রসূ, কিন্তু আমরা এখন ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কবিত্ব-কুসুম খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যাহা সারবান্ ও স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য তাহা বাদ দিয়া যাইতেছি। এইজন্য রাজমালা পর্য্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ হইয়া আঁধারে কাঁদিতেছে, কে ইহার খোঁজ লইবে?

আমরা যে কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত করিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে তাহার আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

কবি-তালিকা। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এ স্থলে তাঁহাদের আনুমানিক কাল ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

নাম	সময়	রচিত গ্রন্থের নাম।
১। রামাই পণ্ডিত—	রাজা ধর্ম্মপালের সময়— খৃ একাদশ শতাব্দী।	(নগেন্দ্রবাবুর মতে) পদ্ধতি
২। কাণা হরিদত্ত—	সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।	মনসা দেবীর ভাসান
৩। চণ্ডীদাস—	খৃ. চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে	পদাবলী।
৪। বিদ্যাপতি—	ঐ	১। পদাবলী। ২। পুরুষ-পরীক্ষা। ৩। শৈবসর্ব্বস্ব-সার। ৪। দানবাক্যা-বলী। ৫। বিবাদ-সার। ৬। গয়া পত্তন। ৭। গঙ্গা-বাক্যাবলী। ৮। দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী। ৯। কীর্ত্তি-লতা। ১০। রুক্মিণী স্বয়ম্বর। পদাবলী ব্যতীত সব পুস্তকই সংস্কৃতে রচিত।
৫। কৃত্তিবাস—	জন্ম চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে	১। রামায়ণ। ২। শিব-রামের যুদ্ধ। ৩। যোগাদ্যার বন্দনা। ৪। রুক্মাঙ্গদ-রাজার একাদশী।
৬। সঞ্জয়—	সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমকালে	মহাভারত।

নাম	সময়	রচিত গ্রন্থের নাম-
৭। মালাধর বসু— (গুণরাজ খাঁ)	গ্রন্থরচনা কাল ১৪৭৩— ১৪৮০ খৃ.।	১। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। ২। লক্ষ্মী-চরিত্র।
৮। নারায়ণদেব—	চতুর্দ্দশ শতাব্দী (?)	পদ্মাপুরাণ।
৯। বিজয় গুপ্ত—	হুসেন শাহের সময়।	ঐ
১০। দ্বিজ জনার্দ্দন—	ঐ	মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান।
১১। রতিদেব—	ঐ	মৃগলুব্ধ।
১২। শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর পণ্ডিত—	১৪০৭—১৪৩৯ খৃ.	রাজমালা।
১৩। কবীন্দ্র পরমেশ্বর—	হুসেন শাহের সময়।	মহাভারত।
১৪। শ্রীকরণ-নন্দী—	ঐ	অশ্বমেধ পর্ব্ব।
১৫। দ্বিজ অনন্ত—	সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ	রামায়ণ।
১৬। ———	পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ	কুলজীগ্রন্থসমূহ।

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদিত মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট্ হুসেন শাহেরই উৎসাহের ফল। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থে হুসেন শাহের যশঃ ও কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তিনি প্রথমতঃ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াও শেষে উদারতা দেখাইয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীয় যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে "হুসেনী সাহিত্যের কাল" আখ্যা দান করা অনুচিত হইবে না। উপরে উদ্ধৃত ১৫ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিস্ফীর, চণ্ডীদাস বীরভূমান্তর্গত নান্নুরের ও মালাধর বসু কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট কবিগণের অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গের কবি। ইঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল—ফুল্লশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকদ্বয় ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, শ্রীকরণ-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী। বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না। অরণ্যকুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে

হুসেনী সাহিত্য।

কবিগণের বাসস্থান।

বহুকালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে ?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। শুধু পুস্তকের বিষয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গের অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল এমন নহে; প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনস্বিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য-রচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসা-দারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—* "কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে"—* তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া বহুসংখ্যক লেখক 'স্বপ্ন' কি 'বরের' দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। * "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"— * মালাধর বসু লিখিয়াছেন। * 'বিজয়গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।' * ইহার স্বপ্নের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। * 'পাঁচালী সঞ্জয় রচিল দেববলে।' (বে. গ. পুঁথি ৪৫১ পত্র) * —সঞ্জয় লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কবি-কঙ্কণের * "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে"* পদ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,—* "তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥" * কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতা-কাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে,—ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—

"জ্ঞানবান্ হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥

ডিউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥"

দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্ত্তৃক কীর্ত্তন, —সমস্তই স্বপ্ন-নিয়ন্ত্রিত।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু বঞ্চকের দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেরূপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইঁহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।

বৈষ্ণব কবিগণের সততা।

কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্তরাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিনয়মাখা; প্রত্যাদেশের ঝুঁটা গিল্টি তাঁহারা দেখান নাই। ঐ সব আদেশগর্ব্বিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের, * —'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥' * বৃন্দাবন দাসের,— * শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥' * কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের,— 'মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস॥' * প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন; সরল ও বিনয়নম্র কথাগুলি পুষ্পমালার ন্যায় আপনিই সুরভিময়।

পঞ্চগৌড় ও বঙ্গদেশ।

পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে; মিথিলার সংস্কৃত টোল নবদ্বীপের শিক্ষাগুরু;—এ সকল কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটে অক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।[১] মিথিলার পরে কান্যকুব্জ বঙ্গদেশের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করিয়াছে। কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন; কিন্তু এইখানেই এ ঋণের শেষ নহে। 'পাঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব; এই 'পাঞ্চালী'-গীতের আদর্শ

(১) ত্রিহুতের অক্ষরের একটি বিশেষ ভাব এই যে, 'ব'এর নীচে সর্ব্বত্রই শূন্য আছে। (Grierson—Maithil Grammar, J. A. S. B., Extra No. 1880)। আমরা প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'ব'এর নীচে শূন্য এবং পেটকাটা 'র' পাইয়াছি।

লইয়া বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকাব্দা বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায়, আর্য্যজাতির এই পঞ্চশাখা পূর্ব্বে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহাদের সমস্তটির ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল এইজন্য এই সাদৃশ্য। আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 'ব্রজবুলি' চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না। 'ব্রজবুলি' মৈথিল ভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যে ব্রজবুলিচিহ্নিত অংশ বাদ দিলেও খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:—

পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা।

যেত্‌কে, তেত্‌কে তুম্বা, বড়ুয়া (বড়), পাইতায় (প্রত্যয় করে), সুবোধিয়া সরুয়া, পোখেরি, বাবন (ব্রাহ্মণ), দোন, ডাবিয়া (মা· চ· গা·); সাসিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাই, বড়ি (বড়), টুট, পাকনা, ফাগু, সোয়াস্তি * (বিজয়গুপ্ত); * বহিন, গুতিল, এড়া * (কৃত্তিবাস), * আয়র—(আওর) আর, কয়িলোহু—করিলাম, ভৈল —হইল, বড়া—বড়, হুঁয়া,—হ'য়ে, বহুঁতর—অনেক, হুয়োক—হউক, আবে—এখন, হুইনুই—হই কি না, পালটায়—কিরে, কিসক —কেন, তাহাই—তাই, ন জীঁবো—বাঁচিব না, পিন্ধই—পরিধান করে * (অনন্ত রামায়ণ); * কঁরো, কৈঁলু, দোঁহা আঁইলু, শকুনিয়া করিলেন্ত, যায়, পড়িলেন্ত, আইবেন্ত * ইত্যাদি ; * মোহর, (আমার) চাহসি, কহসি, ইত্যাদি, নিয়ড়ে কাহা (কোথায়), তুমি সব, বাও (বাতাস), বোলাও, এহি, বিহা, চিহ্নি (চেনা) নিদ, কেহ্নে, পাকায় * (সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ-নন্দী প্রভৃতি); ইহা ছাড়া * 'পরদেশক লাগিয়া', 'জলক লাগিয়া' (মা চ. গা.); 'ঘরকে গমন' * (কৃত্তিবাস); * 'কাঁথে কেরবাল' * (শ্রীকৃষ্ণবিজয়), * 'করে বীর বেণেরে জোহার' (ক. ক. চ.) প্রভৃতি পদও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।[১]

বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ।

(১) উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে 'গুতিল' শব্দ এখনও মৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে

শুধু ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর-পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল। বিজয়গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,— * "একখান কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়।" * মা মরিয়াছেন, খেতুরি রাজাকে বলিতেছেন, * "কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর"—মাণিকচাঁদের গান (৩৫২ শ্লোক)। * এই সকল বর্ণনায় মালকোঁচামারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোট্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর' প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টাদের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া প্রশংশিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্শ্বে কাঁচলি-আঁটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোট্টার দোকানে ক্রীত। স্ত্রীলোকের কাঁচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিজয়গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কন প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সময়ও এই রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই;— * "রাজ্ঞী এ রাজবধূ এবং রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয়শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভ কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, ৩৫ পৃ.)। * আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি * "নীল ওড়নার মাঝে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥" (প. ক. ত., ১৩৭৭ পদ)। * এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,— * "কটিতটে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা ভাল সাজে। রতন মঞ্জরী রাঙ্গা চরণেতে রাজে॥' * নীবিবন্ধের উল্লেখও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া যায়। এই সব নরনারীগণ যে দু'একটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা ব্রজবুলির ন্যায় অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

পরিচ্ছদের সাদৃশ্য।

(Grierson—Maithil, Grammer, J. A. S. B, Extra No, 1880)। করন্ত, বোলন্ত প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়; 'শকুনিয়া' প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ। এস্থলে বলা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বঙ্গাধিপের নাম 'লক্ষণিয়া' শুনিয়া আবুল ফজল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লক্ষণের' নাম ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্ট হইয়া বঙ্গ-ইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে। "আবে" শব্দ হিন্দী 'অব' শব্দের মত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকগণ কোন কোন স্থানে 'এ্যাবে' (এখন) শব্দ ব্যবহার করে। আমরা উদ্ধৃত শব্দ সংগ্রহে চণ্ডীদাস কি কোন 'ব্রজবুলি' অধিকৃত লেখকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্ব্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন; তাঁহারা দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং কখনও তদ্দ্বারা বেণী গ্রথিত করিতেন; রাধার সখীগণ শ্যামচাঁদকে বলিতেছেন;— * "আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।" (চণ্ডীদাস)।* শ্রীচৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ বিলাপ করিতেছে,— * "কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥" (চৈ. ভা., মধ্যখণ্ড); "পলায় রামের সৈন্য নাহি বান্ধে কেশ।" (কৃত্তিবাস); "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল॥" (বিজয় গুপ্ত)।

আহারে ব্যবহারে ঐক্য।

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট-সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্দ্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,— * "দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।" * বঙ্গবাসীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় এই 'কুসুম্ভা'র অর্থ লেখা হইয়াছে, 'একরূপ সামগ্রী; এখন বাঙ্গালীর 'কুসুম্ভা'র অর্থ জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতানা এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এই 'কুসুম্ভা' ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ উপাদেয় ব্যাপার; উহা অহিফেনের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কুসুম্ভাভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটি উৎসবরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক্ হইতে উত্তরপশ্চিম-দেশবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খোট্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রমদূরবর্ত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদ্দৃষ্টে লুপ্তপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং জাতীয় ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিয়াপদ।

বঙ্গদেশে সমাগত আর্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্ত্তী, পূর্ব্বে ততদূর ছিল না। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'করিমু' ও 'করিবু', এই দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে 'করিবু', ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; মানিকচাঁদের গানেও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,— * "ফুল গোঠেকে

দেখিয়া ফুল না পাড়িবু। পাখী গোঠেকে দেখিয়া ডিম্বা না মারিবু। পরের স্ত্রী দেখিয়া হাস্য না করিবু॥" (৫৬৩ শ্লোক) ; "তুমি হবু বটবৃক্ষ, আমি তোমার লতা। রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা॥" (১৭৫ শ্লোক)। * পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে 'করিমু' প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িমু নাম সংকীর্ত্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু এ তিন ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গাকার। আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবায়॥"

চৈ. চ., আদি, ৩য় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীদাস এবং গুণরাজ খাঁও এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইরূপ ক্রিয়াই পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বোধ হয়, কালে 'করিমু' হইতে 'করিবু' ক্রিয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রুচি অধিকতর অনুকূল হইল, 'করিব' (কর্ব্বক) 'খাব', 'যাব', ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূর্ব্ববঙ্গে 'করিমু', 'করুম' ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল ; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিতান্ত মফস্বলে 'করিবাম', 'খাইবাম' ইত্যাদি রূপও লক্ষিত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও যে এককালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, তাহার আভাস আছে। 'করিবাঙ', 'যাইবাঙ', 'বলিবাঙ', প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক ; উক্ত গ্রন্থকারকৃত 'মনসা-দেবীর ভাসান' হইতে দুইটি ছত্র উঠাইতেছি,—

"মনসা বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ডিঙ্গার ধন হবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর॥" কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ভাসান, আপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত, পৃ. ৪৫।

পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত 'আছিল' শব্দ পশ্চিমবঙ্গের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই ক্রিয়াপদগুলি পূর্ব্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল ; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে।

করসি, করেন্ত, বোলেন্ত, ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় ; পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও সেইরূপ ক্রিয়া একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে 'পিবন্তি', চৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'যান্তি' ও ডাকের বচন হইতে 'খায়াসি', 'পূজসি' প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (১৭, ৫২ পৃষ্ঠা)। অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়,

পূর্ব্ববঙ্গের বহুসংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীনরূপ রক্ষা করিয়াছে। প্রাকৃতের 'ও'—(তো)-প্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয় ; যথা :—

শব্দ	পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ	শব্দ	পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ
মা … (মাতা)	… মাও।	গাঁ … (গ্রাম)	… গাঁও।
পা … (পদ)	… পাও।	ছা … (ছানা)	… ছাও।
ঘা … (ঘাত)	… ঘাও।	দা … …	… দাও।
না … (নৌকা)	নাও।	ভাব … …	… ভাও।
রা … (রব)	… রাও।	বা … (বাত)	… বাও।
গা … (গাত্র)	… গাও।	তা … (তাপ)	… তাও।

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়, যথা— * "নাটগীতি সুখে যাও, রূপার দোলায় ফেলায় পাও।" (খনা)

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের—এই দুই উপশাখার বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর নিকট-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ক্রমিক দূরবর্ত্তিতা যদি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহবন্ধনাদি দ্বারা একজাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা—সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন। সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া ওড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,—পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গেও আমরা একতা-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

কালে পৃথক জাতিতে পরিণতির সম্ভাবনা।

'বৌদ্ধ যুগ'-অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবচিহ্ন নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জ্জিত ও সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াসী। মাণিকচাঁদের গানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংস্রব-রহিত, যথা— * অদুনা, পদুনা, খেতুরি ; নেঙ্গা ময়নামতী। * চণ্ডীদাস— * শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও অবলা, * শ্রীরাধার সখী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ সকল নাম সংস্কৃতের মত।

বৌদ্ধ যুগান্তে ক্রমশঃ সংস্কৃত প্রভাবের বিস্তৃতি।

কিন্তু বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়,—লখিন্দরের বিবাহবাসরে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত-ভাবাপন্ন, যথা—* কমলা, বিমলা, ভানুমতী, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, সুভদ্রা, রতি, তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্ররেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চন্দ্রপ্রভা, দুর্লভা, অনুপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরলা। * কিন্তু তখনও অসংস্কৃতের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই; অন্যান্য এয়োগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাস্যোদ্দীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দুই একটি সংস্কৃত নাম আছে,—* "একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম রুই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে খোঁপা খাইল গোরু॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার ক্ষুদ মণ দুই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওষ্ঠে দিছে মিশি॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম চূয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া॥" (বিজয়গুপ্ত)। বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাই ওঝা, সায়বেণে, ফুল্লরা, খুল্লনা—* এসব নামও সংস্কৃতের মত নহে। 'বেহুলা' বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহুলার স্থলে 'বিপুলা' পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য নামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না; পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃতসূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] পাণ্ডিত্যবলে অপরাজিতাকেও পারিজাত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—এইভাবের ব্যাখ্যায় কল্পনাসুন্দরীকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় সন্দেহ নাই। কুলজীগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে, ১৯।২০ পুরুষপূর্ব্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল। এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অনুমাত্রও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পল্লীকথা-সাহিত্যে বৌদ্ধযুগে প্রচলিত 'আয় বেণে' 'সায় বেণে' 'মস্ত বেণে' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই অধ্যায়বর্ণিত সাহিত্যে সংস্কৃতের দিকে ক্রমশঃ রুচির অনুকূলতা লক্ষিত হয়।

১. বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ১০৭ পৃ.।

অনুবাদগ্রন্থ ও সংস্কৃতের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জ্জনা মার্জ্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইল ; কিন্তু তখনও বঙ্গগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম 'ভুই', 'রুই', 'কুই', 'আই', প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোন ললনার এবম্বিধ নামকরণ হইলে, তাঁহার বিবাহ হওয়া ও বিবাহান্তে সুরুচি-সম্পন্ন স্বামীর নিকট পত্র লেখা উভয়ই অসুবিধাজনক হইবে। কবিকঙ্কণের সময় ভাষা অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কৃতাত্মক—এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাবব্যঞ্জক ; যথা— * বিমলা, চাঁপা, কমলা, ভারতী, পার্ব্বতী, সুবর্ণরেখা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বল্লভা, দুর্ল্লভা, রম্ভা, সুভদ্রা, কৌশল্যা, যমুনা, চরিত্রা, তুলসী, শচী, রাণী, সুলোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-মঞ্জরী, চিত্ররেখা, সুধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, বিজয়া, গৌরী, সুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, কাদম্বরী।

প্রচলিত শব্দার্থ।

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব্দ পাইয়াছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই, কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়োক্ত শব্দগুলিরও কতক এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দুরূহ শব্দার্থের তালিকা দেওয়া হইতেছে[১] :—

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে— * ভোল—বিভোর (অতিকামে হৈয়া ভোল। শ্রীফল গাছ দিল কোল।); আমোয়াস্থ—অসুস্থ, অগল—দক্ষ, অগ্রসর ; শাসিয়াল—তেজস্বী (শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল); চোপা—মুখ, উদাসিনী—অনাথা (শিবের কুমারী আমি উদাসিনী নহি); নবগুন—নগুণ, উপবীত (দন্ত-ভ্রূকুটী করে নবগুণ ভুলি ধরে); সম্বিধান—অবধান, মনোসংযোগ ; খিটে—খুঁটিয়া তোলা, ছামনিতে—সম্মুখে, রড়ি—রড়, ধাই—মাতা, মাই—মাতা ; অথান্তর—চেষ্টা, শ্রম, বিপদ (বহু অথান্তর সেই পুষ্পের কারণ); মেলানি—বিদায়, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, বাহুড়িয়া—ফিরিয়া, পাকনা—পক্ব, পাঁচে—চিন্তা করে, আচাভুয়া—নির্ব্বোধ, ঠান—ভাব, সহিলা ও সইলা—সখীত্ব[২] ; ভাণ্ডালে—ভাঁড়ালে, পরিপাটী—কারিগরী (কার সাধ্য বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী); টনক—শক্ত (টনক করি ধরিমুখে দিল এক

---

১. আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায়-বর্ণিত অনেক কাব্যেই পাইয়াছি। একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হেতু কেবল এক কবির নাম নির্দ্দেশ করিলাম।

২, বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে 'সল্লা' (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে।

মুঠ); সোসর—তুল্য, তেলেঙ্গা—হৃষ্টপুষ্ট, অবস্থা—কষ্ট, (সম্ভাবনা—সম্পত্তি), (সম্ভাবনা কেবল বলদ); সুশ্রীত—শ্রীযুত, সানে—ইঙ্গিতে (হাতসানে বলে সবে মিনিটেক রহ); তিতা—আর্দ্র।[১] * কৃত্তিবাসী রামায়ণে,— * সন্তোক —যৌতুক, নিবড়ে—অতীতে, ভোকে—ক্ষুধায়, লোহ—অশ্রু, ওর—সীমা, রড় —দৌড়, কোঙর—পুত্র। * সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,— * আহ্মি—আমি, তুহ্মি —তুমি, মোহর—আমার, সমাইয়ে—সকলকে, আগুয়ান—অগ্রসর, সুসারিত —শ্রেষ্ঠ, যুরায়—যোগ্য হয়, কেনি—কেন, পুনি—পুন, বিনি—বিনে, খেরি— খেলা, হনে—হইতে, আপু—আপন। * অনন্ত রামায়ণে,— * তয়্—তোমার, থেলা—রাখিল, আবর (হিন্দী—আওর)—আর, আবে—এখন, জাঞ—যাব, পুতাই—পুত্র, পোয়ে—পুত্রে ("গলাগলি করি কাঁদে তিন বাপে পোয়ে"); এতিক্ষণে—এতক্ষণে, বুঢ়া—প্রাচীন (দ্রব্যাদি বোধক, যথা "বুঢ়া ধনু ভাঙ্গিলেক"); তেবে—তখন, তঁতো—তার পর, তেতিক্ষণে—তখন, করিলহোঁ—করিলাম, পুনু—পুনঃ, কাটিবোহোঁ—কাটিব, কাটরোক— কাটা, মিলি—হরে ("বড় দুঃখ মিলি গেল"); তাইক—তাহাকে, সোমাইল—প্রবেশ করিল, বাহুড়িল—ফিরিল, ওকাইলা—হাঁকাইল, লগতে—সঙ্গে, উলটাইল— ফিরাইল ("রাজাক গৃহে লাগে উলটাইল"); কান্দিয়োক লৈলা—কাঁদিতে লাগিল, তেহ—তেমন ("তঞি হাক আশাকর মঞি তেহ নাহোঁ)"; ছুকর—শূকর, আই—নারী, গেড়ি পারন্ত—ডাকিতে লাগিল, হুই নুই—হয় নয়, এতিখন—এখন, নাহা—নাথ (হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহা"); নবণু—ননীর, সুগ্রিঞো—সুগ্রীব, মকমকি—উচ্চস্বরে ("এহি বুলি মকমকি কাঁদে রঘুরাই"); পিম্পরা—পিপীলিকা, পিন্ধই—পরিধান করে, ভবহিল— জানাইল। * কবীন্দ্র ও শ্রীকরণনন্দীর অনুবাদে— * সম্ভ্রম—ভয়। * এই সম্ভ্রম ও সম্ভ্রান্ত শব্দ মর্য্যাদা-ব্যঞ্জক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের অর্থ "ভয়" ছিল (যথা— * "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর")— ; * সংস্কৃত রামায়ণেও সম্ভ্রান্ত শব্দ ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়-যথা— * "সম্ভ্রান্ত-

---

১. চৈতন্য ভাগবতেও 'তিতা' শব্দ আর্দ্র অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা ;—স্নানান্তে "তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।" (মধ্যম খণ্ড)। আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই "তিতা"র ক্রিয়া হইতে 'তিতিল' (সিক্ত হইল) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'তিতা' শব্দের সংস্রব লক্ষিত হয় না, উহা 'সিক্ত' শব্দের অপভ্রংশের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের "তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে"...পদে 'তিতা' শব্দ তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

হৃদয়ো রামঃ ইত্যাদি (বঙ্গবাসী সংস্করণ, অরণ্য কাণ্ড, ৯৫ পৃ.); সম্বিধান—মনোযোগ, সমে—সহিত ("গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড"—শ্রীকরণনন্দী); পাড়িমু—ফেলাইব ("ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে—কবীন্দ্র); উপালন্ত—উপর। * নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে,— * খাখার—অপযশঃ, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথার, এড়িয়া—ত্যাগ করিয়া। * চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—[1] চেট্যেনেটো—অল্প বয়স্ক বউগণ, টীট[2]—ধূর্ত্ত, অখলা—সরলা, উতরোল—উৎকণ্ঠিত, ভালে—ভাগ্যে ("ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী"); আরদ্র—হরিদ্রা, বড়ু—ব্রাহ্মণপুত্র (কিন্তু বটু শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র), দে—দেহ, টাগ—জঙ্ঘা, আকুতে—আগ্রহে, লেহ—স্নেহ, ওদন—অন্ন, গতাগতি—যাতায়াত, পরিবাদ—নিন্দা। "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে" * প্রভৃতি শব্দের "ফুরিছে" (স্ফুরিছে হইতে উদ্ভূত) শব্দ হইতে 'ফুলিছে' শব্দ আসিয়াছে। রাঢ়দেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় রেঢ়ো-শব্দ-বহুল; ক্ষীরোদবাবু সাহিত্য-পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), তাহাতে * সছ (বোধ হয় আরোগ্য), নাকাড়ে—শব্দে, আউদর-এলোথেলো, পোকান—পুর,— * প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে ঐ সব শব্দ নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ব্ববঙ্গের লোকগণ নিজেদের সুবিধার জন্য কতকটা 'বাঙ্গাল' করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, উঁহারা ততদূর হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,— * কাঠিনী—খড়ি, সমাধান—সেবা, ঘুলে—অনুসন্ধান করে, সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিন্দাবাদ—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'বাপু' শব্দ সর্ব্বত্রই সন্তান কর্ত্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, (শিবের প্রতি পদ্মা)— * "পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার। ঝির অপমান বাপু না দেখ একবার॥"; (ধন্বন্তরির প্রতি

১. এস্থলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না।

২. এই 'টীট' শব্দ গোবিন্দদাসের পদে (প. ক. ত., ৬২৫ নং), বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (জগদ্বন্ধুবাবুর সংস্করণ, ৭৭ পৃ.), কবি আলাওলকৃত পদ্মাবতীতে ("কোথাতে নাহিক দেখি হেন যোগী টিট"—৯৬ পৃ.) ও অন্যান্য পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্দ হইতে 'টীটকারী', 'টিটপনা' ও 'টেটন' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বটতলায় পদকল্পতরুতে এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন সংস্করণে 'টিট' শব্দ স্থলে 'টীট' প্রদত্ত হইয়াছে।

শিষ্যগণ),— * "শিষ্যসব বলে বাপু এ কোন বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান॥"; * (বেহুলা পিতার প্রতি) * "বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন॥" * এখনকার রাজনৈতিক উপহাসের লক্ষ্য 'বাবু' বোধ হয় এই 'বাপু' শব্দেরই অপভ্রংশ হইবে। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে 'মা'—কে 'মাইঞা' বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে মাই শব্দ পাইয়াছি; এই 'মাই' ও 'মাইঞা' হইতে বোধ হয় কন্যা-বোধক 'মেয়ে' শব্দ আগত হইয়াছে। 'বাপু' ও 'মেয়ে' শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্ব্বে উহারা পিতৃমাতৃবোধক ছিল। 'লোকগুটি', 'বানগোটা' প্রভৃতি রূপ 'গুটি' ও 'গোটা' অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—'লোকটি', 'বানটা' বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বিভক্তি।

বিভক্তি সম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের মত কোন পরিষ্কার সূত্র উদ্ধার করা বড়ই দুরূহ। এখনও বঙ্গদেশে নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু লিখিত রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতা লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন সাধারণ সূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই। নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ সূত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের কাজ,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ের বহু পরেও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। আমরা এই অধ্যায়ে—

"আমি" স্থলে আহ্মি, মুঞি, মুই, আমিহ, মো; "তুমি" স্থলে তুহ্মি, তুঁহ, তঞি; "আমার" স্থলে—আহ্মা, আহ্মার, মোহোর, মোহর, মোর; "তোমার" স্থলে তোহ্ম, তোহ্মার, তয়ু, তোহার, তোঁহর, তোর; "আমাকে" স্থলে আহ্মাতে, মোত, আমাক, আহ্মারে, মোহারে মোরে; "তোমাকে" স্থলে তোমাক, তোহ্মারে, তোহ্মা, তোত, তোঁহারে, তোরে; "সে" বা "তিনি" স্থলে তিঁহ; "তাহাকে" স্থলে তাকঁ, তাতে, তায়, তাইক; "তাঁহার" স্থলে তাঙ্ক, তান, তাহান, তার; "তাহা" স্থলে তেহু; "কাহাকেও" স্থলে কাকহো, * প্রভৃতিরূপ সর্ব্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি—এই সমস্ত জটিল রূপের মধ্যে মধ্যে আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন নহে। কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে আধুনিক ভাবের ব্যবহারও সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিভক্তি

সম্বন্ধে সর্ব্বনামের পূর্ব্বোক্ত রূপান্তর ভিন্ন, * পুষ্করিণী হনে (ও হন্তে)—পুষ্করিণী হইতে, বিষ্ণুকে উদ্দেশে—বিষ্ণুর উদ্দেশে, ভক্তি এ—ভক্তি সহ, তীরক পাইলা —তীর পাইলা, প্রাণত—প্রাণাপেক্ষা, পিতৃতো মাতৃতো—পিতামাতা হইতে ("পিতৃতো মাতৃতো করি তোত অনুরাগ"—অনন্ত রামায়ণ); কালিকারে—কালিকার জন্য, বর্ষাকে—বর্ষার জন্য, দ্রোণকে চাহিয়া—দ্রোণের দিকে চাহিয়া, বিধিএ নির্ম্মিল—বিধি নির্ম্মাণ করিল, প্রণাম করিল মেনকারে—মেনকাকে প্রণাম করিল, ভূমিএ—ভূমিতে, বাণিজ্যেরে চলে—বাণিজ্যে চলে, * এই ভাবের প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাইয়াছি ; 'কে' স্থলে 'ক' সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়—যথা * "সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক। সেই মত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক ॥"

বহুবচন 'সব', 'গণ' ও 'আদি' শব্দ দ্বারা গঠিত হইত— * তুমি সব, আমি সব, রাক্ষসের গণ, মৃগাদি * প্রভৃতি বহুবচন-বোধক-শব্দ ও তাহাদের পরবর্ত্তী রূপান্তরের বিষয় পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-গুলিতে— * ঘরকে গমন, পাণিকে ধায়, জলকে গেনু, কাঁধে কেরুবাল, শুনে গৌড়েশ্বরে (শুনে গৌড়েশ্বর), * প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে—দেঁহো, কঁরো, তেজিম, মোহোঁ (মই), দেখএ়, লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলুঁ, দিমু, করিনু ; মধ্যম পুরুষে—কহসি, দিয়েঁাক, করিয়েঁাক, আসিয়েঁাক, করিহ ; এবং প্রথম পুরুষের পরে—হব * ["নিঁদের স্বপনে রাজা হব" (হবে) দরশন"—মা. চ. গা.], পইতায়, আইবন্ত, ভেলন্ত, করেন্ত ইত্যাদি রূপ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে শুধু অর্থই পথপ্রদর্শক। এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন। কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃতক্রিয়াও দৃষ্ট হয় ; যথা— * 'মান হয় চাঁদের ছয় পুত্র থাম'—(বিজয়গুপ্ত)। * তৎপর করিস, থায়ন্তি, পিবন্তিও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ; এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'হের' ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পূর্ব্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—'এখানে' ; 'হের দেখ' এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে "এ্যার" অর্থ "এইখানেই" শুনিয়াছি ; এই দুই শব্দ 'অত্র' শব্দের সঙ্গে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের

ক্রিয়া।

ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করা গুরুতর ব্যাপার, ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এই অধ্যায় বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত। মনসাদেবীর ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ ব্যাপী গান হইত। অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্মবিবরণ প্রদান করিতেন। এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ

কাব্য গীত হইত।

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্য-বেত্তা, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ৺উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সর্ব্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির গানগুলির রাগ-রাগিণী উৎকৃষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে * "উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাগ-রাগিণীর সংখ্যা (সাধারণগুলির একবার-মাত্র ধরিয়া) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র।" ৮৩ পৃ.। * ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়[1] লিখিয়াছেন— * "পদাবলীর স্বরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একজন যে পদ 'ধানশ্রী'তে গেয় লিখিয়াছেন আর একজন সেই পদই 'বসন্ত রাগে' গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুঁথিতে সেই পদেই 'কল্যাণী রাগ' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" * এই সকল গান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকালে 'ধানশ্রী', 'শ্রীরাগ', 'নটনারায়ণ', 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি ওস্তাদি ধরণের রাগ-রাগিণীতে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত; এখন জাতীয় রুচি মৃদুতার অনুকূলে—ভৈরবী, ঝিঁঝিট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়েও পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কথিত ভাষায় যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা শুধু প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণের প্রভেদ জনিত নহে। আমার মনে হয় আদিমকালে আর্য্যগণের দুই ভিন্ন শাখা এই দুই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন; এজন্য উহাদের কথার ধরণ ও ভঙ্গিতেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ভাষাতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে, এই হিসাবে আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়া যাইতেছি।

---

১. বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, পৃ. ১৮০।

লাগে—এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গে 'কষ্ট দেওয়ায়' অর্থেও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোথায়ও সেরূপ ব্যবহার নাই। "বড্ড লাগছে" —এ কথার অর্থ—"বড় কষ্ট পাচ্ছি", কিন্তু খাস পূর্ব্ববঙ্গের লোক এ কথার এই অর্থ বুঝিবেন না। তার পর পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যেখানে বলিবেন, "খেতে হয়, যেতে হয়", পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা সেখানে 'খাওন লাগে, যাওন লাগে" এইরূপ কথা ব্যবহার করেন। কখনও কখনও পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা যেখানে "তোমার লগে (সঙ্গে) যাব" বলেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ "তোমার সাথে যাব" বলেন। "লগের" এই অর্থ তাঁহারা স্বীকার করেন না। পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে "তুমি কি দেখ না?" প্রচলিত, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না" র প্রচলন। এই ভাবে পূর্ব্ববঙ্গের "সে হাসল", "সে কাঁদল" "সে খাইল" ইত্যাদির স্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই "সে হেসে ফেল্লে", "সে কেঁদে ফেল্লে", "সে খেয়ে ফেল্লে" ইত্যাদিরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই "ফেল্ল" কথাটা পশ্চিমবঙ্গের একটা রীতি—ইহা পূর্ব্ববঙ্গে এভাবে কথিত ভাষায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গের "আমি তো খামু না বা খাব না", "আমি তো বলি না" প্রভৃতির স্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই "আমি তো খেতে যাচ্ছি না", "আমি তো বল্‌তে যাচ্ছি না" প্রভৃতি প্রচলন। 'ফেলা' ক্রিয়াটা পশ্চিমবঙ্গের যেরূপ একটা রীতি, 'যাওয়া' ক্রিয়াটাও সেইরূপ রীতি। ক্রিয়াপদের এই পুচ্ছটি পূর্ব্ববঙ্গে নাই। তার পর আরও নানারূপ বিশেষ রীতির বিভিন্নতা আছে—যথা পূর্ব্ববঙ্গ যেখানে বলিবে "চোখ খাবি", পশ্চিমবঙ্গ সেস্থলে বলিবে—"চোখের মাথা খাবি।"

'ফেলা', 'যাওয়া'র মত আরও ক্রিয়াপদের পুচ্ছ দেওয়া পশ্চিমের রীতি,— যথা পূর্ব্ববঙ্গের "আমি তোমারে দেখুম, বা দেখব" স্থলে পশ্চিমবঙ্গ বলিবে, "আমি তোমাকে দেখে নেব।"

পূর্ব্ববঙ্গে "দৌড়িয়ে যাওয়া"—পশ্চিমবঙ্গে "ছুটে যাওয়া", পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে বল্‌লে "ওকে ডাক", "ওকে ছাড়", "ওটা ফেল", পশ্চিমবঙ্গ বলিবে, "ওকে ডেকে দাও", "ওকে ছেড়ে দাও", "ওটা ফেলে দাও।" মোটের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে ক্রিয়ার প্রায়ই একটা পুচ্ছ দেওয়ার রীতি আছে, যাহা পূর্ব্ববঙ্গে আদৌ নাই। বিশেষ বিশেষ কথার রীতি এই দুই প্রদেশে প্রচলিত আছে —যথা পূর্ব্ববঙ্গে "মেলা কল্ল" স্থলে পশ্চিমবঙ্গ বলিবে "রওনা হ'ল।"

কতকগুলি শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব, যথা আচপনিশাল—আঁস্তা কুড়—(আচমন শালার অপভ্রংশ কি ?), পশ্চিমবঙ্গের হেঁসেল (রান্নাঘর) পূর্ব্ববঙ্গের ছিটাল (অপবিত্র স্থান), পূর্ব্ববঙ্গের বেজকন্যা বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ কন্যা (বেজ শব্দ অর্থ বৈদ্য), পূর্ব্ববঙ্গের আহিস্তিনী (অভাগিনী)।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে নাম শব্দের উত্তরে বহুবচনের চিহ্ন 'আ'কার দৃষ্ট হয়, যথা—'বুকা' (বক্ষে, লাউ প্রভৃতি ফলের সম্বন্ধে ব্যবহৃত), কাগা (কাক), রাতা (রক্ত), মুখা (মুখ—কুমারেরা যে মুখের ছাঁচ তৈরী করে তাহাকে 'মুখা' বলে।), চান্দা (চাঁদ), রাঙ্গা (লাল)।

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনার কয়েক ছত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তূপ হইতে পাইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায়। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ দুই পত্র সম্ভবতঃ তাহারই অংশ। এই অধ্যায়ের রচনা পয়ারের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

পয়ারের ব্যতিক্রম।

আমরা— * "ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ।" (কবীন্দ্র) এবং "তথাপিহ বেদনা না জানিয়া। সত্বরে গিয়া পার্থেরে ধরিল দুই করে সাপটিয়া" (শ্রীকরণ নন্দীর অশ্বমেধ), * এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই 'ব্রজবুলি' পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভুল ধারণা আছে। 'ব্রজবুলি' সম্ভবতঃ প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত কবিতার অনুকরণ। চণ্ডীদাসের রচনার 'ব্রজবুলির' অনুকরণে শব্দসম্প্রসারণ-ক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা— * ধরম, করম, পরকার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস। *

ব্রজবুলি।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে স্বর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয়, কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘন্টী, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাড়ল্ল (খোট্টা রমণীরা এখনও পদে পরিয়া থাকেন) একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে স্বর্ণ বাউটি, স্বর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ

রমণীগণের পরিচ্ছদাদি।

করিয়াছেন। সদয় অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে পট্টবস্ত্র ও (শঙ্খস্থলে) স্বর্ণের চুড়ি পরিতে দিতেন কোন কোন বালবিধবা সিন্দুরের পরিবর্ত্তে আবিরের ফোঁটা কপালে পরিতেন।

সামাজিক আদিম অবস্থার নিদর্শন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাওয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ততত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ। পাহাড়ের পাষাণবক্ষস্থ ক্ষীণ-যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জলরেখা ও শ্যামল তটান্তবাহী স্ফীত গঙ্গাধারা, উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতিদেবী আদি, উদ্যম ও বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া আসুন। মদনকড়ি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সকল দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানা মত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও সেই গহনাগুলি পরিয়া, সেই সকল দুরূহ শব্দপরম্পরায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র।

বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে একখানি মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য, বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কণ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—ইঁহারা সকলেই সমুদ্রের পথে 'বাঙ্গাল' মাঝি দিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। এখনও এদেশের জাহাজের সারেং ও খালাসিগণের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক। মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক 'গাবুর' নিযুক্ত থাকিত; ইহারা 'সারি' গাহিয়া মাঝিদিগকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত এবং মাঝিরা কার্য্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে 'ডাঙ্গা' দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন কোন খানিতে হাট মিলিত। * ("তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট। যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট॥"—বিজয় গুপ্ত)। * এক বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল,— * "মূলার বদলে দিল গজদন্ত।" (বিজয় গুপ্ত), * কিম্বা * "শুক্তার বদলে মুক্তা দিল ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥" (ক. ক.

চ.) * —প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। আশঙ্কা—নৌকা জলমগ্ন হওয়ার। সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা "ক্ষারচূণ" ছড়াইয়া ফেলিত; শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য-মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খগুলি পলাইয়া যাইত। এই সব বর্ণনায় কতদূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয়, গল্প শুনিয়া কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন ;—যে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও এথিয়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজদিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, ও সেবককে তাহা প্রথম খাইতে আদেশ করায়, সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাম্বুলরঞ্জিত অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে,— * "কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব্ব লোকে। অন্য ঠাঁই এড়ি তোমার মুখ ধরে জোঁকে॥ (বিজয় গুপ্ত)।

সরিষাতে যাঁহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, এই সব কবিগণের কল্পনার অনুবীক্ষণে প্রতিবিম্বিত চিত্রপট হইতে আমরা সমুদ্রবাহী ডিঙ্গাগুলির অবয়ব ও অন্যান্য তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে বঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই' শাড়ী—এই সময়ের আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। 'পাটের পাছাড়া' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে পাটের 'খনি' বলিত; গায়েন একখানা পাটের 'খনি' পাইলেই কৃতার্থ হইতেন,— * "বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি। মনসা জন্মিলরে গায়েনে দেও খনি॥" এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব, খুব শক্ত হইত। সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের 'খনি' হস্তে লইয়া প্রশংসা করিতেছেন,— * "মোর দেশে এক জাতি জন কত আছে তাঁতি, বুনিতে অনেক দিন লাগে। কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে।" (বিজয়

শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

গুপ্ত)। * স্ত্রীলোকগণের কাঁচুলী নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থতায় আঁকিয়া উঠান হইত। এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়াছি।

ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যা অবনতি।

ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই,—যাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্ব কল্পিত হইত, সুতরাং মনুষ্য সমাজে তাহার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। লখিন্দরের লৌহের বাসর, ধনপতির নৌকা ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গঠিত।

বিনিময় মূল্য।

এই সময়ে কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক 'কড়ি দ্বারা' দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটিকাটা ও কোন দ্রব্য ওজন করিবার জন্য 'পুরুষ'[১] এক রূপ মাপ ছিল, উহা এখনকার গজ কাটির ন্যায় হইবে। যাহা সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া কিনিব।

বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব।

আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। এই অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃদু আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুমলতার উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য! এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কবিগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে চাঁদবেণে একটি হাস্যরসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তার মহত্ত্ব কবিগণ অনুভব করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ন্যায় হাতে তালি দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় সুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ

১. "মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"—বিজয়গুপ্ত।
"পুরুষ সাতেক মোর হারালো কাসন্দ।"—ক. ক. চ।

এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল উৎপত্তি করে না। বাঙ্গালী উত্তম-পশ্চিম হইতে আর্য্যতেজঃ অবশ্যই আনিয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহবাহু কর্ত্তৃক সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমারভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মালকোঁচা, ফুলকোঁচা এবং শূল—ফুল হইয়া গিয়াছিল;—ইহা এদেশের গুণ; ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরাপদ্ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে! বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা বিলাপ, তরণী ও সুধন্বার ভক্তিকাহিনী অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পুষ্পমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি এককালে বাঙ্গালার রাজা সমুদ্রসেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, গুপ্তসম্রাট্ যে বঙ্গরাজকে পরাভূত করিতে যাইয়া বিশেষরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার পালরাজারা যে বীর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্য কাশ্মীরে যাইয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা কহ্লণ কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কল্পনার কথা নহে।

মাণিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই। চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও তদিতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ – * "শুন রজকিনী রামি। ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া, শরণ লইলাম আমি॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"— * এইরূপ বন্দনাদ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন; একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। এ কথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই—কারণ এ প্রেমে 'কামগন্ধ নাই'—ইহা তাঁহার "উপাসনারস", —ইন্দ্রিয়-লিপ্সার উর্দ্ধে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন,— তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন নাই।

বাঙ্গালী প্রেমিক।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে। চণ্ডীদাস পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উপমাগুলির গিল্টি দেখিয়া ভুলেন নাই— * "ভানু কমলে বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা। সময়

নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥ কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥" * উপমায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—ইহার তুল্য আছে, স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রেমের পটখানি উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। যাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইলেন। প্রাতঃ শিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল-পট ভানুকরে যেরূপ শুষ্ক হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার জীবন্ত লীলায় এই সকল গীতি সার্থক হইয়াছে,—তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার পুষ্প-পল্লবযুক্ত স্বর্ণ-ফ্রেমে বাঁধা একখানি দেবমূর্ত্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদিত হইয়াছেন; উৎকৃষ্ট তুলিকায় অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানি উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষা-গ্রন্থলেখকগণ নিজেরাও ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেন,— * "সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়"— * বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কবীন্দ্র তাঁহার অনুবাদ পুস্তকে দেন নাই, কারণ— * "পাঁচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ।"

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব-মহিমান্বিত; পাঁচালী গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ

(১) শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য, (২) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী, (৩) পদাবলী-শাখা, (৪) চরিত-শাখা

(১)

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;—

(ক) আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইঁহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
*　　*　　*
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

(খ) কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
*　　*　　*
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অনন্ত দহে,
পাশরিলে না যায় পাশরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা॥

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস রাধিকার গৌরবরণের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু প্রথম গীতির— * "এরূপ হইবে কোন দেশে ?" * ও

দ্বিতীয় গীতির— * "না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা"— * এই দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের কথার ন্যায় একটা অলীক ভাব মনে হইয়াছিল,—যেন, ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্যদেবও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রেমিক-কবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই রূপের পূর্ব্বাভাস পাইয়া আহ্লাদে চণ্ডীদাস উষার প্রাক্কালে পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন।

"এরূপ হইবে কোন দেশে?"—প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে; তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দ রায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্য-প্রভুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা অপূর্ব্ব হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার— * "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর", * কৃষ্ণ-অঙ্গভ্রমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্মৃতি আজ শুষ্কযুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতিসমূহে সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট্ শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা-স্বরূপ পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্র-ঢেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট;—তিনি 'আয়েসা' কি 'কুন্দনন্দিনী' নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।

প্রেমের অবতার চৈতন্য।

এই অধ্যায়ের চরিত-শাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিত-শাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে, এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে

হইবে; তাহা কিরূপ, দেখাইতে চেষ্টা করিব—চণ্ডীদাস রাধার অজ্ঞান অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন ;— * "তূলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥ * সার্ব্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্য-প্রভু অজ্ঞান তখন, * "সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল॥" (চৈ. চ. মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। * শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া * "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল", (প. ক. ত., ৩৯ শ্লোক) * ও মেঘ দেখিয়া— * "চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা" (চণ্ডীদাস)। * কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়— * "চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥" "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে নাশে প্রভু পড়ে কাঁদি॥" (চৈ. চ., মধ্যম খণ্ড, ১৭ পরিচ্ছেদ)।—"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥"—(গোবিন্দদাসের কড়চা); "বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন।" (চৈ. চ, ১৭ পৃ)। * এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চেতন করিবার জন্য বলা হইত,— * "উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ কৃষ্ণ গুণমণি॥"—(দিব্যোন্মাদ)। * চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, * "কখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত॥" (চৈ. ভা. মধ্যখণ্ড)। * রাধিকা কৃষ্ণনাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন, * "অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলী যেন ভূতলে লোটায়॥" —(চণ্ডীদাস)। * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছেন, * "কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥ যদি কেহ রাধা বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"—(গোবিন্দদাসের কড়চা)। * শ্রীরাধিকা— * "পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥—(চণ্ডীদাস); * চৈতন্যদেবও— * "গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস। কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে॥ সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন

পদাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক।

শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥"—(চৈ. ভা., মধ্যম খণ্ড)। * কৃষ্ণ-প্রেমে-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন, —* "ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে লিখি।"—(চণ্ডীদাস) ; * চৈতন্যদেবও, — * "ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥ –(চৈ. ভা., মধ্য) * রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর,— * "হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি॥" * চৈতন্যদেবও রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,—"বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর। বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে দ্বিজবর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥ লোচনের জল হ'ল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের উদিত॥"—(চৈ. ভা., মধ্যম খণ্ড)। * গোরার সন্ন্যাস নবদ্বীপের ইতিহাসে বিয়োগান্ত নাট্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছে —শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দনরাশি পদকর্ত্তৃগণের মাথুর কীর্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছ্বাসে জীবন্ত দুঃখাশ্রু ও মর্ম্মবেদনার স্রোতঃ ঢালিয়া দিয়াছে।

প্রস্ফুট কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল্ল পদ্মদলের ন্যায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু—এই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের। ইহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়, অপরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাঁহার লীলাকাহিনী যাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা পাছে এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট্, ডাইডোর সঙ্গে বৈষ্ণব কবি-অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করান, এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব-পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য ; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণভ্রম হইয়াছে, তাহার পর * "কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।" * প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয় ; * "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন॥" (চৈ. ভা.)।

বৈষ্ণবপদাবলীর সত্যতা।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু-নিঃসৃত প্রেমদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীনা বঙ্গভাষা যাঁহার পবিত্র

স্পর্শে গঙ্গাধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম। এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব

যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সে নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ত্রুটি উৎকৃষ্টভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম দুইজন শাস্ত্রচর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে 'রাজা' উপাধি পাইবার যোগ্য ; শেষোক্ত জনও অল্পবয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্যঃ-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে ; কিন্তু তৃতীয় জন তুলনা-রহিত, মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।

নবদ্বীপের তিনটি রত্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল ; মল্লযুদ্ধের দিনগতে তথায় তর্কযুদ্ধই প্রশংসা অর্জ্জনের পন্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপোখেরা, হাটডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপোখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল ; নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশ-ব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে।[১] উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিকপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি পাড়ার নাম চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

১৫শ শতাব্দীর নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয় ; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। এসকল সত্ত্বেও নবদ্বীপবাসী স্বল্পসংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মঙ্গল-চণ্ডী, বিষহরি ও ষষ্ঠীর পূজা ; যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত, এবং

১. ভক্তি রত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ।

পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দুরহীন রমণীললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। প্রবাদ আছে, ইঁহাদের অভাব পূরণ করিতে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন॥

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,— ইঁহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার করিতেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইঁহাদের সকলের মিলন হইয়াছিল। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীচৈতন্যবল্লভ দত্ত। বূঢ়নে—হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে—শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহারা দীপশলাকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে?

নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মেলন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে। এক দিনে আম্রবীজ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদ্গম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য-লাভ, সুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চক্রের আবির্ভাব, ষড়্ভুজপ্রকাশ ইত্যাদি। এসব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সকল প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নয়নাশ্রুর ন্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে। যে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ব্ব কি মনোহর হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

অলৌকিক লীলা।

জন্ম ও শৈশব

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃ., ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) সন্ধ্যা[১] ৬।৭ ঘটিকার সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা

১. জ্যোতিষিক গণনায় এই সময়টা ঠিক হয় কিনা বলিতে পারি না। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার জন্ম হয়, এই রাত্রে চন্দ্রগ্রহণের সময় দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক; বাড়ী শ্রীহট্ট,—নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব আমরা নবদ্বীপবাসী ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নাই—অক্ষরগুলি গোটা গোটা, অতি সুন্দর। চৈতন্যের জন্মিবার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৯০ শকে এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক এখন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের নিকট আছে।[১] নবদ্বীপে পাঠ সমাপনান্তে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় শচীদেবী সম্পর্কে এই ছত্রটি পাওয়া যায়ঃ— * "শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্ব কায়।"* শচীর গর্ভে ৭ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মে। সব কয়টি কন্যারই অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চায় বিব্রত যুবক বিশ্বরূপ বিবাহরূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ,— * "এহি যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥—(চৈ. ভা., আদি)।*

জন্ম ও বংশ-পরিচয়।

শৈশবে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটি নবদ্বীপে বড় শান্তশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি গঙ্গা-স্নানকারী ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন। অভিযোগগুলি এইরূপ,—একজন বলিতেছেন,— * "সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া॥"—(চৈ. ভা., আদি); "কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥"—(চৈ. ভা., আদি)।*

শৈশবে উচ্ছৃঙ্খলতা।

গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজালের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমকালে অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া যাইত না। শিশু চৈতন্য-প্রভু তামাসা দেখিতেন; এই সকল

১. লাট কারমাইকেল সাহেব ঐ পুস্তকখানি মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায়ের নিকট আমি শুনিয়াছি।

অভিযোগকারিণী বালিকাদের মধ্যে কাহারও নালিস গুরুতর রকমের ছিল। *"কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"—(চৈ. ভা., আদি)॥ *[১] প্রভুর বয়স তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন ; মাতা কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,— * "প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস্ পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে॥ মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান॥—(চৈ. ভা., আদি)। * এই উত্তরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিম্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না। যেহেতু এই ক্ষুদ্র উত্তরটুকুতে ভেদজ্ঞান-শূন্য সার্ব্বভৌম দার্শনিক তথ্যের আভাস আছে। যেরূপ ভাবেই হউক, শিশুর সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া এক সময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিত। তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন—আমরা চৈতন্য প্রভুর বাল্য ও কৈশোরের এই তিন অধ্যাপকের নাম পাইয়াছি।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক

* "কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।" * বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। নিমাইএর পড়াশুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে পাগলামি করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর দুরন্ত ছেলে পড়াশুনা লইয়া পাগল হইল।

পাঠে একাগ্রতা।

"কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।" "আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী। ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব্বে দেবমণি॥" "না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে॥" "পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥" "একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥"—(চৈ ভা., আদি)।

১. এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্য ইহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই ; বালিকাগণ নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,—

"পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥"—চৈ. ভা., আদি।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে; সে পাগলামির লীলারস বড় মধুর—উহা তাহার উদ্দাম ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ প্রকৃতির সহজ খেলা—উহা নির্ম্মল জলস্রোতের ন্যায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা বিম্বিত। নব-যুবক তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুরারিগুপ্ত বয়সে অনেক বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই বলিতেছেন;—

পাণ্ডিত্য ও টোলের অধ্যাপকতা।

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"—(চৈ. ভা., আদি)।

গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া,—

"হাসি দুই হাত প্রভু রাখিয়া ধরিলা। ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥ জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"—(চৈ. ভা., আদি)।

এইরূপে তিনি পথিকদিগকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যঞ্জক হাস্য ও শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ বর্ষ মাত্র।

কেশবকাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হইলেন; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্যমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি স্তোত্র রচনা করিলেন; শ্লোকগুলির সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর অখণ্ড-অভিমান-স্ফীত মুখমণ্ডল খর্ব্ব ও মলিন করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম ছত্রের 'ভবানী-ভর্ত্তৃ' শব্দে 'বিরুদ্ধমতি দোষ', 'বিভবতি' শব্দের পরে 'ক্রমভঙ্গদোষ',

দিগ্বিজয়ী জয়।

'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস', ইত্যাদি। যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতী, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বও অবগত ছিলেন, একথা দিগ্বিজয়ী কখনও মনে ভাবেন নাই। তাই দম্ভভরে বলিয়াছিলেন ;—

"ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ —(চৈ. চ., আদি)।

কিন্তু এবার তাঁহার স্পর্দ্ধা বৃথা হইল। প্রভু যখন তাঁহার রত্নমুষ্টির ন্যায় কবিতাটিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ভস্মমুষ্টির মত প্রতিপন্ন করিলেন, তখন দিগ্বিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন্ পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

ব্যঙ্গ-প্রিয়তা।

এই তরুণবয়সে প্রবীণশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টীয়াগণকে দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন ; তিনি খাঁটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসিগণের এইজন্য একটু ন্যায্য কষ্ট হইত,—

"শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয় ॥ পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার ॥"—(চৈ. ভা., আদি)।

কিন্তু রহস্যপ্রিয় ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। * "তাবৎ শ্রীহট্টীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর। মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া"—(চৈ. ভা., আদি)।*

ধর্ম্মহীনতা শুধু ভাণ।

ধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা,—বিদ্যা বৃথা। সকলেই নিমাইকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে যাইত। রহস্যের স্রোতে ধর্ম্মকথা ভাসাইয়া দিয়া নিমাই হাসিতেন। ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্ম্মে মতি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। * "প্রভু কহে এ ধাতু আত্মনেপদী নয় ॥" * ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্ম্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্যপ্রিয়তা প্রকৃত ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাধরকে

দেখিলে মনে মনে আহ্লাদিত হইতেন এবং ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইয়া যাইতেন।

এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ-শেফালিকার ন্যায় পবিত্র ছিল; ইঁহার চাপল্য—স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময় রসপূর্ণ খেলা,—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত। এই নির্ম্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরল ভক্তি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,— * "উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী। লই, পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।"—(চৈ. ভা., আদি)। * ইহা দ্বারা জানা যায়, নিমাই-পণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল।[1] তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস প্রভৃতি পুস্তক-বর্ণিত পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণকাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ।

নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীগণের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ন্যায় যখন তিনি জননীদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী-ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই জানিতে পারিলেন, সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। নবীন পণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু নিজে বোধ হয় প্রবোধ পান নাই[2]; পিতৃপিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াযাত্রা করিলেন;

স্ত্রীবিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়।

১. চৈতন্য-প্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—যথা—"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈল্য চমৎকার।"

২. চৈতন্যদেব লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গার ঘাটে প্রায়ই দেখিতেন এবং এই উপলক্ষ্যে চারি চোখের মিলন হইত। ফুলধনুর অব্যর্থ সন্ধানে এইভাবে উভয়ের মনে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তখন বিবাহ দেওয়া শচীদেবীর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেব মাতার অনিচ্ছায় দুঃখিত

এবার তাঁহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্থস্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে একখানি দেবতার ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব বোধ হইল; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমার-হট্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল;— * "প্রভু বলে কুমারহট্টের নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥ * * * ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"—(চৈ. ভা, আদি)। * বলিয়া নিমাই সাশ্রুনেত্রে কুমারহট্টের ধূলিরেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন।

গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছ্বাস।

ইহার পর আর এক দৃশ্য,—সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত। স্ত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন; যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে * "ব্যাকরণের করয় টিপ্পনী আপনার॥" —(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)। "বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত। 'বিদ্যাসাগর' নামে টীকা যাহার রচিত॥"—(অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৩৪, পৃ.)। বলি-দলিত, যে চরণরেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গি-গণের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজস্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে পান নাই, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।"

এই অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেগময় যুবককে সঙ্গিগণ নানা উপায়ে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন। গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদপদ্মের কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা রুদ্ধ হইয়াছে; 'কি দেখিয়াছি' বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমান্ পণ্ডিত, আবার গদাধরের কণ্ঠ

হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া শচীদেবী স্বীকৃত হন। লক্ষ্মীর অপঘাত মৃত্যুই চৈতন্যদেবের সংসার বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ। কিন্তু চৈতন্যদেবের বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ তিনি বিবাহের প্রস্তাবটি প্রথমতঃ ভাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। বরং তাঁহাকে যখন শচীদেবী পুত্রের নিকট লইয়া আসিতেন—তখন "দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়" বৃন্দাবন দাসোক্ত এই সকল উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হয়। লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,— * "লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয় ক্রন্দন॥"—(চৈ. ভা., আদি)।

মন্ত্রগ্রহণ, সন্ন্যাস ও ভক্তি-মাধুর্য্য।

ইহার পর কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন হইল; তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র (১৫০৯ খৃ.)।

গয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ। এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাসের পটে যুগযুগান্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া থাকে। বক্তৃতার গুণ নহে,—রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন;—শিশিরস্নিগ্ধকুসুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না। চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে; সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই—বেশ্যাদ্বয় তাঁহাকে প্রতারিত করিতে যাইয়া কাঁদিয়া পদে শরণ লইয়াছে। ভীলপন্থ, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাঁদিয়া পায় ধরিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে। তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন। বেঙ্কট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন; এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব্ব গৌর কান্তিতে দৈবপ্রতিভার বিদ্যুৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে আশ্চর্য্য ভক্তির প্রভা দেখিয়া কাঁদিয়া 'হরি বোল' বলিয়াছে। সত্যই যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণা নগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—"তোমার হরি ঐ পুষ্করিণীতে আছেন।" তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি ধ্রুব-প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া॥

এই অপূর্ব্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিস্ময় ও প্রেম জন্মিয়াছিল,—তাহা অলৌকিক উচ্ছ্বাসময়। শ্রীবাস অঙ্গনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব সঙ্গিগণ সহ হরিনাম-কীর্ত্তনে উন্মত্ত ছিলেন, নিশি কিরূপে ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব্ব সম্মেলনের সুখ উপভোগের বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,— * "চমকিত হইয়া সবে চারিদিকে চায়। নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভরায়॥ কোটি পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে। যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণের চাহে॥"—(চৈ. ভা., মধ্যখণ্ড।) * অদ্বৈত গোঁসাই বলিয়াছিলেন,— * "শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রভুর নিন্দা সহন না যায়॥" * লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,— * "যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে। সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে॥"—(চৈ চ., মধ্য, ১ম পৃঃ)। * চিরসঙ্গী গোবিন্দভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শান্তিপুর যাইতে আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। * "এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে॥"—(কড়চা)। * হরিদর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি যেদিকে পড়িয়াছে, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—* "বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়। সেইদিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥"—(গোবিন্দদাসের কড়চা)।* পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস— * "যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই॥"— * পদে এই মূর্ত্তির আবেশময় প্রতিবিম্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ দেখি নাই ; যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্ম্মকাব্যগুলি রূপকথার ন্যায় বোধ হয়।

তাঁহার প্রতি লোকানুরাগ।

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদ্যোজাত প্রিয় শিশুর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে 'নবদ্বীপচন্দ্র', 'নগরবাসী', 'নদেবাসী', প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ ; * "মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।

পুষ্পসম কোমল কঠিনবজ্রময়॥"— * কৃষ্ণদাস কবিরাজের কণ্ঠে ভবভূতির উক্তির প্রতিধ্বনি।[১] পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ হয় না, পুষ্প-ভারাবনত ব্রততীজড়িত দেবদারুর ন্যায় মহাপুরুষগণ নানা-কোমল-গুণ-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্ল পুষ্পের ন্যায় মনোহর দেখায়, অন্যদিক হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের ন্যায় ঋজু বিরাট্, অন্যদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয়ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—ইঁহার মৃদুতায়ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত;— * "তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঞি॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কার দেন ত আপনে॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥"—(চৈ. ভা., মধ্য)। * তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হস্তের পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য।

পৌরুষ ও বিনয়।

কিন্তু এই মৃদু পুষ্পসম ব্যক্তিও কোন কোন সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন। তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্ত্তিতে পরিণত হইত। জগদানন্দ একটি তূলার বালিশ তাঁহার জন্য রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য, * "জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে" * বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ ভৎ'সনা করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি সুগন্ধি তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল, প্রভুর বিরাগ দেখিয়া জগদানন্দকে তাহা আঙ্গিনায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। গোবিন্দ ঘোষ প্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য একার্দ্ধ হরীতকী দিয়া অপরার্দ্ধ পরদিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সঞ্চয়বুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার শত অনুনয় বিনয় বিফল হইল। ছোট হরিদাস শিখী মাহিতির ভগিনী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, * "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"—(চৈ. চ., অন্ত্যখণ্ড)। * চৈতন্য তাহার মুখ আর দেখেন নাই।

কঠোর বৈরাগ্য।

১. "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" উত্তররামচরিত।

সনাতন মহাধনী, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিলেন, কৌপীনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু * "ভোটকম্বলের পানে প্রভু চাহে বার বার", * সুতরাং সনাতনকে ভোটকম্বল ত্যাগ করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যেদিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, সেদিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্তভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল। তাঁহার শোকক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, * "দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন" * (চৈ. ভা., মধ্য)। নির্ম্মম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল-প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভৃত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত ; কিন্তু শেষে দেখা গেল, উপবাসক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ চৈতন্যের আহৃত বোঝাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণু কৌপীনধারী, সত্যবাক্, বিষয়নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর ; যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ ঋষিবংশোদ্ভব মহাজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিখাইবার জন্য এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সোহহং।

এরূপ হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না ; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন ; গোপীগণ,— * "সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিই এই কৃষ্ণ', এই প্রকার কহিতে লাগিলেন" (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৩০ অ, ৩ শ্লোক)। * জয়দেবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, * "মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।" * বিদ্যাপতির গীতেও সেই কথার পুনরুক্তি আছে, * "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই॥" * ইহাই যোগীর * "সোহহং", * খ্রীষ্টের * "আমি এবং আমার পিতা এক।" * এইরূপ মুহূর্ত্ত চৈতন্যদেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্লপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উচ্ছ্বসিত পদ্ম স্বীয় দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সম্ভোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্যপ্রভুও সেইরূপ যাঁহাকে খুঁজিতেন, তাঁহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমানুষী প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে——বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তখন * "মুঞি সেই মুঞি সেই

কহি কহি হাসে।"—(চৈ. ভা., মধ্য)। * সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য ও তুলসীচন্দন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

কিন্তু ঐ ভাব অল্পকালব্যাপক; তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরভাবে তাঁহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, * "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ॥"—(গোবিন্দের কড়চা)। * রামানন্দ রায় তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলাতে চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, * "প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ শুক্ল বস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না জুয়ায়। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥ * * * পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥—(চৈ. চ. অন্ত্যখণ্ড)। * এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতী তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে হরির নাম সংকীর্ত্তন না করিয়া 'চৈতন্যজয়' বলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা নিবারিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন; বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভৎ'সনা

ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয়।

১. মহাপুরুষদের প্রতি নানারূপ অলৌকিক লীলা প্রয়োগ করা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালের আচরিত রীতি। চৈতন্যদেব সর্ব্বদাই অতি সতর্কভাবে এই প্রকার অতিভক্তি-পরায়ণ পরিকরদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান্ বলিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে কোন উৎসাহই দিতেন না, বরং গঞ্জনা করিতেন। এইজন্য পুরী ও দাক্ষিণাত্য-লীলার অলৌকিকত্বের আরোপ অতি অল্প. কিন্তু নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে তাহার শাসনাভাবে সেখানে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী বিনা বাধায় জন্মিয়া প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুরারিগুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের উক্তি ঐতিহাসিককে অতি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, এ বয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই ; তদুত্তরে— * "প্রভু কহে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা স্থত্র মুড়াইয়া॥ সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"—(চৈ. ভা., মধ্য)। * তুঙ্গভদ্রবাসী ঢুণ্ডিরামতীর্থ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব— * "মুরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি" * বলিয়া তাঁহাকে 'জয়পত্র' লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বর তীর্থে এক যোগী পণ্ডিতকেও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সব পণ্ডিত সকলেই তাঁহার সুধাকণ্ঠে হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্মত্ততা দেখিয়া করজোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ব্বশেষ উন্মত্তবৎ হরিনামের মাহাত্ম্য কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন ; বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবল মুখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহারা অভিনব সৌন্দর্য্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না।

লীলাবসান।

চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে (উড়িষ্যায়) বাস করেন, ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃ.) আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজেকে অসমর্থ ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় সমাজের মস্তকে ও চরণে—

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনাসূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া * "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" * বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইতর-জাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি হয়

না,—এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কলিদাস হাড়ির উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন—মহাপ্রভু তাহাতে প্রীত হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি হীন শূদ্র রামরায়কে দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। তদীয় অনুচর ভক্তকবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু 'দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। "আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই" এই কথা তিনি অটল নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। একথা চৈতন্য ভাগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে। তাঁহার শত শত ভক্ত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কাশীর বিদ্বান্ মণ্ডলীর অগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতী, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতকুলভূষণ ঈশ্বর ভারতী প্রভৃতি মহারথীদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভাববিহ্বলতা ও ভগবৎপ্রেম নারীজনোচিত উচ্ছ্বাস অথবা অজ্ঞের মত্ততা বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দী ছিল ভারতের শাস্ত্র চর্চ্চার যুগ—এই যুগে প্রতিষ্ঠা পাইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তিনি দেখিয়াছিলেন, "ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি। জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি।" শাস্ত্র ভগবৎভক্তির সহায়, এজন্য শাস্ত্রের দরকার। ভগবৎভক্তি জন্মিলে শাস্ত্রের কোন দরকার থাকে না, ফলের জন্যই পুষ্পের দরকার, ফল হইলে পুষ্প আপনা আপনি ঝড়িয়া পড়ে। * "মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে॥—(গোবিন্দের কড়চা) * ইহাও চৈতন্য প্রভুর উক্তি। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয়সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বহুভাষাবিদ্ ছিলেন ; তিনি উড়িয়ার দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া উড়িয়া ভাষা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। "জগন্নাথ পরিমুণ্ডাহ" প্রভৃতি পদগানে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। তিনি তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন, "কভু বা তামিল বুলি বলে গোরা রায়" ; যখন তিনি তেলুগু এবং মালয়ালম-ভাষী লোকদিগের দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই সেই দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। "একজন লোক আসি

কাইমাই করি। কি বলিল আমি তাহা বুঝিতে না পারি। তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমুঝিয়া। কাই মাই করি তারে দিলেন বুঝাইয়া॥" (কড়চা)। এই সকল ভাষা তিনি কোনো অপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা অর্জ্জন করেন নাই। গোবিন্দদাস ইহার একটা সরল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "এই দেশে (দাক্ষিণাত্যে) ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।"—গৌরপদ-তরঙ্গিণীর একটি পদে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু বাল্যকালে সংস্কৃতের সঙ্গে পালি এবং প্রাকৃত পিঙ্গল পড়িয়াছিলেন।

জীবনী লেখার সূত্রপাত ও বিকাশ।

রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আধুনিক কালের মনুষ্যগণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের বিশ্বাসের কথা ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় লোকবৃন্দ ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃসৃত শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল, কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্যচরিত্র পুনরায় গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রণিপাত সহকারে নরোত্তমের ন্যায় কায়স্থের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য হইয়াছেন; ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্য-মুকুরে প্রতিবিম্বিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্ম্মজগতে চিরকালের জন্য এক অপূর্ব্ব দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অফুরন্ত সুধা যুগ-যুগান্তরের জন্য হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাঁহার চিরস্মারক নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, কলিযুগের নব-গায়ত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

উৎকলকবি সদানন্দ চৈতন্যপ্রভুকে "হরিনামমূর্ত্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাম! প্রকৃতই তিনি হরিনামের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন।

পদাবলী সাহিত্য

আমরা পুনর্ব্বার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল পদকর্ত্তাই চৈতন্য-প্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্ত্তী। আমরা পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলম্বন করিয়া পদকর্ত্তাদিগের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি,—

	নাম		পদসংখ্যা
১।	অনন্ত দাস	...	৪৭
২।	অনন্ত আচার্য্য	...	২
৩।	আকবর এবং আকৃবর সাহ আলি	...	২
৪।	আত্মারাম দাস	...	৯
৫।	আনন্দ দাস	...	৩
৬।	উদ্ধব দাস	...	১১০
৭।	কবির	...	১
৮।	কবিরঞ্জন	...	৯
৯।	কমরালী	...	১
১০।	কানাই দাস	...	৪
১১।	কানু দাস	...	১৪
১২।	কামদেব	...	১
১৩।	কালীকিশোর	...	১৭৯
১৪।	কৃষ্ণকান্ত দাস	...	২৯
১৫।	কৃষ্ণদাস	...	২২
১৬।	কৃষ্ণপ্রমোদ	...	২
১৭।	কৃষ্ণপ্রসাদ	...	৫
১৮।	গতিগোবিন্দ	...	১
১৯।	গদাধর	...	৩
২০।	গিরিধর	...	১
২১।	গুপ্ত দাস	...	১
২২।	গোকুলানন্দ	...	১
২৩।	গোকুল দাস	...	১
২৪।	গোপাল দাস	...	৬
২৫।	গোপাল ভট্ট	...	২

নাম		পদসংখ্যা
২৬। গোপীকান্ত	...	১
২৭। গোপীরমণ	...	১
২৮। গোবর্দ্ধন দাস	...	১৭
২৯। গোবিন্দ দাস	...	৪৫৮
৩০। গোবিন্দ ঘোষ	...	১২
৩১। গৌরমোহন	...	২
৩২। গৌরদাস	...	২
৩৩। গৌরসুন্দর দাস	...	৩
৩৪। গৌরীদাস	...	২
৩৫। ঘনরাম দাস	...	১৪
৩৬। ঘনশ্যাম দাস	...	৩১
৩৭। চণ্ডীদাস	...	প্রায় ৯০০
৩৮। চন্দ্রশেখর	...	৩
৩৯। চম্পতি ঠাকুর	...	১৩
৪০। চূড়ামণি দাস	...	৯
৪১। জগদানন্দ দাস	...	৫
৪২। জগন্নাথ দাস	...	৯
৪৩। জগমোহন দাস	...	২
৪৪। জয়কৃষ্ণ দাস	...	১
৪৫। জ্ঞানদাস	...	১৯৪
৪৬। জ্ঞানহরি দাস	...	২
৪৭। তুলসীদাস	...	১
৪৮। দলপতি	...	১
৪৯। দীন ঘোষ	...	১
৫০। দীনহীন দাস	...	৩
৫১। দুঃখিনী	...	২
৫২। দুঃখীকৃষ্ণ দাস	...	৪
৫৩। দৈবকীনন্দন দাস	...	৪
৫৪। ধরণীদাস	...	১

নাম		পদসংখ্যা
৫৫। নটবর	...	১
৫৬। নন্দন দাস	...	১
৫৭। নন্দ (দ্বিজ)	...	১
৫৮। নরসিংহ দাস	...	১
৫৯। নরহরি দাস	...	১
৬০। নরোত্তম দাস	...	৬১
৬১। নবকান্ত দাস	...	১
৬২। নবচন্দ্র দাস	...	২
৬৩। নর-নারায়ণ ভূপতি	...	১
৬৪। নয়নানন্দ দাস	...	২২
৬৫। নসির মামুদ	...	১
৬৬। নৃপতিসিংহ	...	১
৬৭। নৃসিংহ দেব	...	৪
৬৮। পরমানন্দ দাস	...	১২
৬৯। পরমেশ্বর দাস	...	১
৭০। পীতাম্বর দাস	...	২
৭১। পুরুষোত্তম	...	৯
৭২। প্রতাপনারায়ণ	...	১
৭৩। প্রমোদ দাস	...	৫
৭৪। প্রসাদ দাস	...	১
৭৫। প্রেমদাস	...	৩১
৭৬। প্রেমানন্দ দাস	...	৫
৭৭। ফকির হবির	...	১
৭৮। ফতন	...	১
৭৯। বলদেব*	...	১
৮০। বলরাম দাস*	...	১৩১
৮১। বলাই দাস*	...	৩
৮২। বল্লভ দাস	...	২৬

* চিহ্নিত নামগুলি 'ব', অবশিষ্ট অন্তঃস্থ 'ব',এর অন্তর্গত।

	নাম		পদসংখ্যা
৮৩।	বংশীবদন	...	৩৮
৮৪।	বসন্তরায়	...	৩৩
৮৫।	বাসুদেব ঘোষ	...	১৩৪
৮৬।	বিজয়ানন্দ দাস	...	১
৮৭।	বিদ্যাপতি*	...	৮০০
৮৮।	বিন্দুদাস	...	৪
৮৯।	বিপ্রদাস	...	৬
৯০।	বিপ্রদাস ঘোষ	...	১৬১
৯১।	বিশ্বম্ভর দাস	...	২
৯২।	বীরচন্দ্র কর	...	১
৯৩।	বীরনারায়ণ	...	২
৯৪।	বীরবল্লভ দাস	...	১
৯৫।	বীর হাম্বীর	...	২
৯৬।	বৃন্দাবনদাস	...	৩০
৯৭।	বৈষ্ণবদাস	...	২৭
৯৮।	ব্রজানন্দ	...	১
৯৯।	ভূপতিনাথ	...	৭
১০০।	ভুবন দাস	...	২
১০১।	মথুর দাস	...	১
১০২।	মধুসূদন	...	৫
১০৩।	মহেশ বসু	...	১
১০৪।	মনোহর দাস	...	৬
১০৫।	মাধব ঘোষ	...	৯
১০৬।	মাধব দাস	...	৩৫
১০৭।	মাধবাচার্য্য	...	৫
১০৮।	মাধবী দাস	...	১৭

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদের যে বিপুল সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে মিথিলা ও বাঙ্গালা উভয় স্থান হইতে প্রায় ৮০০ পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সংগ্রহে রায়শেখর, কবিবল্লভ প্রভৃতি বহু কবির পদ তিনি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন।

নাম		পদসংখ্যা
১০৯। মাধো	...	৩
১১০। মুরারি গুপ্ত	...	৫
১১১। মুরারি দাস	...	১
১১২। মোহন দাস	....	২৭
১১৩। মোহিনী দাস	....	৪
১১৪। যদুনন্দন	...	৯৪
১১৫। যদুনাথ দাস	....	১৭
১১৬। যদুপতি	...	১
১১৭। যশোরাজখান	...	১
১১৮। যাদবেন্দ্র	...	৩
১১৯। রঘুনাথ	...	৩
১২০। রসময় দাস	...	২
১২১। রসময়ী দাসী	...	১
১২২। রসিক দাস	...	৩
১২৩। রামকান্ত	...	১
১২৪। রামচন্দ্র দাস	...	৪
১২৫। রামদাস	...	২
১২৬। রাম রায়	...	১
১২৭। রামী	...	৪
১২৮। রাধাসিংহ ভূপতি	...	৪
১২৯। রাধাবল্লভ	...	২৯
১৩০। রাধামাধব	...	১
১৩১। রাধামোহন	...	১৭৫
১৩২। রামানন্দ	...	১৫
১৩৩। রামানন্দ দাস	...	১
১৩৪। রামানন্দ বসু	....	৯
১৩৫। রূপনারায়ণ	...	৩
১৩৬। লক্ষ্মীকান্ত দাস	...	১
১৩৭। লোচন দাস	....	৩০

	নাম	পদসংখ্যা
১৩৮।	শঙ্কর দাস	৪
১৩৯।	শচীনন্দন দাস	৩
১৪০।	শশিশেখর	৩
১৪১।	শ্যামচাঁদ দাস	১
১৪২।	শ্যামদাস	৩
১৪৩।	শ্যামানন্দ	৭
১৪৪।	শিবরায়	১
১৪৫।	শিবরাম দাস	২৫
১৪৬।	শিবাই দাস	৭
১৪৭।	শিবানন্দ	৪
১৪৮।	শিবাসহচরী	১
১৪৯।	শ্রীনিবাস	৩
১৫০।	শ্রীনিবাসাচার্য্য	২
১৫১।	শেখর রায়	১৭৬
১৫২।	সদানন্দ	১
১৫৩।	সালবেগ	১
১৫৪।	সিংহভূতি	৭
১৫৫।	সুন্দর পাল	২
১৫৬।	সুবল	১
১৫৭।	সেখ জালাল	১
১৫৮।	সেখ ভিক	১
১৫৯।	সেখলাল	১
১৬০।	সৈয়দমর্ত্তুজা	১
১৬১।	হরিদাস	৭
১৬২।	হরিবল্লভ	৪
১৬৩।	হরেকৃষ্ণ দাস	২
১৬৪।	হরেরাম দাস	১

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ

দিতেছি।[১] প্রথমতঃ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব।

কীর্ণাহারে কিঙ্কিন নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তথায় কাছারী-ডাঙ্গা নামে একটি স্থান আছে, এখানে রাজার দরবার গৃহ ছিল। যেখানে রাজার শস্যশালা ছিল তাহার নাম এখন লাজডিহি। জ্ঞান-চন্দ্রিকা নামে একটি স্থান আছে, এখানে রাজার সভাপণ্ডিত বাস করিতেন। প্রবাদ, চণ্ডীদাস এই রাজার সভাপণ্ডিত বা সভাকবি ছিলেন। রাজার স্ত্রীর নাম ছিল দুর্গাবতী। কিলগির খাঁ নামক এক পাঠান এই রাজাকে হত্যা করেন। রানী দুর্গাবতী অত্যাচারের আশঙ্কায় অদূরবর্ত্তী মহেশপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া বাস করেন। এই স্থানের নাম এখন রাণীপাড়া, ইহার নিকটে এখন স্যালদহরা নামে এক শ্মশান আছে। কীর্ণাহারের যেখানে কিলগির খাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থান এখন পাঠান-ডাঙ্গা নামে খ্যাত। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া ইঁহার বেগম চণ্ডীদাসের প্রতি অনুরক্ত হইলে ইনি চণ্ডীদাসকে হত্যা করেন। কিলগির খাঁর সিপাহীরা আক্রমণ করিতে আসিলে অকস্মাৎ নাটমন্দির পতনে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। ক্রুদ্ধ সিপাহীগণ কীর্ণাহার হইতে নান্নুরে আসিয়া বাসুলীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটীর ধ্বংস করেন। কিন্তু যখন রামীর পদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, গৌড়েশ্বর গান শুনিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান, তখন আমরা এই জনশ্রুতি গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আরও নূতন কথা।

নান্নুরের পাশ দিয়া পূর্ব্বে অজয় নদ অথবা তাহার একটি শাখা প্রবাহিত হইত। প্রাচীনগণ এখনও তাহার চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। সেকালে ঐ অজয় অথবা তাহার শাখা নদীর তীরবর্ত্তী একটি স্থান বাণিজ্যের জন্য খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখনও সেই সমৃদ্ধ পল্লীর 'বন্দর' নাম ঐই অতীত কাহিনীর স্মৃতি বহন করিতেছে।

নান্নুরে নলরাজার বাড়ী ছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের নিকটে নলগড়্যো, টিগড়্যে, তেলগড়্যে নামে তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধানো তিনটি পুকুর আছে। এই স্তূপের উপরে বর্ষার জলে মাটি ধুইয়া গেলে অনেকেই স্বর্ণ

১. ইহার পরে আমার ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ. আরও প্রায় ১৪ জন নূতন পদকর্ত্তার পদ আবিষ্কার করিয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে আরও বহু মহাজনের পদ অপ্রকাশিতভাবে আছে। এই তালিকা আর দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

মুদ্রাদি পাইয়াছে। এইরূপে একটি স্বর্ণ মুদ্রা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পাইয়াছিলেন, ইনি বিশালাক্ষী দেবীর সেবাইৎ ছিলেন। এই মুদ্রায় নরবালাদিত্যের নাম খোদিত আছে। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। গ্রামের পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহার নাম সাতরায়ের দীঘি। নলবংশীয় রাজা সাতরায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া কিঙ্কিনের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ণাহার অঞ্চল দখল করেন। কেহ কেহ বলেন রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সাত রাণী ঐ দীঘির জলে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন।

আমাদের প্রদত্ত কবি তালিকা সম্পূর্ণ নহে। কাষ্ঠ-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা অজ্ঞাত অবস্থায় আছে, তাহাদের একটা সদ্গতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়া প্রদত্ত তালিকায় এক কবির নামের স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত "গোবিন্দগণ" বিখ্যাত পদ কর্ত্তা গোবিন্দ দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন[১]; দাসশব্দের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যসূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদ-দ্বারা তাঁহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে,—

বিভিন্ন গোবিন্দ দাস।

১. গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাসী। ২. শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র মালিহাটী-নিবাসী গোবিন্দ আচার্য্য। ইনি "গতিগোবিন্দ" নামে পরিচিত; ("জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দ রসময়। জয় তছু ভকত সমাজ॥" পদকল্পতরু)। ৩. গিরীশ্বরদত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত। ৪. কুলীন-গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে 'দাস' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'ঘোষ' সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন; ("গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"—(চৈ. চ.)। ৫. কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। ৬. প্রসিদ্ধ কড়চা-লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার। ৭. গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নিবাস বোরাকুলি—মুরশিদাবাদ, শ্রীনিবাস-শিষ্য। ইহা ছাড়া মৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের কথাও আমরা শুনিয়াছি।[২]

১. পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; সুতরাং ইঁহারা সকলেই পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

২. ইঁহার সৌভাগ্য যে, ইনি বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপের পূর্ব্বপুরুষ। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় গোবিন্দ দাস কবির শ্রেষ্ঠ পদগুলি মৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের উপরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন দিতে পারিলে বর্ত্তমান রাজবংশের অনুগ্রহ লাভ করার কল্পনা মনে উদিত হওয়া সহজ। যে বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের পদের গৌরব 'ভক্তমাল', 'নরোত্তম চরিত', 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাস', প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে এবং

বলরামদাস ৪।৫ টি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়। ১. মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমনের সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায়। (রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত ॥ (গোবিন্দের কড়চা)।

বিভিন্ন বলরাম দাস এবং অপরাপর কবি।

* বৈষ্ণব বন্দনায় তিনজন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। * ২. "সংগীতকারক বন্দ্যো বলরামদাস। নিত্যানন্দ-ধর্ম্মে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥" ৩. "কানাইখুটিয়া বন্দ্যো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥" বৈষ্ণব বন্দনা।[১] "বন্দ্যো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয়। জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয়॥ ৫. প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও "বলরাম" নামে পরিচিত। ৬. নরোত্তম-বিলাসে 'পূজারি বলরাম' নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। ৭. উক্ত পুস্তকে 'বলরাম কবিরাজ' নামক অপর একটি 'বিজ্ঞ ব্যক্তি'র উল্লেখ আছে। ৮. পদকল্পতরু ভূমিকায়—"কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম" পাওয়া যায়। ৯. অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। ১০. প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র করিবাজের শিষ্য "কবিপতি বলরাম" নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই ১১. শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১১ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশিরবাবু স্বীয়কৃত সুন্দর সুন্দর পদে 'বলরাম দাস' ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সমস্যা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়।

যদুনন্দন[২] চক্রবর্ত্তী যদুনন্দন দাস উভয়েই পদকর্ত্তা সুলেখক। চক্রবর্ত্তী

যাঁহার নির্ম্মল যশোভাতি সমস্ত বৈষ্ণব পদসংগ্রহগ্রন্থ সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মহাকবির যশঃ ক্ষুণ্ণ করিয়া মৈথিল রাজবংশীয় কবিকে মিথ্যা গৌরবে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই মেকী চলিবে না। বঙ্গীয় পদ-সংগ্রহসমূহে এক বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্য কোন মৈথিল কবির পদ দেওয়া হয় নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গালী সংগ্রাহক তাঁহার পদগুলিকে বিশেষ গৌরব দিয়া পদকল্পতরুতে স্থান দিয়াছেন। বাহিরের অন্য কোন কবির পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ, মহাশয় অশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত এই মেকী ধরিয়া দিয়াছেন।

১. কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মানুষ নহেন। 'জগন্নাথ বলরাম' তাঁহার জীবিকা সংস্থান করিয়াছেন ও তিনি তাঁহাদিগকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া "দুই পুত্র" কহা হইয়াছে।

২. যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মী, ইঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন।

অনেক স্থলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার বাড়ী কাটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য ও চৈতন্য-প্রভুর চরিতলেখক। "যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য —"দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে না করিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥"—ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য-প্রভুর পার্শ্বচর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্ত্তা। জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনিও একজন পদকর্ত্তা—ইঁহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ স্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা বিশুদ্ধ নহে; উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধারকার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার তালিকায় চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ১১০ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১০৬ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। "বীরভূম" সম্পাদক স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি. এ., ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের আরও অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নূতন পদগুলি লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ৯০০ হইবে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডীদাসের ২০।২৫টি নূতন পদ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত "হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে" ইত্যাদি পদটি ১১১২ সালের লেখা একটি পাত্‌ড়ায় চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্তভাবে পাওয়া গিয়াছে। পাত্‌ড়াখানি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবযুগের রচিত শাখা-সাহিত্য অতি সুবিস্তার। বড় বড় মহাজনগণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য্য। শুধু 'দাস' শব্দের বাহুল্য দ্বারা পরিচয়ের পথ দুর্গম হইয়াছে, এমন নহে, কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে "বিদ্যাবল্লভ" লিখিয়াছেন।[১] শ্যামানন্দ পুরী নিজকে "দুঃখিনী" ও শিবানন্দ

তালিকার ভ্রম সম্ভাবনা।

১. গীতচিন্তামণি দেখুন।

আপনাকে "শিবসহচরী" নামে ভণিতা দিয়াছেন।[১] সুতরাং স্ত্রীলোকের নাম পাইলেই আমরা স্ত্রীলোকশ্রেণীভুক্ত করিয়া পদকর্ত্তারূপে পরিচয় দিতে সাহসী নহি। রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভণিতাযুক্ত পদগুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করা গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও পদের উল্লেখ করিয়াছি।[২]

স্ত্রীকবি ও মুসলমান কবিগণ।

পদকর্ত্তৃগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই; বড় বড় কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই পাওয়া যায়; কবিগণের সুন্দর পদগুলি আছে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে সে যেমন শাখার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, কবিতার সঙ্গে কবির সম্পর্কও সেইভাবে এদেশে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কে দিয়া গেল আমরা তাহার খোঁজ খবর লইতে কখনও উৎসাহী হই নাই। যে জিনিষ পাওয়া গেল তাহাই শুধু দেশ-লক্ষ্মী কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

লুপ্ত জীবনী।

এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাঁহার বাড়ী কুমার-নগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়াবুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।

গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃৎ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদকল্পলতিকায় আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রসিদ্ধিলাভের উপযোগী কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তাঁহার 'স্মরণদর্পণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে; শুনিয়াছি 'বঙ্গজয়' নামক মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার একখানি বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ আছে, আমরা তাহা পাই নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব-সমাজের ভূষণ

---

১. পদকল্পলতিকা দেখুন।

২. প্রদত্ত তালিকায় ৩, ৭, ৯, ৬৫, ৭৭, ৭৮, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮. ১৫৯, ১৬০, সংখ্যার নাম দ্রষ্টব্য।

ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করায়, তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরসুহৃদ্রূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গালা লেখার চেষ্টা না করায়, তাঁহার স্মৃতি এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্নিত পত্রে বিলীনপ্রায়।

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে; দুঃখের বিষয়, ঐ সকল বিবরণে তাঁহার জীবনের কতিপয় স্থূল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব, ভাবপ্রবণতা ও অন্তর্জ্জীবনের চিত্র ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া-বধুরীতে ও বৃন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক চরিত জানি না।

এরূপ কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তৎপর গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদনুসারে অনুমান ১৫৭৭ খৃ. অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি এই অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাজের প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় ভ্রাতাই 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাঁচা-গড়িয়ানিবাসী চৈতন্যসহচর দ্বিজ হরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদাস বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন। শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়, * "নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥" —(ভক্তিরত্নাকর, ১৪ তরঙ্গ)। *

১৫৩৭ খৃ. অব্দে[১] শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃ. অব্দে তাঁহার

১. শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের মতে গোবিন্দ দাসের জন্ম ১৫২৭ খৃ. এবং মৃত্যু ১৬১২ খৃ. অব্দ।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃ. (সাহিত্য ১২৯৯, আশ্বিন)।

মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে 'সঙ্গীতমাধবে'র অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এস্থলে আর একটি কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়।[১] শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বকৃত টীকায় ইহার একটির সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন ;—

"বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্ ॥"

গোবিন্দদাস যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; তিনি এই ইতিহাস-বিশ্রুত রাজেশ্বরের নাম তাঁহার কোন কোন ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এক পত্রে ১১ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাস উক্ত ১১ স্থলের অন্ততঃ ৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেমবিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি বন্দনায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে "কবিনৃপবংশজ" (কবিরাজ) বলা হইয়াছে। বলরাম দাস গোবিন্দ দাসের ভাগিনেয় ছিলেন। গোবিন্দ দাস-কৃত সঙ্গীতমাধবে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র "কবিনৃপতি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং "কবিনৃপজ বংশজ জয় ঘনশ্যাম, বলরাম"—পদকল্পতরুধৃত এই পদের উদ্দিষ্ট কবি বিখ্যাত বলরাম দাস। "বলরাম কবিরাজ" নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় "সঙ্গীত কারক" ও "নিত্যানন্দশাখাভুক্ত" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। সুতরাং পদকর্ত্তা বলরামদাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।[২] বলরাম দাসের

বলরাম দাস।

১. এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—"শ্রীগোবিন্দদাস কহয় মহিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥" "রামদাসের পহুঁ সুন্দর রসবর গৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস গুণগানে ॥"—(পদকল্পলতিকা)।

২. "গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ইঁহারা দুইজন এক ব্যক্তি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেমবিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের ভাষা সাদা সিধা গদ্যের ন্যায়, কিন্তু তৎকৃত পদগুলি কবিত্বময়;

পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আত্মারাম দাস-কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস-রচক বলরাম (নিত্যানন্দ নামধারী) এবং পদকর্তা বিখ্যাত বলরাম দাস, একব্যক্তি কিনা—তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্তা বলরাম যে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি যে কবি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাহা ছাড়াও এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে—বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক কোন ব্রাহ্মণবংশ কবি বলরাম দাসকে দাবী করিতেছেন।

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরভূম জেলার এক-চক্রাগ্রামে (মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট) নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল; সিউড়ির বিশ ক্রোশ পূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম; তথায় ব্রাহ্মণ-বংশে ১৫৩০ খৃ. অব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত; খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব এবং সেই সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়।

গদাধরের শিষ্য যতুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ইনি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত 'রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কদম্ব' পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৬০০০। কিন্তু মালিহাটী বৈদ্যবংশীয় কবি যতুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃ.) তাঁহার অপেক্ষা বেশী যশস্বী। পদকল্পতরুর বন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত

যতুনন্দন দাস ও যতু-নন্দন চক্রবর্তী।

আছে,— * "প্রভুসুতাচরণসরোরুহ মধুকর জয় যতুনন্দন দাস।" * প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য। যতুনন্দন, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃ. অব্দে

বৃন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না। আমরা এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"—এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাদটীকায় আমরা উপরি উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি অচ্যুতবাবু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার এই মতের পরিবর্তন হয়। তৎপূর্ব্বেই আমি নব্যভারত ১৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যায় (তোমার মতানুযায়ী) পদকর্ত্তা বলরামকেই প্রেমবিলাস-প্রণেতা বলিয়াই জানি।"

ঐতিহাসিক 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দলীলামৃতের অনেক স্থলেও ইতি "শ্রীল হেমলতার" গুণ বর্ণনা করিয়াছেন ; ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, যদুনন্দন 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' ও রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের পয়ারানুবাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্ত্তা বলিয়াই ইঁহার যশঃ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত দাম 'প্রেমদাস'; ইনি নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস; ইনি গোবিন্দদেবের মন্দিরের (বৃন্দাবনে) পূজারি ছিলেন। ১৭১২ খৃ. অব্দে ইনি 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপরে কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন।

প্রেমদাস।

পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের শ্বশুর প্রসিদ্ধ সূর্য্যদাস সরখেলের[১] ভ্রাতা; গৌরীদাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট অম্বিকাগ্রামে; ইনি চৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন, কথিত আছে চৈতন্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতা গ্রন্থখানি ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। ইনি নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অম্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত সদ্গোপকুলভূষণ শ্যামানন্দ নবদ্বীপ ভ্রমণকালে ইঁহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন।

গৌরীদাস।

রায় বসন্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। শেষ বয়সে ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন এবং জীবগোস্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে, * "হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লইয়া আইল তেহোঁ আচার্য্যসভায়॥" (১৪ তরঙ্গ)। * এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ব্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, * "জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদা মত্ত রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়॥"—১২—বিলাস। * সুতরাং ইঁহাকেই পদকর্ত্তা 'দ্বিজবসন্তরায়' বলিয়া বোধ হয়; যশোহরনিবাসী কায়স্থ "রায় বসন্তের" নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দদাস-কবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু রায় বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীখণ্ডের নরহরি

রায় বসন্ত।

১. ইঁহার দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন।

সরকার (১৪৭৮—১৫৪০ খৃ. অব্দ) মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন ; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন ; কথিত আছে, নরহরি চির-কৌমারব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচনদাসের গুরু ও 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত। ইঁহার পথ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃ. অব্দে গুপ্ত হন।

নরহরি সরকার।

বসু রামানন্দ।

বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু ইঁহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন ; ইনি বিখ্যাত 'জগন্নাথবল্লভ' নামক নাটক রচনা করেন, চৈতন্যদেব ইঁহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ খৃ. অব্দের মাঘমাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয়। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম নামে পরিচিত, কিন্তু * "কবিনৃপজ ভুবন-বিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম ॥" * পদকল্পতরুর এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ঘনশ্যাম নামে অপর একজন পদকর্ত্তা কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র।

রায় রামানন্দ।

ঘনশ্যাম ও অন্যান্য পদরচয়িতা।

পীতাম্বর দাস যে রসমঞ্জরী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাঁহার কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীচৈতন্যপ্রভু যে সময় নীলাচলে ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তাঁহার নিকট রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম এবং তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল। **রামগোপালের** রসকল্পবল্লী পাওয়া গিয়াছে, উহা ১৭৪৩ খৃ. অব্দে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পুত্র **পীতাম্বর দাস** "রসমঞ্জরী" সঙ্কলন করেন। রসমঞ্জরীতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের পদই অধিকাংশ। সঙ্কলিত পদাবলী দৃষ্টে বোধ হয়, পীতাম্বরের রসবোধ ও পদ মনোনীত করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। তাঁহার

স্বকৃত পদগুলিও বেশ সুন্দর। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার পিতা গোপাল দাসের (রামগোপাল দাসের) পদ কিছু বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; ইহা পিতৃভক্তির পরিচায়ক, কিন্তু সাহিত্যসেবীর পক্ষে সঙ্গত কার্য্য নহে। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের দুইটি পদ (যথা, * "ভাল হৈলা আরে বঁধু আইলা সকালে" * ইত্যাদি ও * "চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে" * ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।[১]

জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম পরমানন্দ এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন এবং জগদানন্দও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অপরাপর বৈষ্ণবভক্তের ন্যায় ইঁহার জীবন সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক ৺কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৭০৪ (১৭৮২ খৃ.) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহার নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে জগদানন্দের অল্পসংখ্যক কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে।

যাঁহারা শুধু ললিতশব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই। হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে কবিতার নিভৃত স্থান এ কবিতা সে শ্রেণীর নহে,—শুধু ললিত শব্দপ্রহেলিকায় শ্রুতিকে অব্যক্ত সুখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম লক্ষ্য ; কিন্তু যমক অলঙ্কার ও 'ম'-কার, 'ল'-কারের নিবিড় সমাবেশেই যে সর্ব্বদা শ্রুতিসুখকর পদ হইতে পারে, জগদানন্দের পদ পড়িয়া আমরা তাহা বুঝি নাই। বহুতন্ত্রীতে অনভ্যস্ত স্পর্শজনিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির ন্যায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিকে সুখদান না করিয়া অনেক স্থলে পীড়ন করে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই কবি স্থানে স্থানে জয়দেবের মত সুন্দর শব্দ গ্রন্থনে সমর্থ হইয়াছেন।

১. সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত পুস্তক দেখুন।

আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। এই কবি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থে একটি যমক-অলঙ্কারের ধারা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, জগদানন্দ আকাশের তারা কি বনের ফুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্বমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তিনি শ্রমে গলদঘর্ম্ম হইয়া কবিতা রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবিগণের জন্য পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "জগদানন্দের খসড়া" ললিত শব্দের বিপণি বলিয়া উল্লেখ করা যায়, পাঠক খসড়াখানি পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইবেন। ইহা প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কারশাস্ত্র সঙ্কলনের প্রথম ও শেষ চেষ্টা।

বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪০৬ শকে (১৪৯৪ খৃ. অব্দে) চৈত্র মাসে পূর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও নবদ্বীপে 'প্রাণবল্লভ' নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন 'দীপান্বিতা' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন।

বংশীবদনের পৌত্র (চৈতন্য দাসের পুত্র) **রামচন্দ্র** একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে (১৫৮৩ খৃ.) মাঘ মাসের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন; ইনি বুধরীর সন্নিকট রামনগরে বাস করেন। রাধানগরের নিকট বাঘনাপাড়ায়ও ইঁহার আর এক বাটী ছিল। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **শচীনন্দন দাস** একজন পদকর্ত্তা। তিনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক কাব্য প্রণয়ন করেন। বংশীবদনের বংশধর মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম. এ., এখন বঙ্গীয় সুধীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

পরমেশ্বরী দাস—ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতিতে বৈদ্য; ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে 'তড়া আটপুর' যাইয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি সেই বিগ্রহের নাম 'শ্যামসুন্দর' হইয়াছে। ইনি কিছুদিন 'গরলগাছা' গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে **যত্নুনাথ আচার্য্যের** পূর্ব্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট, বুরুঙ্গা গ্রামে ; ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

"যত্নুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়॥"

প্রসাদ দাস—বিষ্ণুপুরস্থ করুণাময় দাসের (মজুমদার) পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য ; ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিপতি'।

উদ্ধব দাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত ; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন ; বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর)।

রাধাবল্লভদাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী সুধাকর মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্যামাপ্রিয়ার পুত্র। রাধাবল্লভ রঘুনাথ গোস্বামী-কৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর—শশিশেখরের সহোদর ভ্রাতা চন্দ্রশেখর ; দুইজনই প্রসিদ্ধ কবি। বর্ত্তমান কীর্ত্তন গানগুলি দুই ভ্রাতার পদাবলীর দ্বারাই বিশেষরূপে পুষ্ট। ইঁহাদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। ইঁহারা কাঁদড়ার বিখ্যাত 'মঙ্গল' বংশীয় ব্রাহ্মণ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গল ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। মুলুকের বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুর ছিলেন শশিশেখরের শিষ্য এবং তাঁহারই পদে জানা যায় যে শশিশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর ছিলেন। বিশ্বম্ভর শশিশেখরের বন্দনা লিখিয়া তাঁহার পদাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন। ইঁহারা বৈষ্ণব দাসের (পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা) কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আজকাল কীর্ত্তনিয়ারা শশিশেখরের পদাবলীই বিশেষ ঘটা করিয়া গাহিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদেরই একজনই "রায়শেখর" উপাধিতে পদ রচনা করিতেন।

পরমানন্দ সেন—বাড়ী কাঁচড়াপাড়া গ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর শিবানন্দ সেনের পুত্র ; ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দের জন্ম হয়। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'কবি-কর্ণপূর' উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃ.) সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও তাহার চারি বৎসর পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' প্রণয়ন করেন ; ইহা ছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু', 'কেশবাষ্টক', 'চৈতন্যচরিত কাব্য' প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন।

বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ—ইঁহারা তিন সহোদর, পূর্ব্ব নিবাস

কুমারহট্ট। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের বুঢ়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসুঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী-রচকগণের মধ্যে বাসুঘোষ শীর্ষস্থানীয়। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত 'কীর্ত্তনীয়া' ও মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। সুবিখ্যাত নবদ্বীপবাসী কীর্ত্তনগায়ক গৌরদাসের মতে ইঁহারা সদ্গোপ জাতীয় ছিলেন।

ধনঞ্জয় দাস—বর্দ্ধমান ছাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে বাড়ী। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্দপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গোকুল দাস—৪ জন। ১. জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। ২. কাঞ্চনগড়িয়া বাসী শ্রীদাসঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ৩. বীরহাম্বীরের সমসাময়িক, বনবিষ্ণুপুরবাসী গোকুলদাস মহান্ত। ৪. 'কবীন্দ্র' উপাধিধারী পঞ্চকোট সেরগড়বাসী গোকুল। (ভ. র.)

রায়শেখর—বিখ্যাত পদকর্ত্তা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পরাণ গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। কাটোয়ার যদুনাথ দাসের "সংগ্রহ-তোষিণী" হইতে জানা যায় 'দুর্গাদাসী' নামে ইঁহার এক সাধনপাত্রী ছিল। ইনি প্রায় মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। ইঁহার রচিত "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" বৈষ্ণব সমাজের একখানি বিশেষ আদরের পুস্তক।

আনন্দ দাস—জগদীশ পণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনি "জগদীশচরিত্র-বিজয়" গ্রন্থ-প্রণেতা।

কানুরাম—ইনি শ্যামানন্দের শাখাশিষ্য ; ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত।

কৃষ্ণদাস—পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ্যা অনেক। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব। অম্বিকা নিবাসী গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ— * "শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥" * শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র ছিলেন। **গতিগোবিন্দ**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। ইঁহার রচিত "বীররত্নাবলী" নামক একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ আছে। **গোকুলানন্দ সেন**—জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর, ইঁহার নামান্তর বৈষ্ণব দাস। ইনিই প্রসিদ্ধ পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

গোপালদাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। বাড়ী বুঁদইপাড়া। **গোপাল ভট্ট গোস্বামী** (১৫০০ হইতে ১৫৮৭ খৃ.)—ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (দাক্ষিণাত্য), ইনি পরিশেষে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন।

গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, বাড়ী বুধরী। গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য। রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে ইঁহার কথার উল্লেখ আছে। **চম্পতি রায়**—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন * "চম্পতির্নাম দাক্ষিণাত্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তসমাজঃ কশ্চিৎ আসীৎ স এব গীতকর্ত্তা"। * **দৈবকীনন্দন**—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিই ইঁহার কার্য্য ছিল। দৈবকীনন্দন কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ 'বৈষ্ণববন্দনা' রচনা করিতে আদিষ্ট হন। ইনিও "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন এইরূপ জনশ্রুতি।

নরসিংহ দেব— * "নরত্তোমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়। দূরদেশ "পক্কপল্লী যার রাজ্য হয়॥" * প্রেমবিলাসে— * "কমলললিত চরণ মধু পাওয়ে সেই সুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥" * **নয়নানন্দ** - গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামৃতে ইঁহার উল্লেখ আছে। **প্রসাদ দাস**—বিষ্ণুপুরবাসী করুণাময় দাসের পুত্র, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি মজুমদার। আচার্য্য প্রভুর সমকালিক,—উপাধি—কবিপতি। **মাধো**—নীলচরের লোক, শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য। (রসিকমঙ্গল গ্রন্থ, ১৪ পৃষ্ঠা)। **রসিকানন্দ**—নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্যামানন্দের শিষ্য। জন্ম ১৫৯০ খৃ.। **রাধাবল্লভ**—সুধাকরমণ্ডলের পুত্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। **হরিবল্লভ**—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামান্তর। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার গুরু কৃষ্ণচরণের নামান্তর, হরিবল্লভ তাঁহার গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন। যাহা হউক, ঐ ভণিতাযুক্ত পদে যে চক্রবর্ত্তীমহাশয়কৃত, তাহা সর্ব্বসম্মত। তিনি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি পদ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। চক্রবর্ত্তী-কৃত ২৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ১৭০৪ খৃ. অব্দে তিনি "সারার্থদর্শনী" নামে ভাগবতের টীকা রচনা করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও শেষ কীর্ত্তি। এই সকল পদকর্ত্তা ছাড়া বনবিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ

রাজা বীরহাম্বীর[1] ও নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩।° রসিক-ভক্তের অর্দ্ধজন—মাধবীর পদও পাওয়া গিয়াছে। আমরা সম্প্রতি তরুণীরমণ নামক একজন কবির একটি সুবৃহৎ পদ-সংগ্রহ পাইয়াছি। তন্মধ্যে তাঁহার রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। তরুণীরমণের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক আছে। তাহাতে চণ্ডীদাস ও তদ্বন্ধু জনৈক রাজা (সম্ভবতঃ কীর্ণাহারের কিঙ্কিন নামক নৃপতি) সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত আছে। এই পুঁথিখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে, ইহাতে সহজিয়া মতের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তরুণীরমণ মহাপ্রভুর প্রায় সমকালবর্ত্তী। যদুনাথ দাসের সংগ্রহ-তোষিণীতে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত আছে।

এ স্থলে বলা উচিত, যাঁহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী স্বরভিময়, যথা—**কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী** প্রভৃতি গ্রন্থকার ও **শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ** প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—তাঁহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে।

এই যুগের পদকর্ত্তৃগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন। এই দলে নরহরি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস. বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে। ভক্তির সঙ্গে নির্ম্মলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গাঢ়তার হ্রাস হয় ; প্রেমেতে অঙ্কিতমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, প্রেমিকার মত তাঁহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্মসমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্যার কথা বেশী আছে :—

"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥ যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো

১. ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর 'হরিচরণ' আখ্যা গ্রহণ করেন।

দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥ যো বীজনে পঁহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদুবাত॥ যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিএ ছোড়ি॥"

বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম, দানই এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না।

বৈষ্ণব কবির নাম।

ফুলের সুরভি বিনামূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীরণ ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে, প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ, যুথি, জাতি, গৃহসুন্দরীগণ হইতে কম মধুর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এই প্রেম-ভরে উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

"মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পশারিয়া রয়॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে দেয়। আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই পাকে। আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে॥ মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে। পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে॥"

এই অপূর্ব্ব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্যপূজার পূর্ণ প্রভাব দেখা দিয়াছিল। বিরল-ক্রম নখর-রাজিতে বসন্তের সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না। এখন বসন্ত বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রেম-সাহিত্য।

কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও কুরঙ্গীর জন্য; মনুষ্য-সমাজে এখন বিজ্ঞানের নীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফুল পল্লব সংহার করিয়া সত্যের অস্থিপঞ্জর দেখাইতেছে; এখনকার প্রেমের কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা এখন আর লিখিত হইবে না,—সেই স্বপ্নময়ী চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতলনীহারিকাজড়িত হইয়া এখন চির অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুষ্পতরুপল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী পূর্ব্বেও যেরূপ, এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে—কিন্তু আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী বুঝিতে হইলে বঙ্গের পল্লী গীতিকাগুলি ভাল করিয়া পড়া উচিত। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে প্রেমের

যে সর্ব্বস্বপণ তপস্যা চলিতেছিল, তাহাতে বাঙ্গালার নরনারী প্রেমের এক অপূর্ব্ব আদর্শ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পল্লী-গীতিকাগুলি স্পষ্ট করিয়া দেখাইবে, নর-নারীর ইন্দ্রিয়াতীত,—প্রাণ দেওয়া প্রেম কিরূপে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব স্বর্গের উপাদান যোগাইতেছিল। চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ—"এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে"—এর সঙ্গে গীতিকার "ধোপার পাট" মিলাইয়া পড়ুন, দেখিবেন পল্লীগীতিকাটি যেন এই গানের একটি ভাষ্য। প্রেমের জন্য বঙ্গের নর-নারী যে কি উৎকট তপস্যা করিয়াছিল, তাহা পল্লী-গীতিকায় সোণার অক্ষরে লেখা হইয়াছে; আর এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া বৈষ্ণবেরা রাই কানুর প্রেম আয়ত্ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যুগব্যাপী জাতীয় তপস্যার ফল। চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না চিনয়ে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে সেই সে বুঝিতে পারে।" তিনি ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করার পক্ষে নর-নারীর প্রেম অপরিহার্য্য মনে করিয়াছিলেন, আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কিবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা, অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে, তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে ফুটিবে।" তিনি দিন রাত্রি চণ্ডীদাসের গান গাহিতেন, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, উহা যে রাজ্যের কথা সে ঊর্দ্ধরাজ্য সাধারণের জন্য নহে। এইজন্যই তিনি নর-নারীর প্রেম দ্বারা ভগবৎপ্রেম পাওয়া যায়—একথা সামাজিক লোকের পক্ষে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং "বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তনের" নিরাপদ্ পথ প্রদর্শন প্রচার করিয়া "অন্তরঙ্গ সহ" রস আস্বাদন করিতেন।

বৈষ্ণবপদাবলী আনন্দলোকের কথা—সেই প্রেমে যে ক্রোধ তাহার উপাদান আনন্দ—তাহাতে divorce সূচনা করে না। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে"—ইঁহাদের রাজ্যে প্রাণ দিয়া আর ফিরাইয়া নেওয়ার উপায় নাই। ইঁহাদের বর্ণিত মান ক্রোধের অভিব্যক্তি নহে, সোণা দিয়া ফুলই গড় বা অস্ত্রই গড়—উহাদের একমাত্র উপাদান সোণা। সেইরূপ এই প্রেমের মিলন, মাথুর, মান, প্রভৃতি যাহাই লিখিত হইয়াছে—তাহা সমস্তই আনন্দলোকের কথা। সে প্রেমের ঝগড়া-বিবাদ, বাদবিসম্বাদের নিষ্পত্তি স্থান অপর কোন বিচারালয় নহে। কৃষ্ণ-বিরহে রাই প্রাণত্যাগ করিতেছেন, কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার অবধি নাই। বৃন্দা বলিল, "দাসখৎ দেখাইয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিব।" মুমূর্ষু রাধিকা ভীতা হইয়া বলিলেন, "বেঁধ না

তার কোমল করে। ভৎ'সনা কোর না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক (কৃষ্ণকমল)।" যখন রাধা দুর্জ্জয় মানিনী, তখনও "এক পদ কৃষ্ণপদে যাইবার চায়, আর পদে পদে বারণ করে তায়। এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণ নাম শুনব, আর কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব।" যখন কৃষ্ণের নাম বলিবেন না, স্থির করিয়াছেন তখনও "এ ছার বিধাতা মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি লব লয় তার নাম (চণ্ডীদাস)।"—এই প্রেমের সবখানি খাঁটি সোণা দিয়া গড়া। ইহা সেই আনন্দ-লোকের কথা—উপনিষদ্ যাহা আভাসে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য কবিরা কৃষ্ণপ্রেমরূপ দুর্ল্লভ দ্রব্যের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব-কবির রাধা, প্রধানতঃ চণ্ডীদাস-অঙ্কিত রাধা, পুনঃ পুনঃ ঘর করিতে চাহিয়াও ঘর করিতে পারিতেছেন না। প্রেম বন্যার মত আসিয়া তার ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, তখন তিনি কাঁদিয়া বলিতেছেন, "হে আনন্দময় তুমি কেন বাঁশী বাজাইতেছ, আমার এত সাধের সাজান সংসার তুমি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছ। আমি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি, আমি রন্ধন-শালায় যাইয়া বাঁশী শুনিয়া রান্না গোলমাল করিয়া ফেলিতেছি" (কৃষ্ণ-কীর্ত্তন), কত নিবারণ করিতে চাই—কিন্তু চিত্ত সংযম করিতে পারি না। "কত নিবারিয়ে তবু নিবার না যায়।" এই ভাবের বন্যায় পড়িয়া চৈতন্যদেব ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

মাথুরের এক একটি পদ একটি রত্ন ভাণ্ডার। কৃষ্ণ কতই না আদর করিতেন, তিনি রাধিকার হাতে মুরলীটি ফেলিয়া দিয়া তাহার পায়ের ধূলি লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন; রাধার মুখে হাসি দেখিলে চোখ ছল ছল হইত[১] 'আবার হাস' বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। রাধিকার বর্ণ গৌর—এই জন্য স্বয়ং পীতবাস পরিতেন,[২] রাধার একটি নিশ্বাস পড়িলে, চমকিয়া উঠিতেন। বিদায়ের মুহূর্ত্তে করুণভাবে, বারংবার 'যাই' 'যাই' বলিতেন, তখন কত আলিঙ্গন, কত নিবিড় স্নেহ,—এক পা চলিয়া গিয়া ফিরিয়া

১. "লহ লহ লহ রাই সাধের মুরলী পরশিতে চাই তব চরণের ধূলি।" জ্ঞানদাস

২. "হাস হাস নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখী এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি।"—চণ্ডীদাস
"পীত বসন মোর তব অনুরাগে পরাণ চমকে যদি ছড়ায়ে নিশ্বাসে।"—জ্ঞানদাস

রাধিকার মুখ দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িতেন।"[১] "বঁধু আপন শ্রীকরে কুসুম নিকরে তুলিয়া" আনিতেন, এবং নিজ হস্তে ফুলশয্যা রচনা করিতেন। সোণার চিরুণী দিয়া সোণার পুতলীর চুল বাঁধিয়া দিতেন, "আচরি চিকুর বানাইত বেণী। সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী—মালতীর মালা পরাইত। কত সাজে সাজাইত—মুখপানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত নয়নের জল পুঞ্জে।" (কৃষ্ণকমল)

যে কৃষ্ণ এরূপ আদর দেখাইতেন, তিনি এতটা নির্ম্মম হইয়াছেন,—রাধিকা তাঁহার অভাবে মৃত্যুর সন্নিহিত, তাহাও তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। দূতী যাইতেছে—কিন্তু রাধিকা জানেন, কৃষ্ণ আসা পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিবেন না, তিনি দূতীকে বলিতেছেন—

"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে,
নিকুঞ্জে রহিল আমার এই হিয়ার হেমহার,
পিয়া যেন গলায় পরয় একবার।
যতনে মল্লিকা আমি রোপিনু নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে।
তরু শাখে রইল মোর সাধের শারীশুকে,
পিয়া যেন সব কথা শুনে তাদের মুখে,
তোমরা আমার যত প্রিয় নর্ম্ম সখী,
আমার সঙ্গিনী সভে আমার দুঃখের দুখী।
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তার সখা।
তা সভার সনে তার হবে পুনঃ দেখা
দুঃখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী,
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি।
পিয়া যেন তারে আসি দেয় দরশন
কহিও কানুর পায় মোর নিবেদন।"

---

১. "আমি যাই, আমি যাই, বলে তিন বোল,
কত না চুম্বন দেয় কত দেয় কোল,
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।"—চণ্ডীদাস

যে হেম-হার রাধার শত শত অশ্রুবিন্দুতে অভিষিক্ত সেই হার যেন কৃষ্ণ একবার গলায় পরেন ; কৃষ্ণকে মালা পরাইবার জন্য তিনি অতি যত্নে মল্লিকার চারা রোপণ করিয়াছিলেন, সে সৌভাগ্য তাঁহার হইল না, তোরা তাঁহাকে একবার মল্লিকা ফুলের মালা পরাইয়া দেখিস,—সখীকে বলিতেছেন। আমি কি কষ্ট পাইয়া মরিলাম, তাহা তিনি শারীশুকের মুখে শুনিবেন,—সেই কথা বলিতে যাইয়া নির্ব্বাক পক্ষীর মুখেও ভাষা ফুটিবে। যশোমতীর সঙ্গে যেন আসিয়া দেখা করেন,—বলিতে বলিতে বীণার শেষ ধ্বনির মত রাধার কণ্ঠ থামিয়া গেল।

যে বৃন্দা রাই কানুর মিলনের দৃশ্য শতবার দেখিয়াছেন, রাধার মুখের হাসি মিলন জাত স্বর্গীয় আনন্দ শতবার কুঞ্জলতার আড়াল হইতে দেখিয়া স্বয়ং হাসিয়াছেন তিনি মুমূর্ষু রাধার এই শেষ কাতরোক্তি—

"শুনিয়া আকুল দূতি চলে মধু পুরে
কি কহিবে সে সব বচন নাহি ফুরে।"

একটি মাত্র "আকুল" কথায় দূতীর হৃদয়ে অসীম ব্যথা বুঝাইতেছে। এই পদটি শ্রীখণ্ডের নরহরি লিখিয়াছিলেন, রায় শেখর কতকটা পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় পদটি লিখিয়াছেন।

পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসে অপ্রস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে ; মৈথিল কবির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন, কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দদাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ ; জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা ; তাহা মধুর এবং মূলের প্রতিধ্বনির মত শুনায়। জ্ঞানদাসবর্ণিত নায়কের প্রেম-বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্ম্মল অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়াছে। বলরামদাস কাহাকেও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইহার কবিতা স্বভাবেরই প্রতিবিম্ব, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার পদ খাঁটি বাঙ্গালা কথায় রচিত, বাঙ্গালীর ঘরের পার্শ্বের

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

বলরামদাস ও চণ্ডীদাস।

বাগানের ফুলের ন্যায় চিরপরিচিত সৌন্দর্য্য ও সুরভির সমষ্টি। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসে পার্থক্য আছে ; যে ক্রমে এই আলোচনা লিখিত হইল—এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা তিল প্রমাণ।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহরদাস ; হুগলী জেলার বদনগঞ্জে ইহার সমাধি আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন ; ইহার রচিত সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র।[১] খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০ ; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। তিনি ইহার যে "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। 'পদকল্প-লতিকা' গৌরীমোহনদাসকৃত ; 'গীতিচিন্তামণি' হরিবল্লভকৃত ; 'গীতচন্দ্রোদয়' নরহরিচক্রবর্ত্তীকৃত, প্রসাদদাস-কৃত 'পদচিন্তামণিমালা, 'রসমঞ্জরী' পীতাম্বরদাসকৃত ; ইহা ছাড়া লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে।

পদাবলী সংগ্রহ।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট্ গ্রন্থ—রিচার্ডসনের সিলেক্সনের ন্যায়। ছাপা হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহ-পুস্তকের অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, কতকগুলি বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশও বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্দবিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র ; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণবদাসের সংগৃহীত

পদ-সমুদ্র, পদামৃত, পদকল্প-লতিকা ও পদকল্পতরু।

১. পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল ; কলিকাতায় কোন দোকানদার ২০০০্ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভক্তনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই ; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্ত্বাবধানে ছাপাইয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন ;—সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

পদকল্পতরুই ব্যবহার পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, ইহার পদসংখ্যা ৩১০১ ; পদামৃতসমুদ্র ইহা হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বকৃত পদ দিয়াছেন। বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট্ সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদও বন্দনাসূচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত ; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫ ; চতুর্থ শাখায় ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্ পল্লবে কত পদ তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ; বৈষ্ণবদাস তৎকৃত সূচীপত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখায় ২৫ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জ্জিত হইয়াছে ; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। সূচীনির্দ্দিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থানবাসিগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমরের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয় —এটি একটি প্রবাদ বাক্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও সর্ব্বত্রই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট ; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রেই এমন দু'একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন। পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের নানারূপ লীলাসরস চিত্রলেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক, বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান। ভালবাসা-রহস্যের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র রচিত হইয়াছে। অলঙ্কারগ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকাভেদ বর্ণিত আছে ; এই ভেদপ্রকাশসূত্রে এক একটি চিত্রনির্দ্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় কঠোর নহে,

পদবিন্যাস রীতি।

যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই ; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছে, এই চিত্রখানি প্রগল্‌ভার ; তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এই চিত্রের নাম বাসক-সজ্জা ; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলব্ধা ; মানিনী—খণ্ডিতায় বিষাদ ও রোষস্ফীতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন ; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, কারণ— * "যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।" * এইরূপ আরও অনেক সূত্র আছে।

বঙ্গীয় পদসমূহে এই সকল লীলাময় ভাব ভক্তি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উর্দ্ধোন্মুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র।

সংগ্রহ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু নমুনা দিতেছি ; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবের যোজনা করিয়াছেন,—বিন্যাস-কৌশলে একখানি সম্যকৃভাবে চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে :—

মুরলী শিক্ষা

কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী॥ তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তব পীত ধড়া দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী॥ ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাঁধিয়া॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেউরি। তোর তাড় বালা দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোর দেহ তোমারি ভূষণ॥ শুন মোর এই নিবেদন। শুনিয়া হরষিত বৃন্দাবন॥১॥

কানেড়া। মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি লয় আমার

নাম॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেক শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥ কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পারিজাত। কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ॥ কোন্ রন্ধ্রে ষড়্‌ঋতু হয় এক কালে। কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥ কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। 'রাধা মোর' বলি বাজিবেক বাঁশী॥২॥

কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনো-মোহিনীর সাধা॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গে হেলাইয়া। মুরলী পূরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়া-মুখ চাই॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥৩॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়॥ ইহার গৌরবরণে করে আলো। চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥ তাঁহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু। এত নহে নন্দসুত কানু। ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল কতি॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥ কে বানাইল হেনরূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী। নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারাঠারি॥ কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি॥ আজু কেনে দেখ বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥৪॥[১]

পদের অতল রত্নাকর হইতে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি রত্নের উদ্ধার করিয়া এইরূপ সুন্দর সমন্বয় করায় সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য।

পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বঙ্গদেশের

---

১. প্রথম পদে (বৃন্দাবন-কৃত রাধিকা) হরির নিকট বেশ পরিবর্ত্তন ও বংশীবাদনের অনুমতি চাহিয়াছেন; দ্বিতীয় পদে (জ্ঞানদাস-কৃত) বেশ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ, কিন্তু রাধিকা বাঁশী বাজাইতে পারেন নাই, এজন্য তদুপদেশ চাহিয়াছেন; তৃতীয় পদে (শিবানন্দ-কৃত) কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন। ৪র্থ পদে (চণ্ডীদাস-কৃত) রাই কানু ও কানু রাই সাজিয়াছেন, তখন বেশ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ—রাধা সুললিত স্বরে বাঁশীতে ঝঙ্কার দিতেছেন এবং সখীগণ চিনিতে না পারিয়া "আজু কে গো মুরলী বাজায়" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতিপথে ধাবিত, তাহার মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে জাতির নরনারী-জীবন নাটকীয় চরিত্রের গূঢ় সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে ব্যক্ত হয়, রামায়ণে ও মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সম্বল; সেই অশ্রু কখনও দুঃখজ্ঞাপক হইয়া মর্ম্মস্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীতিকবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যেও এরূপ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না,—সে দুঃখ গৌরবের বিষয় হয়।

বঙ্গীয় গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব।

এই গীতিকবিতাগুলি আমরা জগতের সর্ব্বত্র সাহিত্য প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি;—আত্মগরিমার রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দকে আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।

চরিত-শাখা

(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা[১] (খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল
(গ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত
(ঘ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি

(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা

মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনুষ্যের নৈসর্গিক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে

---

১. গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি এবং সংস্কারান্ধ পণ্ডিত একটা বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎসম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণ, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে প্রতিপক্ষীয় দলের ভ্রম নিরসন করা হইয়াছে। সেই সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠ করিয়া বহু গোস্বামী ও পণ্ডিত আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, এই অমূল্য পুস্তকখানির সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত দ্বিধা দূর হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম. এ, শ্রীযুক্ত গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ, শান্তিপুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইনস্পেক্টর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, রঙ্গপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং গোস্বামী শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন অধিকারী প্রভৃতি বহু মহোদয় এই পুস্তকের পক্ষপাতী।

রচিত-গ্রন্থনাপ্রবর্ত্তক।

পড়িয়া উপেক্ষিত ছিল। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই। মহাপ্রভু নিজের জীবন দেখাইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্যলীলার সৌন্দর্য্য-পাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে।

মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা।

চরিত-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল; বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্য-সুলভগুণের প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল। দয়া, ভক্তি, সরলতা প্রভৃতি গুণই প্রকৃত পূজনীয়; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাট্ তত্ত্ব বা বহুল তত্ত্ব প্রকৃত শোভা কিংবা মহত্ত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই; তাই চৈতন্য-দেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ চৈতন্যদেবের জীবনের অতিমানুষিক প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হন নাই।[১] সে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। কারণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতগণ অলৌকিক লীলার দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গিগণের কেহ কেহ কড়চা বা 'নোট' রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই 'নোট' ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাঁহার কোন

চৈতন্যজীবনী।

কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তিমিত্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন

---

১. ১০০ বৎসর হইল, কবি প্রেমানন্দদাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রমাণসহ কবির স্বহস্তলিখিত কাগজখানি আমি পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—"অহমেব ক্বচিৎব্রহ্ম সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়িষ্যে কলৌ পাপহতান্নরান্।" বায়ুপুরাণে—"দ্বিবিজাভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ। কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥" মৎস্যপুরাণে,—"শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ। দয়ালুঃ কর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে।" এইরূপে গরুড়পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বাল্মীকিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎযামল প্রভৃতি অনেক পুরাণের নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পুরাণগুলির নব সংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না।

করেন। 'নোট'গুলিকে সাবেকী বাঙ্গালায় "কড়চা" বলিত ; ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের ও মুরারিগুপ্তের কড়চা বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়খানি সংস্কৃতে লিখিত, সুতরাং এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে।

কড়চা-লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না ; যে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া ইনি পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সে দুই বৎসর ইনি দিবারাত্র মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, যাহাতে কড়চাখানা ফটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুষ্যবর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের কড়চা অনেকাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

গোবিন্দের কড়চার প্রামাণিকতা।

এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণান্বিত। যাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিস্ময়-উচ্ছ্বসিত, অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই ; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও কড়চাগুলির সাহায্যে তাঁহার মহিমান্বিত চরিত উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন। জয়ানন্দ মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার রচিত চরিতাখ্যানও গোবিন্দের কড়চার ন্যায় চাক্ষুষ ঘটনার ইতিহাস নহে। গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহা পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কৃত্রিম বা রূপান্তরিত হয় নাই। অশিক্ষিত সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম দুইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু প্রসাদভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন ; তিনি বাগ্দেবীর বরে চির-যশস্বী হইয়া ব্যাস ও বাল্মীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ভাব তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাভূত করিতে পারে নাই। আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।[১]

কড়চায় চৈতন্যের চরিত্র।

১. আমার এইরূপ উক্তিতে কোন কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পুস্তকখানির উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ বেদের তুল্য ; সেই

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কর্ম্মকারের পুত্র গোবিন্দ কর্ম্মকার স্ত্রীকর্ত্তৃক 'মূর্খ' 'নিগুর্ণ' প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ চৈতন্যপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু স্নানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন :—

গোবিন্দের পরিচয়।

"কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন-বদন। * * * অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই। পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥ * * * আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু। রূপের ছটায় মুঞি মোহিত হইনু॥ * * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥ কদম্বকুসুম সম অঙ্গ কাঁটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ॥"

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্ব্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে 'নোট' করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায় নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয়;—চৈতন্যপ্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে :—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥ * * * শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥"

গোবিন্দের কড়চা হইতে আমরা চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। পাদটীকায় আমরা স্থানগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি।

পুস্তকের উপর একটা মূর্খ কর্ম্মকার রচিত কড়চা স্থান পাইবে, ইহা তাঁহাদের সহ্য হয় নাই। একজন সুপণ্ডিত বৈষ্ণব আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমি চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে যদি কটাক্ষপাত না করি তবে তিনিও কড়চার প্রতিকূলতা করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের এটা ভুল যে চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ আমার নিকট শ্রদ্ধা পায় নাই। শুধু ঐতিহাসিক অংশে আমি কড়চাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব ভক্তি, অপূর্ব্ব লিপিকলায় চৈতন্যচরিতামৃত আমাদের মাথার মণি—এই সমস্ত গুণে তাহার সমকক্ষতা করিবার যোগ্য পুস্তক বাঙ্গালায় হয় নাই।

কণ্টকনগর (কাটোয়া) হইতে বৰ্দ্ধমান ; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসে ; দামোদর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের বাটীতে অবস্থান ; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে ; এস্থলে কেশব-সামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটূক্তি করে ; মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপরে জলেশ্বরে, স্বর্ণরেখা পার হইয়া হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষীগোপাল দর্শন, নিংরাজের (লিঙ্গরাজের) মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দর্শনে চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থা, পুরীগমন। তিন মাস কাল পুরীতে অবস্থানের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন।[১] তথা হইতে ত্রিমন্দনগর[২] গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রবাসী ঢুণ্ডীরামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন করেন,[৩] এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্যপ্রভুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভাবে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে মুন্নানগরে[৪] গমন, মুন্না হইতে বেঙ্কটনগরে[৫] ; শেষোক্ত স্থানে তিন দিন

চৈতন্যের ভ্রমণ।

১. চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে, চৈতন্যদেব গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে ; রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে রামানন্দের গোদাবরীতে থাকা সম্ভব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন কড়চায় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা যায় নাই।

২. 'ত্রিমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে 'ত্রিদম' বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা 'ত্রিমল্ল' বলিয়া অভিহিত ; বেঙ্কটভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট—দুই সহোদরের নাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্ল দুইটি নিকটবর্ত্তী স্থানের নামানুসারেই ভ্রাতৃদ্বয় উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন ; "ত্রিমল্ল"ই প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় ; উহা হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক "ত্রিমল্লঘেরী" বলিয়া বোধ হয়।

৩. সিদ্ধবটেশ্বর ('সিদ্ধবটেশ্বরম্') কডপ্পাননগরের নিকটবর্ত্তী ও পান্নার নদীর তীরস্থ।

৪. মুন্নানগরের নাম পোষ্টাল গাইডে পাইলাম না ; বড় ভাল মানচিত্রে মুন্না নামক নদী মান্দ্রাজের নিকট দৃষ্ট হয় ; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল (হয়ত এখনও আছে) বলিয়া বোধ হয়।

৫. বেঙ্কটনগর পাওয়া গেল না ; বোম্বের নিকট এক বেঙ্কটনগর আছে, কিন্তু ইহা সে "বেঙ্কট" কখনই হওয়া সম্ভব নহে ; এক নামের অনেকগুলি স্থান সৰ্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এই কড়চা-নির্দ্দিষ্ট ত্রিপাত্রনগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি ; বেঙ্কট-

থাকিয়া বগুলাবনে পন্থভিল নামক দস্যুকে ভক্তিদান করেন, তৎপরে এক বৃক্ষতলে তিন দিবস হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্তাবস্থায় কর্ত্তন, তৎপরে গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে[১] তথা হইতে পানানরসিংহদর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে[২] গমন এবং তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ—তৎপরে চাইপল্লীনগরে[৩] সেস্থান হইতে নাগরনগরে[৪] ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে[৫] গমন করেন, তাহা হইতে চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া পদ্মকোটে[৬] তার পর ত্রিপাত্র নগরে,[৭] সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন। ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়। জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে[৮] নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথনগর[৯] ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধ্বীকবনে প্রবেশ করেন ও তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। কন্যাকুমারী

নগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা সম্ভব; এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

১. ত্রিপদীশ্বর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না, এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী পর্য্যটনের সঙ্গে বর্ত্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায় মিল দৃষ্ট হয়। ত্রিপদীনগর মাদ্রাজ হইতে ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

২. পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য "বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে" গমন করেন; ইহা আধুনিক "কাঞ্জিভরম" (কাঞ্চীপুরম্); কাঞ্জিভরম্ ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে।

৩. ত্রিচাইপল্লী হইতে চাইপল্লী (আধুনিক ত্রিচিনাপল্লী) প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণে।

৪. ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগর-নগর ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্ত্তী এক নাগর-নগর (বেদনুরের সমীপবর্ত্তী) আছে, ইহা সেই স্থান নহে।

৫. তাঞ্জোর,—নগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।

৬. পদ্মকোট—তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ।

৭. ত্রিপাট—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণ; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এই 'ত্রিপাত্র' নগর আছে, ইহা সেটি নহে।

৮. রঙ্গধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম্, ত্রিপাদের দক্ষিণপশ্চিমে। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গপট্টম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা), কিন্তু শ্রীরঙ্গপট্টম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩২২ মাইল উত্তরে; পরবর্ত্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গকেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

৯. রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে রামেশ্বরের অতি নিকটে।

হইতে "ত্রিবঙ্ক"[১] দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্ব্বতবেষ্টিত ও ইহার তদানীন্তন রাজা রুদ্রপতি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবঙ্ক হইতে পয়োষ্ণী[২] নগরে, তথা হইতে মৎস্যতীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চনদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে[৩] গমন করেন। চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জ্জরীনগর,[৪] ও পরে পূর্ণনগরে[৫] প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন 'দাক্ষিণাত্যের, নবদ্বীপ' অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পাটননগরে, তথা হইতে জেজুরীনগরে গমন করেন; এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরারীদিগের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণদস্যুকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন; মূলানদী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিম্বক ও দমননগর[৬] এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম করিয়া ভরোচ নগরে প্রবেশ; ভরোচ[৭] হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহমদাবাদের ঐশ্বর্য্যবর্ণন; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন[৮], এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে[৯] গমন, বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার; জাফরাবাদ, পরে সোমনাথ গমন। সোমনাথের পরে জশনাগরে, গির্ণার পাহাড় অতিক্রম, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদাতীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর (বৈদ্যনাথ নহে), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ; তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথে আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন।[১০]

---

১. ত্রিবঙ্ক—ত্রিবাঙ্কুর।
২. পয়োষ্ণী—আধুনিক পনানি।
৩. চিতোল—বোধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে।
৪. গুর্জ্জরী—গুজরাত নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে।
৫. পূর্ণ—পূণা; এখনও তন্নিকটবর্ত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে।
৬. নাসিক—নাসিক, ত্রিম্বক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিম্বুক), দমননগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী।

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সন্ধিতীর্থ, পক্ষীতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কিনা বলা যায় না।

৭. ভরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রোচ নগর।
৮. আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রমতী নদী—মানচিত্র দেখুন।
৯. ঘোগা—পোষ্টাল গাইড দেখুন।
১০. সোমনাথ হইতে সমস্ত স্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়; রামানন্দ রায়ের

এই কড়চার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানা তত্ত্ব পাইবেন ইহাকে 'নোট' সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে। কড়চা কাব্য বা ইতিহাসের রেখা-পাত মাত্র। ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ম্মকার বহু মূল্যমণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলে যতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকর্ম্মকারের লেখনী-নির্ম্মিত চৈতন্যমূর্ত্তি তাহা হইতেও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কড়চায় বর্ণিত চৈতন্য-চরিত্র।

"হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্। দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥ সত্যবাই লক্ষীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন। প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে। কত রঙ্গ করে লক্ষী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥ কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন। সত্যের করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥ থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষী বড় ভয় পায় মনে। কিছু বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেঁয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥ নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি। রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি। গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথা বহির্ব্বাস। উলঙ্গা হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥ আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা। ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা॥ না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে

বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ও রত্নপুর ভারতবর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে; উহারা সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তর্ব্বর্ত্তী; স্বর্ণগড়ের এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে, চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যগিরির সমসূত্র-পথে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন; সুতরাং এই ভ্রমণকার্য্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

শোণিতের ধার ॥ হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায় ॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান ॥ সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি। কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এই ভাব হেরি ॥ হরিনামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান। ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল-পরাণ ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদ্রিত নয়ন ॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল ॥ বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম ॥ তীর্থরাম পাষণ্ডের করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥ পবিত্র হইনু, আমি পরশে তোমার। তুমি ত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার ॥"

এই মন্ত্রে নরোজী, ভীলপন্থি দস্যুদ্বয় ও বারমুখী বেশ্যা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুর্জ্জরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তির এইরূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

"এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল ॥ অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল। ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি ॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে। পশ্চাৎভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া ॥ নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে। ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে ॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া ॥"

ভক্তির পূর্ণ আবেগের সময় এই মনুষ্য-দেবটির শরীরে একরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দও সেইরূপ ভীত হইয়া দর্শন করিতেন,—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই ॥ কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায় ॥ কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন

দেখিয়া ॥ উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ। একদিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হ'তে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥ নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারিজন। ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী। এই ভাব হেরি মোর ধাঁধিল নয়ন।"

বাঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্যশ্যামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনরূপে দীর্ঘজীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিন্ধ্য,—নিকটবর্ত্তী প্রকৃতির এই মহান্ আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে বড় ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্যদান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্ণ করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন। রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ—পাঠশালা কিম্বা তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী অন্য কোন কর্ম্মশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনের তদ্রূপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক দুর্নাম। এই গৃহ-প্রিয় বাঙ্গালীর বাহিরে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে বড় কৌতূহলই হয় নাই। কারণ, স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জ্বল ও ভীতিকর চিত্র, বজ্রনাদী ঝর্ণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাঙ্গফে ও আপিনাইনের তুষারধবল উদাস-কান্তি, কোথাও লক্‌লেমন্, লক্‌কেট্রিন্ প্রভৃতি পাহাড়বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি, কোথাও টিন্‌টারণ্ সন্নিহিত মৃদু নীলোজ্জ্বল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্ত্বমিশ্র সৌন্দর্য্যের আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে শতগুণ শোভা ও মহিমান্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তি; কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণকার্য্যে নিতান্তই অপরাগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাণ্ডার থাম ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন-সাহিত্য দুর্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ-বায়ু-সেবনাভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্য্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্ফূর্ত্তি-শালী ও জীবন্ত করিয়াছে:—নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত :—

প্রকৃতি বর্ণনা।

"কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে। ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে। কত শত গুহা তার নিয়ে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া। চামর ব্যঞ্জন করে বাতাসে দুলিয়া॥ ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥ পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই। নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥ ময়ুর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥ রজনীতে কত লতা ধগ্‌ধগি জ্বলে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥"

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতর ভাবোদ্দীপক বর্ণনা আছে,—কন্যাকুমারীর চিত্রে,—

"তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥ কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥ হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর। কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥ দেখিবার কিছু নাহি তথাপি শোভন। সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥"

সেখানে দেখিবার কিছুই নাই,—কিন্তু জাগতিক সমস্ত দ্রব্যের সমাধির ন্যায় সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অনুভবনীয় শোভা ধারণা করিতে শুদ্ধচিত্তের প্রয়োজন।

কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিম্বিত করিয়া দিয়াছিল।

চৈতন্যপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক ভাব।

গোবিন্দের কড়চায় আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নাই; এই অনাবিল রচনা সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও নির্ম্মল। পরবর্ত্তী লেখকগণের বৈষ্ণবীর বিনয়ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায়ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিপ্রফুল্লভাব শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে। চৈতন্যপ্রভু যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, তাহাই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে ভগবানের স্মৃতি উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তী

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপূজ্য পবিত্রচরিত্রকে একদর্শি-সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের কোলাহলময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিদ্বেষ-প্রণোদিত সাম্প্রদায়িকধর্ম্মে তাঁহার অণুমাত্রও অনুমোদন ছিল না ; নারায়ণগড়ে তিনি "ধলেশ্বর" শিব দর্শনে— * "হর হর বলি প্রভু উচ্চ রব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥" * জলেশ্বরের "বিলেশ্বর" শিব দর্শনেও তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। বেঙ্কটনগরের নিকট "গিরিশ্বর" শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়া তিনি দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পাটস গ্রামের নিকট "ভোলেশ্বর" শিব দর্শনে * "প্রভুর প্রেম উপজিল। জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল॥ অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়। উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়॥" * এবং সোমনাথদর্শনে তাঁহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ত্রিম্বকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান ছিল বিলিয়া কথিত আছে, * "চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ। গাঢ়তর প্রেমভরে হইয়া অবশ॥ অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া। কোথা মোর রাম বলি উঠিলা কান্দিয়া॥" * পঞ্চবটী বনে যাইয়া তিনি 'গণেশ' বিগ্রহ দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন ! পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবার জন্য গমন করেন এবং— * "সেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।" * দমননগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি * "দেখি প্রভু ধরণী লুটায়" * ও সেই মূর্ত্তি * "দেখিয়া নয়নে। তিন দিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে।" * এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাঁহার উদার ভক্তিমূলক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইবে। * "না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন"— * এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর কোথায় ? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণসেবক, শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টাভুজাসেবক, গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন ;—এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহ্নস্বরূপ যাঁহার কথা আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাঁহারই প্রকৃত সেবক। যে কথা তাঁহার বিরহমথিত হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনির্ম্মল ঈশ্বরকণা—যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান, —তীর্থভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্ব্বত্রই উদ্দৃক্ত হইয়াছে। এবং একথা নিশ্চয় যে, শ্রেণীবিশেষকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা কড়চার সর্বত্রই বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ; সামান্য ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার নিজ সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্য যে, সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি অনাহূতভাবে নিজেই উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন; কোথাও একটা 'পরেটা ফল' একটা 'লাড্ডু' ও গুড়সংযুক্ত 'তক্রাম্ল' দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্য স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, এই বিষম সংসার কারাগৃহের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষেও বলবৎ শক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। * সোণার শৃঙ্খল মায়া লৌহের শৃঙ্খল। স্বর্ণমত মনোরম লৌহ মত দৃঢ়। * ইহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য্য ছিল না; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই; অনেক কবিই এতদুপলক্ষ্যে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্মবিজৃম্ভণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, * "প্রভুর সন্ন্যাসকাল ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন॥ আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে।" * তাঁহার স্ত্রী যখন মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার সুন্দর ও করুণ আহ্বানে তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন,— * "শুনিয়া তাহার কথা মাথা হেট করি। মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি॥ হরি শরণেতে কাটে যতেক বন্ধন। তেকারণে মনে করি হরির চরণ॥" *

গোবিন্দের চরিত্র।

মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, উহা তাহার জীবিকা ও মুখ্যচিন্তা। চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস, যাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছেন, — * "ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ॥" * সর্ব্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিহ্বলতায় গোবিন্দ একান্তরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সম্মুখে এক প্রবল ভক্তিবন্যায় ধরিত্রী টলমল করিতেছিল,

তাঁহার প্রভুভক্তি

কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সে দৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, একথা বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পড়িয়াছে এমন নহে। অগস্ত্যকুণ্ডতীরে একদিন চৈতন্যপ্রভুর উদ্দামভক্তি দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন— * "প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত॥" * নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নূতন আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভক্তির হ্রাস হয় নাই, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃস্বলের লোকের ন্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতেও পারে না। দুইদিনের জন্য প্রভুসঙ্গবিচ্যুত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ * "মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল।"— * এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, তাহা বাক্যপল্লব পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু সহসা দুই একটি বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে। চৈতন্যদেব দস্যু তস্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। চৈতন্য-প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতেও বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভু মুরারি বেশ্যাদিগের নিকট যাইতে উদ্যত, সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন :— * "মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই॥ * এই একমাত্র আপত্তি তাঁহার নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাঁহার নৈতিক বিশুদ্ধতা।

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্যদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেস্থলে তাঁহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তিপ্রণোদিত কবিত্ব উদ্রিক্ত হইয়াছে :— * "যদ্যপি দাঁড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে। শরীরের প্রভায় আঁধার নাশ করে॥" * এসব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে—ইহা স্বাভাবিক ; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাই, সেইরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিস্পৃহ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারাষ্ট্র ও তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর দেশীয় লোকের কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন নাই। বগুলাবনে— * "একজন লোক আসি কাঁইমাই করি। কি বলিল আমি সব বুঝিতে না

তাঁহার সত্যপ্রিয়তা।

পারি ॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়া। কাঁইমাই বলি তারে দিলেন বুঝাইয়া ॥ * এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্যপ্রভু স্বর্গীয় শক্তিপ্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা করিবার আদৌ স্থবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়াছেন :— * "এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল ॥" * চৈতন্যপ্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তিতে দস্যু, তস্কর, বেশ্যা উদ্ধার পাইয়াছে; যেখানে সে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, সেস্থান তীর্থধামের তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড-নাস্তিকের মন ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু দুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিদুষ্ট, অর্থযৌবনস্পর্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই। নরসমাজে এমন দুই একজন আছে, সম্যক্ অভিব্যক্ত সাধুজীবনের সৌন্দর্য্য যাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—ভগবান্ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিতে শক্তি দেন নাই। হাজিপুরে কেশবসামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটূক্তি করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা সে স্থলে বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেশবসামন্তের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন :— * নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই। সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥" * এইরূপ ভাবের কথা চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অন্য কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি, এই সত্যভাষী সেবকের লেখনীতে চৈতন্যদেবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, অন্যত্র তাহা বিরল।

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বহুদিনের কৃচ্ছ্রসাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে, উপবাসে ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পরিম্লদিত কমলনিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর দেহ-যষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল এবং তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্লিষ্ট লাবণ্যে হেমন্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল,— * ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ ॥ সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নয়ন। * এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনলোলুপ সমস্ত বঙ্গদেশ—নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমণ্ডলী—চিরবিরহক্ষিন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই, তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে

চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন— * "কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। কৃষ্ণনাম গুণ তোরে আলিঙ্গন করি॥" * তাহারা ত দিবারাত্র গৌর নাম লইয়া কাঁদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে অনুমতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বর্গীয় স্মৃতিসুখে তাহারা পার্থিব কষ্ট ভুলিয়াছিল। তিনি দুই বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই অসম্ভব সুখসাধন-প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল; চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণমিলনে পূর্ব্বাভাসমুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,— * "চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥" *এই শুভলক্ষণাক্রান্ত মুহূর্ত্ত দীর্ঘকালের পরে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া আসিল। প্রভুকে তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল, তাহা এক অশ্রুত-পূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের ন্যায় গোবিন্দদাস আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম :—

"আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥ খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে। খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥ সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া। নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥ হরিদাস, রামদাস আর কৃষ্ণদাস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥ জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন। ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥ বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর। নারায়ণতীর্থ আর দাস গিরিধর॥ গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ। প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥ রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরামদাস আসে হৈয়া পুলকিত॥ শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল। আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল॥ কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গান গায়। এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥ হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া। নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া॥ মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা। হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল। হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল॥ একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। প্রভুকে লইতে সবে করে আগমনে॥ মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল। আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল॥ কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া। মাথা দুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া। খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল।

দুই বাহু পশারিয়া দিলা তারে কোল॥ নাচিতে লাগিলা গোরা বাহু পশারিয়া। সার্ব্বভৌম-পদতলে পড়িল লুটিয়া॥ হাত জুড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল। তোমার বিরহ বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥ বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া। এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া॥ শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত। গুড়ু গুড়ু শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥ কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া। একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া॥ হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥ হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর। রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥ প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥ রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়। রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়। মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায়॥ অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা। কোটী কোটী লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥ ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ। হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥ এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে। দর দর প্রেম-অশ্রু লাগিল বহিতে॥ একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়। অমনি আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায়॥ * * * ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি। আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি॥ * * বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে। এই জন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে॥ বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে। ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে॥ আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজপাট। মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট॥"

গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্যদেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশগুলির মনোহারিত্ব নষ্ট হইয়াছে, অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্থলে উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।

কড়চায় দোষ।

নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা-বিস্তার।

গোবিন্দদাসের কড়চা পড়িয়া মনে হয়, সেকালেও "অস্ত্রহাতা বেড়ি গড়া"

অপেক্ষা কর্ম্মকারশ্রেণীর মধ্যেও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইয়াছেন ; সমাজের অস্থায়ী সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃত সীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই।[১]

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

কবি জয়ানন্দ বর্দ্ধমানস্থ আমাইপুরা গ্রাম (বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে অম্বিকা) নিবাসী সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে চৈতন্যশাখায় সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে। কবি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উজ্জ্বল রহিয়াছে। কবি * "খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্য অল্প ভক্তি"— * বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ-বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ মিশ্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সদ্বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। সেকালে যিনি

কবির পরিচয়।

১. জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ কর্ম্মকারের পুরীতে যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছেন গোবিন্দ কর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন না, তিনি কায়স্থ ছিলেন এবং এই মত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চায় ৫০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরযুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতে কড়চার আদ্যন্ত খাঁটি জিনিষ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫০ পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে সকল যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টীকায় (১৯২ পৃ.) তাহা বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জয়ানন্দের পুঁথিতে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে কর্ম্মকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,—ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের বিশ্বাস নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই সকল যুক্তিতর্কের পুনশ্চ অবতারণা করা প্রয়োজনীয় মনে করি না। তবে কড়চার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে শব্দাদির সংশোধন হইয়া থাকিবে—কিন্তু নিখুঁত প্রাচীন-রচনা এখন কোন পুস্তকেরই নাই ;—নকলকারিগণ সকল পুঁথিরই এক আধটু সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই প্রাচীন-তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তকখানিকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের কড়চা নামক যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।" (পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩০৪, তৃতীয় সংখ্যা)। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ দাসের কড়চায় ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ করি না। কেননা কবি জয়ানন্দও গোবিন্দকে কায়স্থ বলেন নাই, কর্ম্মকারই বলিয়াছেন।"

এই গোবিন্দের উল্লেখ বলরাম দাস তৎকৃত একটি পদে করিয়াছেন,—গৌরপদতরঙ্গিনী, ৪০৪ পৃ.

যত বেশী উপবাস করিতে পারিতেন, তিনি সমাজে ততদূর আদরণীয় হইতেন। কৃত্তিবাস— * "ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস।"— * বলিয়া ভ্রাতার উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, জয়ানন্দও— * "বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসী"— * সগর্ব্বে প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। জয়ানন্দ মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী; তাঁহার ছেলে হইয়া বাঁচিত না, এজন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল 'গুইঞা'। চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বর্দ্ধমান ফিরিয়া যাইতে আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং আমাদের কবির 'গুইঞা' নাম ঘুচাইয়া জয়ানন্দ নাম রাখিয়া যান। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কতকগুলি বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচলিত মত হইতে স্বতন্ত্র। প্রচলিত মত জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাসস্থান শ্রীহট্টস্থ ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম, কিন্তু আনন্দের মতে উহা শ্রীহট্টস্থ জয়পুর গ্রাম। প্রচলিত মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম * ("বুড়নগ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস"—চৈ. ভা., আদি), * কিন্তু জয়ানন্দের স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগছি গ্রাম। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (ইঁহার উপাধি ছিল রাজা ভ্রমর) ভয়ে তিনি পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমনপূর্ব্বক বাস করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে একদা কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদে ইষ্টকবিদ্ধ হয়; দুই একদিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানসংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল,—জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্তর্হিত হইবে। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সকল বৃত্তান্ত এই পুস্তক ভিন্ন অন্য

চৈতন্য-মঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

কোন প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। নিম্নে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল :

"আর এক পুত্র হৈলে বিশ্বরূপ নাম। দুর্ভিক্ষ হইল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥ নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা। নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥ তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে। বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥ নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥ দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥ গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট্ ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥ পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥ গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥ এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল। বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥ উৎকলে প্রতাপরুদ্র-ধনুর্ম্ময় রাজা। রত্ন সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥"

কিন্তু ইহার পর গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃসংস্কার হইল। কিন্তু পিরল্য গ্রামে বসিয়া মুসলমানগণ যে সব ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। * "পানি পিয়ে শেষে জাতি বিচার" * আর বৃথা। এই ভাবে নবদ্বীপের দুর্গতির মোচন হইলে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

পদকল্পতরু ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যে বারমাস্যা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে উহা বলায় তিনি পরিষৎ পত্রিকায়[১] নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া উক্ত কবিতাটি জয়ানন্দের

১. ৩য় সংখ্যা, ১৩০৪ সন।

খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত পদটির মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার সুমধুর ঝাঁজ পাইয়াছিলাম ; যাহা হউক, উহা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে সাহিত্যসেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম্য ঘটিবে না।

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন লেখকগণ কোনরূপ আভাস দিতে এতই কৃপণতা করিয়া গিয়াছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক যদি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে মুষ্টিমেয় তত্ত্বও ভিক্ষা দিয়া গিয়া থাকেন, আমরা তাহাতেই নিরতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। জয়ানন্দ নিম্নলিখিত সামান্য বিবরণটি প্রদান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ;—

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার। অনন্ত কবীন্দ্র গায় মহিমা জাহার॥ শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥ জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥ চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে॥ সার্ব্বভৌম রচনা করিল প্রেমানন্দে॥ শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে। সংক্ষেপ করিল তিঁহ গোবিন্দবিজয়ে॥ আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥ সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥ গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ ঐতিহাসিকতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত চরিতাখ্যান-গুলিকে কাব্যের মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস যে কর্ম্মকার ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কবির অন্যান্য রচনা।

চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত 'ধ্রুব-চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামক দুইখানি ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

(গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

পরবর্ত্তী চরিত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত। তখন নিম্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হইয়া উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদানবিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল; আত্মরক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর বিনয়ধর্ম্ম অবিরত সেই কটু লবণাম্বুস্পর্শে ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল।

বৈষ্ণব সমাজের স্বাতন্ত্র্য।

১৫৩৫ খৃ. অব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্যপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,— * "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন"—(চৈ. ভা., আদি; ১০ম অ. ও মধ্য, ১ম ও ৮ম অ.)। * বৃন্দাবনদাস দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং এই দীর্ঘজীবন তিনি বৈষ্ণব সমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, খেতুরির উৎসব উপলক্ষ্যে 'বিজ্ঞবর' বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন; ১৫৭৩ খৃ. অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৪০ বৎসর পরে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দবংশমালা' রচনা করেন।[১] তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দনা পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড়গ্রামে (মন্ত্রেশ্বর থানা) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা 'দেনুড় শ্রীপাঠ' নামে এখনও পরিচিত।

বৃন্দাবনদাসের পরিচয়।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—

১. এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খৃ. অব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী তৎপ্রণীত বঙ্গরত্নে (দ্বিতীয় ভাগ) লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবত ১৫৭৫ খৃ. অব্দে প্রণীত হয়।

তাঁহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচী-মাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন—তাঁহার পদাঙ্কে ধ্বজব্রজাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—এই কথাগুলি ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার,

চৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণ।

—সুতরাং উভয় চরিত্রে ঐক্য অতি অল্প। তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্য-লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে—"সনকাদি শিষ্যগণবেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন"—নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষ্যে "হৈহয়, বাণ, নহুষ, নরক, রাবণ" প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশপ্রমাণসূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ছাঁচে ঢালা; গুইজো, বাকল, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড় জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন হইতেও নিয়ম সঙ্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ্ কি না, বলা যায় না;

ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

এই ভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন। বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক লেখার গুণে মিথ্যা-সুন্দরীও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস গীতার— * "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"— * আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটি শ্লোককে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যপ্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও যুগ-প্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে। কেহ রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥ নানাস্থানে অবতীর্ণ হইলে ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হইল সবার

মিলন ॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যাঁহা অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোসাঞি। সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। কোন মহাপ্রিয় বসে জন্ম অন্যস্থানে ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান। চৈতন্যবল্লভদত্ত বাসুদেব নাম ॥ চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ। বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম। যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ * * * নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বাল কেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপ পড়িলে সে বিদ্যারস পায়। অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন ॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে ॥ যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধি মারে ॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি কারো গুণ না করে কথন। যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমান। তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চরয় ॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায় ॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম। নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ * * * সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নহি কারো বাসে ॥ বাশুলি পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে ॥ নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে।

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥ কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ। বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥ * * * সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে ভাগবতগণ। কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর এড়িতে। কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে। জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ। অবতারিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥"[১]

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্ব্বদা নিরাপদ্ নহে। বৃন্দাবন দাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্র লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই।

অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবনদাসের উদ্ভাবন শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিক গল্পে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি।

ক্রোধের কারণ।

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রুচি সকল সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটূক্তি পল্লীগ্রামের কৃষকের নাতিসূক্ষ্ম হলের ন্যায় অমার্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার দোকানে অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষসূচক কথাগুলিও মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে; কটূক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্ দুর্দ্দান্ত একটি শিশুর ন্যায় খোলাখুলি ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন-দাসের সেই অসহিষ্ণু ও উগ্র রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখিতেছি মাত্র; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎভাগে, তথাপি বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় না

১. চৈতন্যভাগবত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬—১৯ পৃ.।

পাওয়া যায়, এমন নহে ; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, সংকীর্ত্তনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায়, এজন্য বৈষ্ণবদ্বেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। ইহারা চৈতন্যদাসের দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা বিষ্ণুভক্তির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং * "ইন্ধনমালা বলয়তি বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহু॥ * * ভঞ্জনে বীর। কীর্ত্তনে পতনে মল্লশরীর॥" * প্রভৃতি তীব্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম লইয়া ইতরভাবের পরিহাস চলিতেছিল! চৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাস আছে,— * চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ যারে আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥"—চৈ. ভা., মধ্য। * বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ ; "মৃদূণি কুসুমাদপি" তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না থাকিলে তাঁহাদের বিনয় ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য অঙ্গীকৃত প্রীতি-ফুল ভাঙ্গিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন ; মানুষ-রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জ্জনীয় নহে।

বৃন্দাবনদাস ৩৮ বৎসর বয়সে ভাগবত রচনা করেন। এই বয়সে তাঁহার বিরাট্ ঘটনা-রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল ; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে

চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য।

আমরা চৈতন্যভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। চৈতন্যভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা বেশী প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান্ পৃষ্ঠা

সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয়সহকারে চৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর এবং অমার্জ্জিত ভাষার উত্তেজনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্যপ্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,—তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; দৃষ্টান্তস্থলে, আমাদের অনুরোধ—চৈতন্যপ্রভুর গয়াগমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন।

চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়াগমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত ও অন্ত্যখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। শেষখণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য-জীবন-বর্ণনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। চৈতন্যপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্ব্বদা বৃন্দাবনদাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দবংশমালা' ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়।

(গ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃ. অব্দে) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস; বাড়ী কোগ্রাম, বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। দুর্ল্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

কবির পরিচয়।

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা সতী শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥ কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥ মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব তীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥ যথা যায় তথাই দুলিল

করে মোরে। দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আকর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত লোচনদাস 'দুর্ল্লভসার' এবং 'আনন্দলতিকা' নামক আর দুইখানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যমঙ্গলই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কথিত আছে যে, তিনি ১৫৭৫ খৃ. অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর। যিনি "আহ্লাদে ছেলে" বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি প্রৌঢ় বয়সে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কোনও কোনও পুষ্প ফুটিতে দীর্ঘ সময় লাগিলেও তাহা সুরভিতে ন্যূন নহে। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

চৈতন্যমঙ্গল।

কথিত আছে, কোন ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় বলেন, —* "গৌরভক্তগণের প্রভাব এই রূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু; দেখিতে সুন্দর, কিন্তু দংশনের ক্ষমতা রহিত।"*

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই অভিহিত ছিল, কৃষ্ণদাস চৈতন্যভাগবতকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, লোচনদাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখায় বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে; বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনদাসের পুস্তকের নামের 'মঙ্গল' শব্দ উঠাইয়া তৎস্থলে 'ভাগবত' করেন; এইভাবে দুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়। চৈতন্যমঙ্গলে * "বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে"— * এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সত্য, বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা অন্য সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, ভাগবতের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া বই লেখার দরুণ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা উহার নাম "চৈতন্যভাগবত" দিয়াছিলেন।

ভাগবত ও মঙ্গল নাম লইয়া বিরোধ।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে

অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ। চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্রাভ করিয়া দিয়াছিল, তিনি ঘটনা, প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

কল্পিত ঘটনা।

বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেব-হাস্যটুকুর বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং পথহারা পান্থের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়।

অবতারবাদের ব্যাখ্যা।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করি না এবং বৈষ্ণবসমাজও সদ্বিবেচনার সহিতই ইহার স্থান চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বহুবার শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্য-মঙ্গলের সেরূপ করেন নাই। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্ত্তী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

প্রামাণ্য নহে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও, অন্যদিক দিয়া ইহার গৌরব আছে। ৩০০ বৎসর কাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের পুষ্পপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ

ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনায় কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানা ভাষামিশ্রিত জটিল লেখায় কবিত্বের সুরভি নাই। এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন; প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্য্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না, কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিষ্ফল খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দকুসুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে অঙ্কিত হইয়াছে;—

কবিত্ব।

"চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজলতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুকে বহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥ মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কাঁদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। থুইয়া হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥ কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি॥ পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু, কাঁদে মাত্র চরণ ধরিয়া। প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া॥ নানারূপে কথাভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁদমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে। শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, বেশ লীলা রসকলা। তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জালা। আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে॥ ধিক রঁহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়ে যাবে পথে। গহন কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা তব যাবে সাথে॥ শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ তেন পরশিতে মনে লাগে ভয়। ভুমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ গাছে গাএ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে

কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়। সুখময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়াসে মাত্র দেখি। বরিয়া বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্ন্যাস করেন বড় দুঃখী॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই॥ * * * কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে। তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে।॥" চৈ. ম., হস্তলিখিত পুঁথি।—

যে কথার যাদুমন্ত্রে পাষাণ জাগিয়া উঠে ও মঞ্জুরিত হয়, চৈতন্যের সেই বাক্‌ছলাও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক অপনোদন করিতে পারে নাই। "তুমি সংসার ত্যাগ করিবে," সংসার অর্থ ত স্ত্রী, আমার জন্য বাড়ী ঘর কেন ছাড়িবে? "তোমায় নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া—সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে।" চৈতন্যমঙ্গলের এই সকল গান করুণ রসের নির্ঝর। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্য-দেবের সন্ন্যাসের প্রাক্কালে এই দাম্পত্য-লীলা শ্রুতি সুখকর হইলেও সর্ব্বৈব মিথ্যা। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, তখন তিনি মহাভাবা-বিষ্ট, প্রেমোন্মাদ,—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম তখন তাঁহার মনের গণ্ডীর বহু দূরে।

লোচনের হস্তলিপি।

কোগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুস্করা ষ্টেশনের নিকট) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন, "লোচনের আঁখর উঠানযোড়া কএর মত।" লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।

অন্যান্য রচনা।

চৈতন্যমঙ্গলও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক ছোট, চৈতন্য-ভাগবতের অর্দ্ধাংশের তুল্য হইবে। লোচন-দাস ১৫৮৯ খৃ. অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন। চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইঁহার 'দুর্ল্লভসার' নামক অপর একখানি পুস্তক আছে; তাহাতে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সহজিয়া ধরণের অনেক কথা আছে। এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ রচনা করেন।

মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল অসম্পূর্ণ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ; উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কতক-গুলি স্থানও বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই। বঙ্গবাসীর সংস্করণেও আছে।

"বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে। সম্ভ্রমে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহ দ্বারে, সঙ্গে নিজ জন যত তেমনি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥ তখন দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥ কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। দেখিয়া সে কি কি বলি আইল তখন॥ বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্তআর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয় তখন। গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥ এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥"

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই।

(গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খৃ. অব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁহার পিতা ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন; কৃষ্ণদাসের যখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন ৪ বৎসরের শিশু। এই দুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস তাঁহাদের পিসিমাতার গৃহে পালিত হন।

কৃষ্ণদাসের পরিচয়।

কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্তু একদিন ব্যতীত কষ্ট তাঁহাকে

(১) মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত "আনন্দ রত্নাবলী" নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাসসম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন! বিবর্ত্তবিলাস-প্রণেতা চৈতন্য-চরিতামৃতের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের শেষ দিন ; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন। জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন নাই ; প্রকৃতি তাঁহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ধাত্রীক্রোড়ে পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন ; কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ-সুখ তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন ; তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

একদিন নিত্যানন্দপ্রভুর সুবিখ্যাত ভৃত্য 'মীনকেতন' রামদাস ঝামটপুরে আগমন করেন ; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবপ্রভাবে মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল ; শ্যামদাসের চপল বাগ্‌বিতণ্ডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে স্বপ্নাদেশ করিলেন ; নিঃসম্বল কৃ[illegible]ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার [illegible] নীপতরুবহুল সিকতাভূমি, শ্যামতমালাবৃত কুঞ্জ বৈষ্ণবের চি[illegible] ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে। কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন [illegible] চিত্ত নির্ম্মল,—শুভ্রপুষ্পসম ; সুতরাং যখন তিনি সনাতন, রূপ, জীব, [illegible] গোপালভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়[illegible] লাগিলেন, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি সরসভাবে [illegible] জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে "গোবিন্দলীলা[illegible] "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী" প্রণয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত[illegible] কর্ণামৃতের টীকায় ও কবিত্বশক্তি "গোবিন্দলীলামৃতে" বৈষ্ণবসমাজে বিদি[illegible] ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "অদ্বৈতসূত্রকড়চা", "স্বরূপবর্ণন", "রাগময়[illegible] প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ "চৈতন্যভাগবত" রীতিমত প্রত্যহ সায়ং[illegible] একত্র হইয়া পাঠ করিতেন ; কিন্তু উহাতে চৈতন্য-প্রভুর অন্ত্যলীলা বি[illegible] রূপে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোঁসাঞি, ভূগর্ভ গোঁসাঞি, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন, —তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ ; ধীরে ধীরে

চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা-আরম্ভ।

কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন ; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে পড়িলেন ; পূজক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমাল্য হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, তখন সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না।

কিন্তু দৃষ্টি শক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়, বৃদ্ধ এই গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায়) কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।[১]

রচনা শেষ।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলসুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই ; বৃন্দাবনের শীতলবায়ু ও নির্ম্মল আকাশের নীচে ভক্তির অবতার চৈতন্যমূর্ত্তি কৃষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গৌড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন ; সুদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাকিলেও সেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় সুকুমার ও বিনয়মাখা ; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণদাস পত্রে পত্রে নারায়ণীপুত্র বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি পড়িয়া আমরা তাঁহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি। চৈতন্য-

গ্রন্থ-সমালোচনা।

১. "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনান্তরে
সূর্য্যে হ্সিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥"

এই শ্লোকটি চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। আমরা "অগ্নি"কে "তিন" শব্দের অর্থে ধরিয়া লইয়াছি, কেহ কেহ অগ্নির অর্থ "সাত" মনে করেন, তাহা হইলে ১৫৭৭ শকাব্দ হয়।

প্রভুর জীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গুরুত্ব-হিসাবে গোবিন্দদাসের কড়চার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনায় তত ঘন সন্নিবেশ নাই ; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ ছবির 'চাল-চিত্রের' ন্যায় মূল আলেখ্যটির সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করিয়াছে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দ লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,—এই বহুগুণসমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে প্রতিভাত ক্ষুদ্র লতাগুল্মপুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।

কেবল অন্ত্যলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সব স্থল বিচক্ষণভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু সংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত, আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।[১]

এই পুস্তকে মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদ,

---

১. চৈতন্যচরিতামৃতে কোন্ কোন্ সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন (অনুসন্ধান—১৩০১ সাল, ৫ম সংখ্যা।) তাহা এই,—

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তরচরিত, (৫) উজ্জ্বল-নীলমণি, (৬) একাদশী তত্ত্ব, (৭) কাব্যপ্রকাশ, (৮) কূর্ম্মপুরাণ, (৯) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১০) কৃষ্ণ-সন্দর্ভ, (১১) ক্রমসন্দর্ভ, (১২) গরুড়পুরাণ, (১৩) গীত গোবিন্দ, (১৪) গোবিন্দলীলামৃত, (১৫) গৌতমীয়তন্ত্র, (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক, (১৮) দানকেলি-কৌমুদী, (১৯) নাটক চন্দ্রিকা, (২০) নারদ পঞ্চরাত্র, (২১) নৃসিংহপুরাণ, (২২) পঞ্চদশী, (২৩) পদ্মপুরাণ, (২৪) পদ্যাবলী, (২৫) পাণিনিসূত্র, (২৬) বরাহপুরাণ, (২৭) বিদগ্ধমাধব, (২৮) বিশ্বপ্রকাশ, (২৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৩০) বীরচরিত, (৩১) বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, (৩২) বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, (৩৩) বেদান্তদর্শন, (৩৪) বৈষ্ণবতোষণী, (৩৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৩৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৩৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৩৮) ভক্তিলহরী, (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ, (৪০) ভগবদ্গীতা, (৪১) ভাগবত-পুরাণ, (৪২) ভাগবতসন্দর্ভ, (৪৩) ভাবার্থ-দীপিকা, (৪৪) ভারতী, (৪৫) মলমাসতত্ত্ব, (৪৬) মনুসংহিতা, (৪৭) মহাভারত, (৪৮) যমুনাচার্য্যকৃতালকমন্দারস্তোত্র, (৪৯) রঘুবংশ, (৫০) রামায়ণ, (৫১) রূপগোস্বামীর কড়চা, (৫২) লঘুভাগবতামৃত, (৫৩) ললিতমাধব, (৫৪) সংক্ষেপভাগবতামৃত, (৫৫) সাহিত্যদর্পণ, (৫৬) স্তবমালা, (৫৭) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, (৫৮) শাশ্বততন্ত্র, (৫৯) হরিভক্তিবিলাস, (৬০) হরিভক্তিসুধোদয়।

শ্লোকসংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১; ও অন্ত্যে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৩৫০০। অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক। আমরা গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্য-প্রভুর উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিষ্কার একটি ব্যবচ্ছেদরেখা অনুভব করা যায়, কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ক্বচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার জীবনে পূর্ব্বে যে ভাব মেঘান্তরিত আলোর রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাবে শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্ত্যখণ্ডে আঁকিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভু কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গম্ভীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সমুদ্র সৈকতে তাঁহার শিথিল অস্থিবিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার কঙ্কালসার মূর্ত্তিটি উঠাইয়া লোকবৃন্দ কর্ণমূলে হরিণাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিদ্ধ পটে ছুটিতেছেন,—স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্ম্মসার,— * "চর্ম্মপাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈয়া। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া॥"—(চৈ. চ., অন্ত্য)। * তাঁহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, * "একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণরাসলীলা হয় দেখিলা স্বপন॥"—(চৈ. চ., অন্ত্য)। * জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন।

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা।

যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, তথাপি এই ভক্তিবিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহতাচ্ছিল্যে পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শেষ সময়েও 'মা' বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত; আমাদিগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও শুভক্ষণে ছায়ার ন্যায় মনে উদয় হইয়া লীন হয়, সেইরূপ ইহসংসারের কথা ক্বচিৎ ছায়ার ন্যায় চৈতন্যপ্রভুরও স্মৃতিপথে উদিত হইয়া বিলয়

প্রাপ্ত হইত। জগদানন্দকে তিনি বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মায়ের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—* "তোমায় সেবা ছাড়ি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥"— * চৈ. চ., অন্ত্য।

ইহসংসারের স্মৃতি।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা নির্দ্দোষ নহে; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃতে সুদক্ষ হইলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন না। বিশেষ, বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকায় তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষায় বৃন্দাবনী এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল যে, একজন উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লোক কয়েক বর্ষ বাঙ্গালা-মুলুকে থাকিলে যেরূপ বাঙ্গালা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষা একরূপ নহে, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গালাও পাওয়া যায়। ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর রচনা, উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী।

রচনার দোষ।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খৃ. অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি কথা লিখেন,—"আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥ বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে স্থির॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি॥"

রচনার বিনয়।

কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; * "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" * ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতার বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন, সন্দেহ নাই,—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা কঁরো মুঞি পানে॥—(চৈ. চ., অন্ত্য)।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাহা জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় বহিয়া

যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল, সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে উপভোগ করেন ; পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,— * "যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সেই দিনই বিফল।"[১] *

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল ; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয় ; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে। এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,— * "রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"—প্রেমবিলাস। * এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুকে ফাটে।"[২] মতান্তরে এই বিষয়ের ভিন্নরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কর্ণানন্দে লিখিত আছে যে, পুস্তক অপহরণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ঘটনার কয়েক দিবস অন্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। যাহা হউক এই দুই বিবরণেই দৃষ্ট হয়, অতি বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার শোক তিনি বহন করিতে পারেন নাই।

পুস্তক লুণ্ঠন ও কবিরাজের মৃত্যু।

চরিতামৃতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন নাই,—শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে।

---

১. নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩০০, ২৬৫ পৃ.।

২. নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০, ২৬৫ পৃ.। ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে এই বৃত্তান্তের অনৈক্য।

কবিরাজ ইহার একটু পূর্ব্বাভাস জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না ;— তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

রচনার নমুনা।

কবিরাজ প্রেমধর্ম্ম এবং আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল ;—

(১) "কাম প্রেম দোঁহাকারে বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ॥ কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করিব যত তাড়ন ভৎ‍র্সন ॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন ॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর। কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর ॥" (চৈ. চ., আদি)।

(খ) "মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ ॥ যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধররসে আমা করে বশ ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ এইমত জগতের সুখ আমা হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান ॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ কৃষ্ণআলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ অনুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত ॥"—(চৈ. চ., আদি)।

চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটি অতি সুন্দরভাবে বিম্বিত হইয়াছে ; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল— * "প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। অঙ্কুর, পুলক

মধু অশ্রু বরিষণ॥ ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায়॥" * উন্মত্ত ভক্তির আবেশে,— * "প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥" * তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরুপুষ্পপল্লবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল "কৃষ্ণ" ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল;— * "শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে। প্রভুকে শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে॥" *

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সমাবেশের সুযোগ ছিল। রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে * "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ সো নহ রমণ্ হম নহ রমণী॥" * প্রভৃতি সুশ্রাব্যপদ আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ই দেখিতে পাই। এই পদটি রায় রামানন্দ কৃত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "রসভক্তিলহরী"[১] নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে।[২]

(ঘ) নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি

পরবর্ত্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্যপ্রভুর পারিষদ্‌গণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর সমস্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা বৃন্দাবনদাসের "নিত্যানন্দ-বংশাবলী'র কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রেম-বিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রভু নিত্যানন্দের সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ জীবনচরিত ছিল, প্রেমবিলাসে বারংবার এই পুস্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হয়ত নিত্যানন্দ-বংশীয় লোকদের কাহারও দ্বারা এই পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুড়ী, পিতার নাম হড়াই ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী —বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অম্বিকাগ্রামের নিকট শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাদেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবাদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে

নিত্যানন্দ।

১. এই পুস্তকের হস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকটে আছে, অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

২. 'ভক্ত দিগ্‌দর্শনী'র তালিকা মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ১৪১৮ শক (১৪৯৬ খৃ.অ.) এবং মৃত্যু ১৫০৪ শকের (১৫৮২ খৃ. অ.) চান্দ্রাশ্বিন শুক্লাদ্বাদশী।

সুপরিচিত। জাহ্নবাদেবী দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।[১] অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ[২], পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান শ্রীহট্টান্তর্গত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামদাসপ্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গলে", ঈশাননাগর প্রণীত "অদ্বৈতপ্রকাশে" ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "অদ্বৈতের বাল্যলীলা-সূত্র" প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার সম্পূর্ণ বৃতান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপসনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত পার্শ্বচর। ইঁহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী প্রদান করিতেছি; —

অদ্বৈতাচার্য্য।

রূপসনাতন।

রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইঁহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করায় ইঁহারা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইয়াছেন।[৩]

---

১. নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলী লইয়া সম্প্রতি অদ্ভুত অদ্ভুত মত প্রচারিত হইতেছে। গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত আমাকে নানা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নহেন, এমন কি জাহ্নবা দেবী তাঁহার মতে পুরুষ। তিনি নায়িকা ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিতেন। এই সকল মত প্রথমতঃ আমি পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পণ্ডিতটি যেরূপ যুক্তি ও প্রমাণের বহর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে. নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে।

২. "নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায় সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥"—ঈশান নাগর-কৃত অদ্বৈতপ্রকাশ। এই "নাড়িয়াল' বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে কখনও "নাড়াবুড়া" কিম্বা শুধু 'নাড়া' বলিয়া আহ্বান করিতেন।

৩. সনাতন গোস্বামী 'দিক্‌প্রদর্শনী' নামক 'হরিভক্তিবিলাসে'র টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের 'বৈষ্ণবতোষণী নামক টীকা, 'লীলাস্তব' ও টীকাসহ দুইখণ্ড ভাগবতামৃত' প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'কৃষ্ণজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশদীপিকা'. 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধমাধব' 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী', 'আনন্দমহোদধি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা', 'মথুরামহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক-চন্দ্রিকা',

বিপ্ররাজ
(কর্ণাটদেশের রাজা)
|
অনিরুদ্ধ
|
রূপেশ্বর (ইনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া পৌরস্ত্য দেশের অন্তর্গত শেখর রাজ্যে বাস করেন) — হরিহর (ইনি রাজা হন)

রূপেশ্বর
|
পদ্মনাভ
(ইনি নৈহাটীতে বাড়ী করেন)
|
পুরুষোত্তম — জগন্নাথ — নারায়ণ — মুরারি — মুকুন্দ

মুকুন্দ
|
কুমারদেব
(ইনি বাকলাচন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে বাস করেন।)
|
সনাতন (১৪৮৮ খৃ.—১৫৫৮ খৃ.) — রূপ (১৪৮৯ খৃ.—১৫৬৩ খৃ.) — বল্লভ

বল্লভ
|
জীবগোস্বামী

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃ.—১৫১৪ খৃ.), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস (১৪৯৮ খৃ. জন্ম), শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর ('চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক'-প্রণেতা) প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়।

অন্যান্য ভক্তগণ।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের বৃতান্ত অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; পদসমুদ্রের একটি পদে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে;— "শ্রীকরণনন্দন, দত্ত উদ্ধরণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত। ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত॥ শাণ্ডিল্যপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণবণিক খ্যাতি। রাধাকৃষ্ণপদ, ধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥ বিষয় বাণিজ্য,

সাংসারিক কার্য্য, সর্ব্ব পরিত্যাগ করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে হইলা বিবেকাচারী ॥ নীলাচলপুরে, প্রভু মিলিবারে সদা ইতি উতি ধায়। আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥ প্রভুভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিয়া যতন করি। এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ দত্তের দৈন্যতা হেরি ॥"[১]

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধরদাস এক সময়ে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য, নরত্তোম ঠাকুর ও শ্যামানন্দও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র এপর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কীট অগ্নি প্রভৃতির উপদ্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে। গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজি গ্রামে। নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দদত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত (পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন। এই সন্তোষদত্তই খেতুরীর ষড়্‌বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী একত্র করেন।

শ্যামানন্দ, দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক সদ্গোপের পুত্র, মাতার নাম দুরিকা। বাল্যকালে ইঁহাকে সকলে 'দুঃখী' বলিয়া ডাকিত, তৎপর ইনি

'লঘুভাগবতামৃত', 'গোবিন্দবিরুদাবলী', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীর 'হরিনামামৃতব্যাকরণ', 'সূত্রমালিকা', 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা', 'গোপালবিরুদাবলী', 'মাধবমহোৎসব', 'সঙ্কল্পবৃক্ষ', 'ভাবার্থসূচকচম্পূ' প্রভৃতি ২৫ খানা সংস্কৃতগ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। ইঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

১. ৺হারাধনদত্তের মতে উদ্ধারণদত্ত ১৪৮১ খৃ. অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

'কৃষ্ণদাস' ও বৃন্দাবনে বাস-কালে 'শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহার দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' ও 'অভিরামলীলা গ্রন্থে' তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল পূর্ব্বে গৌড়দেশবাসী ছিলেন; তৎপর উৎকল দেশে যাইয়া দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরগ্রামে নিবাস-স্থাপন করেন। শ্যামানন্দ শেষজীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইঁহাদের চেষ্টায় উৎকলবাসী অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জাধিপতি এবং উড়িষ্যার বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পরিবার রসিকানন্দবংশীয়গণের শিষ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভমধ্যে এই তিন জন প্রেমবীর বৈষ্ণব সমাজে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস কায়স্থ হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সকল পণ্ডিত যে রাশিকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে-কায়স্থপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্কপল্লীরাজকেও তাঁহারই অশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার,—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র, গঙ্গাতীরবাসী নরহরি চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্নাকরের গর্ভে যেরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ নানা মূল্যবান্ ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়ায় ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার উপায় নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।

ভক্তিরত্নাকর।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা আবশ্যক। য়ুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্তৃতামালা-উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিম্বা নবদেশ আবিষ্কার চিন্তায় প্রশান্ত-সাগরের শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরের পত্রাচ্ছন্ন কুটীরে লগুড়াঘাতপূর্ব্বক তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি মুষ্টির শব্দ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধূম্রপটলে গ্রন্থপত্র যেন বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ইতিহাসও রাজনৈতিক ব্যাপারেরই যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নর-শোণিতলিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়।

য়ুরোপের ইতিহাস।

কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্যরূপ। মুণ্ডিতমস্তক, ভূলুণ্ঠিত, তুলসী-মাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই গ্রন্থের নায়ক। খোলবাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় য়ুরোপীয় লেখকগণ ব্লুচার কি করটেজের যুদ্ধনীতিরও ততদূর প্রশংসা করিবেন না। কীর্ত্তনের কথা বলিতে গদগদভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নিপরীক্ষা। বর্ণিত গ্রন্থ সকলের নায়কগণ * "অশ্রুকম্পস্বেদাদিভূষিত" (ভক্তিরত্নাকর, ৩য় অধ্যায়) * হইলেই তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি—* "অরসিকে তু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"* আমার বক্তব্য এই যে বৈষ্ণবগণের নিকট এই সব পুস্তক এবং তদ্বর্ণিত প্রশংসাপূর্ণ বিষয়গুলি অমূল্য, বাহিরের লোক অনধিকারী, তাঁহারা ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই সব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক উপকরণ পাইতে পারিবেন, নানাদিক হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবে।

বৈষ্ণবের লক্ষ্য।

'ভক্তিরত্নাকরে' মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিষয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ বর্ণন ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত,

দ্বিতায় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা; তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন বৃত্তান্ত; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস. নরোত্তম ও রাঘব-পণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদ বর্ণনা ও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতির গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি ও পরিশেষে বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা; দশমে ও একাদশে জাহ্নবাদেবীর তীর্থাদি-দর্শন-বৃত্তান্ত; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্ত্তৃক নবদ্বীপ-বৃত্তান্ত বর্ণন; ত্রয়োদশে আচার্য্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও চতুর্দ্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্ত্তন; পঞ্চদশ তরঙ্গে শ্যামানন্দকর্তৃক উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন। তিনি বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ম্যাণ্ডিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউএনসঙ্গ-এর কুশীনগর হইতেও নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরের সূচি।

'ভক্তিরত্নাকরে' বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পূ, লঘুভাগবত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক, ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তিবিলাস, স্তবমালা, সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোষণী, শ্যামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃতশ্লোক প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহা এদেশের চিরাগত প্রথানুযায়ী। নরহরি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তক। 'ভক্তিরত্নাকরে' চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিই সর্ব্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস, রায়বসন্ত প্রভৃতি

ভাষাগ্রন্থের আদর।

বহুবিধ পদকর্ত্তার পদ সাময়িকপ্রসঙ্গ সৌষ্ঠবার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্বীয় পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর নাম 'ঘনশ্যাম' ব্যবহার করিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি প্রক্রিয়া পদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাসচরিত ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন। এই অপরিসীম কর্ম্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যে চিরদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পাষাণে কুসুম-সৌরভ প্রদান করিয়াছেন।

নরহরির অপরাপর রচনা।

নরোত্তমবিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষগ্রন্থ; এই পুস্তকে ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তি-রত্নাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতেও অধিক লক্ষিত হয়।

নরোত্তম-বিলাস।

সন্তোষদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষ্যে যে মহাসমারোহজনক উৎসব করেন, তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উৎসব, অতীত ইতিহাসে দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক বৈষ্ণবলেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।

খেতুরীর উৎসব।

নরহরির ইতিহাসের রচনা-প্রণালী অতি সরল,—গদ্যের ন্যায়; গদ্য লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার নমুনা এইরূপ,—

রচনার নমুনা।

"আচার্য্য অধৈর্য্য বাহে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। নরোত্তম কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥ প্রসাদী পাকান্ন সব লৈয়া থরে থরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে॥ সকল মহান্ত প্রতি কহে বারে বারে। কালি এ খেতুরি গ্রাম হবে

অন্ধকার ॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে। করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন। বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন। আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন। সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন। রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা। বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা।”—নরোত্তমবিলাস।

গৌরচরিতচিন্তামণি।

এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার লেখনী হইতে যেন অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহার পদসমূহ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। “গৌরচরিতচিন্তামণি”খানি নানামধুরালাপসম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায় ; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল ;—

“নিশি গত শশিদরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥ পতিবিড়ম্বন-লজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগনবনে ॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেঁই বলি শেজ তেজহ গোরা ॥ মোরে না প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ * * * ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে। কেহা না আইসে কাহারো কাছে। বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে ॥ তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। ভ্রমর ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে। তুলি না বৈসয়ে কুসুম পুঞ্জে ॥ কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে। ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা ॥”—২য় কিরণ।

প্রেমবিলাস এবং অপরাপর পুস্তক।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ; ইহার অপর নাম বলরামদাস,—ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারাম-দাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত ও ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি, পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

প্রেমবিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল, নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইঁহার রচনা জটিল। ভক্তিরত্নাকর হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন

“দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে ॥ এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা ॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে

সবার ॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয় ॥ নানা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল ॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন ॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্ন করি বুকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে ॥ দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥ যত্ন করি শ্রীপদ করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর ॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি ॥ প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব ॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥”

ইহার পূর্ব্বে যদুনন্দনদাসের ‘কর্ণানন্দ’ নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি,—ইহা আকারে চৈতন্যচরিতামৃতের অর্দ্ধেক হইবে। কর্ণানন্দ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত এই পুস্তকে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন,—

“বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতী[১] নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥ পঞ্চদশশত আর বৎসর ঊনত্রিশে।[২] বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ নিজপ্রভুপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥”

প্রেমদাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) “বংশীশিক্ষা”র নামও আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। “বংশীশিক্ষা”—আকারে যদুনন্দদাসের ‘কর্ণানন্দে’র তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাঙ্গপার্ষদ বংশীঠাকুরের জন্মাদি ও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধি “সিদ্ধান্তবাগীশ” ছিল। ইনি “বংশীশিক্ষা” ও স্বকৃত “চৈতন্য-চন্দ্রোদয়” নাটকের অনুবাদ সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

“শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।[৩] শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে ॥ লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে। ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে ॥[৪]

১. শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী।
২. ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ।
৩. ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।
৪. ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন। নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ ॥”—বংশীশিক্ষা।

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা ঐতিহাসিক ভাবে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না, ইহাতে ঈশাননাগর নিতান্ত অতি-প্রাকৃত কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী একটি কল্পনার সূত্রে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে তপস্যায় মগ্ন, শ্রীহরি গৌরাবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাণিকে অদ্বৈতরূপে পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখবন্ধটি এরূপ। তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। সেই সদ্যোজাত শিশু স্বর্গ মর্ত্ত্যের নানা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথাবার্ত্তার সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

অদ্বৈতপ্রকাশ।

এই সমস্ত অমানুষী তত্ত্ব প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বত্রই সুলভ; কিন্তু পুঁথির অধিকাংশই যদি তদ্দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তবে পাঠ করিবার ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ঈশানাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই অংশের যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন দিতেন, তবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইতে পারিত,—তাঁহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,—লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে কবিত্বের একেবারে স্ফূরণ না ছিল, এমন নহে। তিনি শ্রুত কথার উপর এবম্বিধ প্রাণঢালা আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত;—যেটুকু নিজে দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুলি বেশ সরস হইয়াছে। গ্রন্থশেষে নিজের কথা, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবস্থা, শান্তিপুরে গৌরাঙ্গ-মিলন, এ সকল আখ্যান উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণরসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক,—প্রাচীন পুঁথি কোন-খানিই একেবারে মূল্যহীন নহে,—অদ্বৈতপ্রকাশেও কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত আবির্ভূত হন,— * (“অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আসিল ॥”) * তাঁহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিযুগে কাল্পনিক আয়ু বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু আমরা ঈশাননাগরকে এ বিষয়ে অবিশ্বাস করি নাই।— * “সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥”— * অবশ্য “অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা” সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে,—কিন্তু প্রভুবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, এ সমস্তই

যখন ভক্তগণ লীলা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তির কোন কারণ নাই। অদ্বৈত ১৪৩৩ খৃ. অ. জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খৃ. অব্দে তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। কয়েকজন পণ্ডিত সন্দিহান হইয়া এই তারিখগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস কতকটা টলিয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে জানা যাইতেছে, অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন।— * "সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥" * এই নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতকে "নাড়া বুড়া" কিম্বা শুধু "নাড়া" বলিয়া আহ্বান করিতেন, এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতিপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্যাপতির দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈতপ্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচার্য্য, ও তাঁহার উপাধি ছিল "বেদ পঞ্চানন"। মহাপ্রভু অদ্বৈতের নিকট কতক দিন পড়িয়াছিলেন ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাওয়া গেল,—"শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর"—এই উপাধিবিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক চিত্রপট। সেই চিত্র শোকে সকরুণ, ব্রত উদ্‌যাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমান্বিত,—এই চিত্রের বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত,—ঈশাননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়া এস্থলে করুণার প্রস্রবণ উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন।

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঈশান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৪৯২ খৃ. অব্দে জন্মগ্রহণ করেন,—তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিধবা মাতা অদ্বৈতপ্রভুর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদবধি ঈশান সেইখানে। ঈশান ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈতরমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে। শান্তিপুরে এক দিন তিনি মহাপ্রভুর পা ধোয়াইয়া দিতে

অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বারণ করেন। তখন ঈশান উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—ঈশান ধর্ম্ম-জগতে সত্যই একটি বলবান্ পুরুষ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ করেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খৃ. অব্দে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়। তিনি বৃদ্ধকালে শ্রীহট্টস্থ লাউড় নগরে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদিষ্ট হন,—লাউড়-রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাঁহার বংশধরগণ গোয়ালন্দের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একখানি 'অদ্বৈতজীবনী' প্রণয়ন করেন। শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামবাসী বিজয়পুরী 'গ্রামসম্পর্কে অদ্বৈতপ্রভুর মাতা' নাভাদেবীর মাতুল ছিলেন। হরিচরণদাস অনেক কথাই তাঁহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তক ২৩ "সংখ্যা"য় (অধ্যায়ে) বিভক্ত। ইহাতে জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভুর ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহাদের নাম,—১। লক্ষ্মীকান্ত, ২। শ্রীকান্ত, ৩। শ্রীহরিহরানন্দ, ৪। সদাশিব, ৫। কুশল ৬। কীর্ত্তিচন্দ্র। আরও জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভু মাঘমাসের সপ্তমীতিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, উহা অবশ্য ১৪৩৩ খৃ. অব্দে হইবে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল।

নরহরিদাস (শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার নহেন) বন্দনাসূচক একটি পদে লিখিয়াছেন, * "জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী। যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি॥" * নিজের পরিচয় স্থলে শুধু "অতি অকিঞ্চন", "মহামূর্খ" প্রভৃতি সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন। বন্দনার পদগুলির মধ্যে একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী এইমাত্র জানা যাইতেছে।

নরহরি দাসের অদ্বৈত-বিলাস।

এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই নাই, অদ্বৈতের জন্ম, তাঁহার শৈশবের হামাগুড়ি ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা আছে। অর্থাৎ যে সকল ঘটনা সকল শিশু সম্বন্ধেই বর্ণিত হইতে পারিত, অদ্বৈত সম্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সহিত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

এতদ্বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের কোন নূতন পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। আমরা যে পুস্তকখানি পাইয়াছি,—তাহা খণ্ডিত—মাত্র ১৫ পত্র। রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর; একটুকু নমুনা উদ্ধার করিতেছি:— * "নদীয়া-বেষ্টিত গঙ্গা বহে সুনির্ম্মল। অপূর্ব্ব তরঙ্গ দুগ্ধ জিনি শ্বেত জল॥ স্রোতজল পরিপূর্ণ শোভার অবধি। বুঝি কুন্দমালা নবদ্বীপে দিল বিধি॥ ঝলমল করে গঙ্গাতট মনোরম। শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অনুপম॥ নানা জাতি বৃক্ষ শোভা করে সারি সারি। বিবিধ প্রকার লতা সর্ব্ব-চিত্তহারী॥ স্থানে স্থানে নানা জাতি পুষ্পের কানন। তাহে মহামত্ত হৈয়া ভ্রমে ভৃঙ্গগণ॥ নানা পক্ষী শব্দ করে অতি মনোহর। মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরন্তর॥" * পরিষদের পুথি, ৫।৬ পত্র।

অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—শ্রী ও সীতা। সীতা ঠাকুরাণীর প্রভাব সেই সময়ের বৈষ্ণবসমাজের উপর বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতা-ঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। লোকনাথ দাস 'সীতাচরিত্রে' সুচরিত্রা রমণীর জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। 'সীতাচরিত্র' বিশেষ বড় পুস্তক নহে, ইহা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্তু অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ, ঐতিহাসিকের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইবে কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, 'সীতাচরিত্র' লেখক লোকনাথদাস এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব জগতের গুরু স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভুতে তদ্গতপ্রাণ, যশোহর তালগড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিঃস্পৃহ বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন,—কোনরূপে খ্যাতি লাভে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের রচিত কোন পুস্তক থাকিলে, বৈষ্ণবসমাজে তাহার বহুল প্রচার থাকিত; অন্ততঃ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের অনেকখানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতাচরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতাচরিত্র' লেখা আরম্ভ করিলে, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন শত বৎসর

লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র।

হইবার কথা।[১] নানা কারণে ভক্তপ্রবর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। 'সীতাচরিত্রে' দুএকটি নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে ; মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও শচীদেবী জীবিত ছিলেন, নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতা ঠাকুরাণীর দুই শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের অনেক আশ্চর্য্য শক্তির কথা, জাহ্নুরায়ের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে প্রাসঙ্গিক-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উড়িষ্যাবাসী গোপীবল্লভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "রসিকমঙ্গল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষ্য ছিলেন। তিনি নিজ পিতামাতা প্রভৃতির কথা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই ;—

রসিক-মঙ্গল।

"চরণে লোটায় বন্দো রসময় পিতা। তবে ত বন্দিনু মাতাজিউ পতিব্রতা। পতিপত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন। রসিকচরণে সবে পশিয়েঁা শরণ॥ খুল্লতাত বন্দিনু বংশীমথুরা দাস। আদ্য শ্যামানন্দীতে যাহার প্রকাশ॥ গোপকুলে যো সবার হইল উৎপত্তি। শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুল শীল জাতি॥ গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস। মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতানন্দ। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন॥ বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাত। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যার পিতা মাতা॥ সগোষ্ঠি সহিত তারা রসিক কিঙ্করে। রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে॥"

গ্রন্থ-খানি ৪ ভাগে ১৬ লহরীতে পূর্ণ। আকারে লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র তুল্য হইবে।

রসিকানন্দের জন্ম (১৫১২ শক) ১৫৯০ খৃ. অব্দে। গ্রন্থকার স্বীয় গুরু রসিকের সমকালিক। গ্রন্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। 'রসিক-মঙ্গল' কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে কতক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় ২০০ বৎসর হইল, মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র-বংশোদ্ভব

১. ১৪৩২ শকে বৃন্দাবনে তিনি আগমন করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে তথায় কঠোর ব্রত অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কখনই ২৫ বৎসরের ন্যূন হওয়া সম্ভাবিত নহে। ১৫০৩ শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতাচরিত্র রচিত হইলে প্রায় একশত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

জগজীবনমিশ্র "মনঃসন্তোষিণী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্টভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। জগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে, অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপন্ন। এই সকল পুস্তক ছাড়া 'মহাপ্রসাদ পুবভব', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ', 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' প্রভৃতি পুস্তকও চরিতশাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে ধৈর্য্যহারা ও পথহারা হইতে হয়। যদিও এই পুস্তকসমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতিবৎসর কীট ও অগ্নির মুখে উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে মৃদঙ্গ বাদ্যের ন্যায় বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বুদ্বুদ্ উত্থিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট্ আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না বঙ্গদেশীয়গণ শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল, বিদেশী শাসনকর্তৃগণের ভেরীধ্বনিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে!

মনঃসন্তোষিণী এবং অপরাপর পুস্তক।

সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

সপ্তম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই,—স্থলে স্থলে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। অনুবাদ ও ব্যাখ্যাবিষয়ক পুস্তকও বিস্তর; স্বতন্ত্র অধ্যায়-ভাগ করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদশাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

অনুবাদ গ্রন্থাবলী।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজী রচিত হিন্দী "ভক্তমাল" শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ করেন। ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের

জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন; তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন;—

ভক্তমাল।

"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নাহি। যেহেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥ রচনা পূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি॥ উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের গুণগান করি যেতেমতে॥ অতএব টীকার অর্থ বুদ্ধি সাম্যমতে। রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে॥ যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেপে অতি। বর্ণিলা না প্রবেশের সাধারণ মতি॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বিস্তার করিয়া কহি তার পিছু পিছু॥"—ভক্তমালগ্রন্থ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য।

পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া 'রত্নাবলী' নামক একখানি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতপ্রভুর সমকালিক "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" এই রত্নাবলীর একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ রচনা করেন। আমরা অনুবাদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি;—

ভক্তি-রত্নাবলীর অনুবাদ।

"শ্রীকৃষ্ণপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব-নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ। সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ॥ নানান প্রকার শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু। তথাপি জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত॥ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী।"[১]

---

১. এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটারী বৈষ্ণব চূড়ামণি স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষ, বি. এ. মহাশয়ের নিকট ছিল, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।

অনুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্বহীন হইলেও অনুবাদ কিংশুকের ন্যায় পরিত্যজ্য হয়, সুতরাং ভাল একখানি অনুবাদ রচনা করা বড় বিষম ব্যাপার। কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জ্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে ; যথা ঃ—

"ভ্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মন তেন রমৌক তোমা পদাম্বুজে ॥ যেই পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভ্যন্তরে। তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমরা নাহি চরে ॥ সহস্র বিপদ মোর থাকুক সর্ব্বক্ষণ। তোমা পদকমল চিন্তয় যদি মন ॥ সুবর্ণ মুকুট থাকে সেই যেন ভার। যেই শিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কার ॥ জগন্নাথ মূর্ত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন ॥"

এখন "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। শ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে। ৪৫০ বৎসরের অধিক হইল সেখানে দিব্যসিংহ নামক এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইঁহার মন্ত্রী ; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শান্তিপুরে আগমন করেন, ইহারও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের 'বাল্যলীলা' বর্ণন করেন, অদ্বৈতশিষ্য ঈশাননাগর স্বীয় "অদ্বৈতপ্রকাশে" উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—* "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥" *

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধব মিশ্র কর্ত্তৃক একখানি ভাগবতানুবাদ প্রণীত হয়। ইহা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটি সরল ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকখানির নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও ইহা মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা যায় ; মাধব মহাপ্রভুর টোলের ছাত্র ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' ইঁহার পরিচয় এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ;

দ্বিজমাধবের 'কৃষ্ণমঙ্গল'।

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর ॥ তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরমপণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস ॥ সনাতন

পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব তার হয় আখ্যান॥ কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥ * * * * * শ্রীমৎভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ গীতবর্ণনিতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥ রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনুগ্রহ। সর্ব্ব ভক্তগণ তারে করিলেক স্নেহ॥"—প্রেমবিলাস

অন্যত্র প্রেমবিলাসে—

"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
রচিলা মাধব দ্বিজ করি নানা ছন্দ॥"

মাধব মিশ্রের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" ব্যতীত "প্রেমরত্নাকর" নামক আর একখানি (সংস্কৃত) কাব্য আমরা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী সময়ে ভাগবতেরও আরও কয়েকখানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ আমরা পরে লিপিবদ্ধ করিব।

অপর কয়েকখানি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পুস্তক।

যদুনন্দন দাস-কৃত "গোবিন্দলীলামৃতে"র বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় 'গোবিন্দলীলামৃত'খানি পরিণত পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন—যদুনাথ দাসের অনুবাদটিতে মূলের সৌন্দর্য্য বেশ রক্ষা পাইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহা ছাড়া যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও বিল্বমঙ্গলঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা', 'হাটপত্তন' ও 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তকই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'বিবর্ত্ত-বিলাসে'র গ্রন্থকার নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা। বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, 'কর্ত্তাভজাদলে'র কোনও লেখক এই ঘৃণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্কন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'পাষণ্ডদলন' ও রামচন্দ্র

কবিরাজপ্রণীত 'স্মরণদর্পণ' এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের 'গোপিকামোহন' কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। যে বৃন্দাবন 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়া চিরযশস্বী, তাঁহার লেখনী-প্রসূত 'গোপিকামোহন' কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বহু প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যক মনে করি না ; এখনও এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের আলো প্রবেশ করে নাই। ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দ্বারাই যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নির্ণীত হইবে। সমুদ্রে ভ্রমণকারী যেরূপ প্রত্যহ লবণাম্বুর একইরূপ নীল বৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি ; নরহরি সরকার এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া কোন্ কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে ?

একই ভাবের বিকাশ।

এই যুগের সাহিত্য হিন্দী-উপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট। এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল বৃন্দাবনীভাষার রাজত্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজ ইহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্যাম-কুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল, বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের তেমন ঐকান্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণববর্গের বাঙ্গালা কথা চারি আনা বৃন্দাবনীয় মিশ্রণে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্ত্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্থলে কথাবার্ত্তার উল্লেখ, সেইখানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে ; যথা—

হিন্দী প্রভাব।

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥

ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥”—চৈ. চ., মধ্য, ১৮ পৃ.।

“হইলু উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেলু অদ্বৈত গৃহেতে॥ সবে মহাদুঃখী হৈল আমার সন্ন্যাসে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে॥ সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলুঁ। তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ গমিলুঁ॥”—নরোত্তমবিলাস।

এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে; বৃন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

বঙ্গ-মৈথিল্যের পূর্ণ বিকাশ।

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে যাঁহারা পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়। প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্ত্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্ত্তিত হয়; তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নগ্ন শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম পুষ্পপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়। গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিল-গীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাবপ্রধান পদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মসৃণ নহে। গোবিন্দদাসের * (১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে—কাম কলঙ্কিনী গোরী।” (২) “মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মাল॥” (৩) “ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরীতরঙ্গ॥ ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥ ও তনু তরুণতমাল। ইহ হেমযূথিরসাল॥ ও নব পদমুনি সাজ। ইহ মত্ত মধুকররাজ॥ ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ॥” * প্রভৃতি পদ পড়িয়া প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

সত্যরাম কবি।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষীণতর;—

“কাঁহেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভজ, তুহুঁ রহনা দিনা। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়দে আশ, এসংসার অসার এক উহ নাম বিনা॥ যো কীট

পতঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক হ্যায় উহি একজনা। কবি সত্য কহে, মন থির রহো, যিনি দিহাঁ দন্ত, সো দেগা চিনা ॥"—(সত্যরাম কবি)। * একযুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিল-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে। ভানু সিংহ সেদিন আবার একটুকু সল্‌তা জ্বালাইয়া সেই কক্ষটি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী বাঙ্গালার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গালার আদর্শ পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার রচনায় মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনীসুরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে; যথা: * —"সে নৈবেদ্য যদি খাইবার পাঙ। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ ॥" *—(চৈ. ভা., আদি)।

হিন্দীপ্রভাবে ইতিহাসের ভাষার দুর্গতি।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গালা তখন বৃন্দাবনী-ভাষা-মিশ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতে তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকায় কবিরাজ-গোস্বামীর বাঙ্গালা বৃন্দাবনী দ্বারা এরূপ অধিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যও সহজ বাঙ্গালা-রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে 'গুহ্যাতিগুহ্য', 'বাহ্যাবতরণ', 'মহদনুভব' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অন্যদিকে 'যবহুঁ', 'কবহুঁ', 'যৈছে', 'তৈছে', 'তিঁহ', প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাঁহার বাক্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ঘন-সন্নিবিষ্ট ব্যূহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, এমন কি উর্দ্দু কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষায় এই সাধারণতন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা সুকঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতকে 'বাঙ্গালা গ্রন্থ' উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী—'যৈছে', 'তৈছে', ও উর্দ্দু—'নানা', 'মামু', 'চাচা', পথ হইতে পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়। নিম্নে কবিরাজগোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) "বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহু বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার॥ গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥ ধাত্র্যশ্বত্থ গোবিন্দ বৈষ্ণব পূজন। সেবানামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন॥"

—চৈ. চ., মধ্য, ২২ প.।

(২) "কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ। অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥ কঁরোয়া মাত্র সম্বল কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥"—মধ্য, ১৯ প.।

(৩) "ইবে তুমি শান্ত হৈলে আমি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম॥ গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"—আদি, ১৭ প.।

বৃন্দাবনীভাষার প্রভাবকালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তদনুচর বৈষ্ণব লেখকগণের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই,—কিন্তু হিন্দীর অধিকার অন্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহা এই—

বঙ্গ ভাষার বিবিধ রূপ।

(১) উর্দ্দু,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উর্দ্দু শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দ্দু নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্য-পীরোপাখ্যান এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কোন কোন কাব্যে উর্দ্দু প্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজের মুলুকে দু'একজন কবি— * "বুট পরি, হুট করি, যাবে ভাই যাও। হোটেলে কাটলেট সুখে খাবে যদি খাও। এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ ফিরাবে ফিরাও॥" (দীনেশচন্দ্র বসু-রচিত 'কবিকাহিনী') * প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে সেই সব ক্ষীণ ম্লেচ্ছস্বর ডুবিয়া গিয়াছে।

(২) খাঁটি বাঙ্গালা—ইহা কথিত-ভাষা, * "মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা" কিংবা "ইন্দুকুন্দতুষারসঙ্কাশা" * প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত-ভাষা নহে। ইহাদিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা পোষাকী বাঙ্গালা। কথিত বাঙ্গালার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতির আলোকচিত্র তুলিবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে শুষ্ক গুল্ম ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালী কবি এই জন্য কথিত অপভাষা খুঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিতলবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

(৩) সংস্কৃত। বৃন্দাবনদাসের রচনার মধ্যেও "স্বানুভাবানন্দে"র ন্যায় এই দুই একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কবি মনের উক্তি সম্বলিত গান রচনা করিতেন। ভাষাগ্রন্থগুলি সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত; সংস্কৃতে ও পার্শীতে অন্যবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বেষী পাষণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে যাইয়া শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের বিপরীতমুখী উদ্যম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চ্চাহেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিনব নাট্যশালার ন্যায়, পাতঞ্জল-দর্শনের উচ্চতত্ত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দ-লালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকার্য্য হন নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতের * "স্বধর্ম্ম ফলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল।"—অন্ত্য, ২য় প।— "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥"—অন্ত্য, ৯ প। ও 'দেহকান্ত্য হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।"—আদি ৩ প। * প্রভৃতি স্থল দুর্ব্বোধ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে; এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাসময়ে লিখিব।

উর্দ্দু, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাব দৃষ্ট হয়; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে।

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা।

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। নানা পুস্তকেই এই সব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনা-সুবিধার্থ পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থ-বিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম।

চৈতন্যভাগবতে,— * দৃঢ়—প্রমাণ ("ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়"—আদি)। ঠাকুরাল—প্রভাব; ছিঁড়ে—ছিঁড়ে; সমুচ্চয়—সংখ্যা; বহি—ব্যতীত; বিরক্ত—উদাসীন; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও "ত্যক্ত" অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই—ইহার অর্থ সংসার-অনুরাগশূন্য ছিল, এখন ইহা অর্থভ্রষ্ট হইয়াছে। উপস্থান—উপস্থিতি; পরিহার—প্রার্থনা; উপস্কার—মার্জ্জন, পরিষ্কার; সম্ভার—আয়োজন; আর্য্য—রাগান্বিত ("বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য")॥ কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ "পূজ্য" দেখা যায়,—যথা—বৈষ্ণবের গুরু তিন জগতের আর্য্য"। (চৈ. ম)। উপসন্ন—উপস্থিত; পরতেক—প্রত্যক্ষ; বাহ্য—বাহ্যজ্ঞান; জুয়ায়—যোগ্য হয়; নিছনি—অর্থ, যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে "নির্ম্মঞ্ছন" শব্দও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা "যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমঞ্ছন গোবিন্দদাস।" (প. ক. ত., ১০৭১ পদ)। "বিশ্বম্ভর নির্ম্মঞ্ছন করে আয়োগণ"—(লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্টা—এই শব্দ অনেক স্থলেই "ভক্তির আবেগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কদর্থেন—ঠাট্টা করেন; দৃঢ়—সুস্থ (লতা পাতা নিয়া রোগী দৃঢ় কর।" চৈ. ভা., আদি); কোনভিতে—কোনদিকে; রায়—রবে; এনে—এখন; সাধ্বস্—সার্থক; ভাবক—ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত (Emotional),—"বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥"—(চৈ. চ.)। কাকু—কাকুতী; ব্যবসায়—ব্যবহার—"এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়"—আদি। 'প্রাকৃত' এই শব্দ সংস্কৃতের ন্যায় অনেক স্থলেই 'ইতর' ও 'সাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, "প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।"

আদি ; অন্যত্র চৈতন্যমঙ্গলে—"প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বম্ভর।" চৈতন্য-ভাগবতে—"প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"—মধ্য। প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা—রামায়ণে 'কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্। রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥"—লঙ্কা, ১১৮ অ.। বিমরিষ—বিমর্ষ ; উদার—চিন্তাযুক্ত। 'প্রচণ্ড' শব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে "প্রচণ্ড অনুগ্রহ" প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি—সমৃদ্ধি ("নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে॥—আদি) ; লজ্ঘন—দংশন ; চালেন—ঠকাইয়া দেন ; কতি—কোথা। ওঝা শব্দ গৌরব-জনক অর্থেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়—ইহা উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্ব্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আত্মসাৎ—এই শব্দ এখন অর্থদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্ব্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত ; যথা—"ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।" আখরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার এবং যাঁহারা কীর্ত্তনগানের মধ্যে পদের গূঢ় ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য উপপদ সংযোগ করেন। * চৈতন্যচরিতামৃতে,—* হাতসানি—হস্তসঙ্কেত ; লঘু—ক্ষুদ্র (যথা "লঘু পদচিহ্ন") ; পাতনা—তুষ ; ওলাহন—ভৎর্সনা ; ভদ্রকর—ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর। ("ভদ্রকর ছাড় এই মলিন বসন।") ; তরজা—কূটসমস্যা। * নরোত্তম-বিলাসে,— * উমড়য়ে—কষ্ট পায় ; সঙ্গোপন—মৃত্যু ; হাতসানে—হস্তসঙ্কেতে, সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া, সমীহিত—ইচ্ছা। * পদকল্পতরুতে,— * রাতা—রক্তবর্ণ ; "রাতা উৎপল, অধরযুগল"—২২ পদ ; "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা" —২৮৯ পদ "মেঘগণ দেখে রাতা"—১৮০৪ পদ ; কবিকঙ্কণেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, (যথা "কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কইলি রাতা") ; বাউল—উন্মত্ত, বৈরাগী ; পিছলিতে—ফিরাইতে ("পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি"—চণ্ডীদাস)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন "জলাঞ্জলি" যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে—ভ্রমণ করে, "সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর॥ ৯১৪ পদ * চৈতন্যমঙ্গলে,— * প্রেমা—প্রেম ; সিনেহ—স্নেহ ; মহু—মধু ; উচাট—উদ্বিগ্ন ; তোকানি মোকানি—জনরব। পীরিতি শব্দ পূর্ব্বে 'প্রীতি' অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা—"পিতৃশূন্য পুত্রে মোর পীরিতি করিবে।" উমতি—উন্মত্ত ; সানাসানি—ইঙ্গিত ; নিবড়িল—সমাপ্ত করিল ; বহুয়ারী—বউ ("মার ঘরে

ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হতে তোর দাসী কোণের বহুয়ারী॥"); সায় —সাঙ্গ; বেদিনী—ব্যথিত (Sympathiser); আর্ত্তি—কাতরতা; আউটিয়া আলোড়ন করিয়। * ভক্তিরত্নাকরে,— * তাড়ঙ্ক—করভূষণ; দাদুর—ভেক; টোটা—বাগান; সম্বাহন—সেবা; না ভায়—ভাল লাগে না; ওট—ওষ্ঠ ("বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওটখানি হাস"; এই "ওট" শব্দের অর্থ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অট্ট অট্ট হাস"—ভক্তিরত্নাকর, ৮৩৭ পৃ. দেখুন)। ময়ঙ্ক—মৃগাঙ্ক।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানাছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্যজাল বিস্তার করিতে দেখা যায়; স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন;— * "ধনি রাঙ্গিনী রাই। বিলসহি হরি সঞে রস অবগাহই॥ হরি সুন্দর মুখে। তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥ ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু করি কোর॥ তুহুঁ তুহুঁ গুন গায়। একই মুরলীরন্ধ্রে দুজনে বাজায়॥ কেহ কেহ কহে মৃদুভাষ নারীপরশে অবশ পীতবাস। কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাস রসে আজ ভুলল কানু॥"—(প. ক., ১৩১ পদ)। * ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দ্বিচরণার্দ্ধে মিল রাখা সর্ব্বদা প্রয়োজন ছিল না; যথা;— * আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম॥ আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সে দিকে ধায়॥"— জ্ঞানদাস)। * পদগুলি সর্ব্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অক্ষর নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথা;— * "জয় জয় দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥" (প. ক., ১৫)। * ছন্দসম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

ছন্দঃ।

বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ না থাকায় বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল। পূর্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই অধ্যায়েও * "কাশীরে গমন", "বৈকুণ্ঠকে গমন," "মাতাতে পাঠান", (মাতাকে পাঠান), "মোহর" (আমার), "তাতে (তাহাতে), "ইথি" (ইহাতে), * প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা

বিভক্তি।

যায়। * "চণ্ডালাদিক", "পাককর্ত্তাদি", * প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে "দিগ" ও "দিগের" প্রাগ্‌লক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের পদরজঃসেবী, জাতিভেদের দৃঢ়দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যকর্ম্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনভাবের তীব্র জালাতে সেই শৃঙ্খল অপসৃত হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল—নব সৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন সৃষ্টি নিমজ্জিত হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দ্দান্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে স্খলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে;

সামাজিক অবস্থা,—শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ॥ কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার॥ কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত। নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥" চৈ. ভা., আদি।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী মন্দিরে যাইয়া স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে;— * "এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীয়গণ। চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন॥ প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার। অন্তরাত্র এ গুলিরে করিবে সংহার॥"—(ভক্তিরত্নাকর)। * বৈষ্ণবগণও ইহাদিগের ঋণ সুদ সহিত পরিশোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই,— * লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। অনল জালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে।" * অন্যত্র, * "এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥—চৈ. ভা.। * বৈষ্ণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ গোঁড়া, তাঁহারা দোয়াতের কালিকে 'সেহাই', হাঁড়ীর কালীকে 'ভূষা', ও জবা ফুলকে 'ওড়ফুল' বলিতেন। কালীপূজার মধ্যে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকা ইহারা নিতান্ত পাপ কার্য্য মনে করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ বিদ্রূপ করিয়া রাত্রিকালে,— * "কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।

শক্তি ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জ্বল শ্রী প্রদান করিয়াছে! একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে;—গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাম্বীরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিঃস্পন্দ; সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন—দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব্ব অবয়ব দর্শনে ভক্তিভরে বীরহাম্বীর প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল; তাঁহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসহ দুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেনঃ "ভাগবত পাঠ সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" সেই দুঃখের সময়েও ভক্তি-পূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবত পাঠ শুনিতে লাগিলেন। যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির স্রোতঃ বহিতেছিল, কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ঋজু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না। কি সুন্দর ভাগবত-ভক্তি! কি সুন্দর সভা-সৌষ্ঠবকারী উজ্জল বিনয়! শ্রীনিবাসআচার্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীরহাম্বীর, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্গপুর হইয়া উঠিল।

শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের এই উচ্চ ভাব পরে লক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই কীর্ত্তি স্বীয় উন্নত গৌরব-চ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল। পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তি-খানিতেও যেন সাংসারিকতার আবিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি বীরহাম্বীরের দানে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে। তিনি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

শেষ-জীবন।

* "গোষ্ঠীসহ" রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥
সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য কহে বারবার॥—(ভ. র.)। *

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার এই সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকথন—

"বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥ আচার্য্যের সেবক রাজা বীরহাম্বীর। ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর॥ সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূমি বৃত্তি আদিরাজা যা দিয়াছে॥ এই ত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তাঁর যতেক কহিলা॥ মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর। "স্খলৎপাদ" কহে বারেবারে॥"

ইহার কিছু পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইঁহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবারেই ছিল না। বৃন্দাবনের আদর্শ বঙ্গের পল্লীতে কতকটা ম্লান হইলেও ইঁহাদের জীবনে ভক্তিপ্রেমের অসামান্য লীলাখেলা পরিদৃষ্ট হইত। নতুবা ইঁহাদের চেষ্টায় বড় বড় দস্যু তস্কর উদ্ধার পাইল কিরূপে? রাজপুত্র নরোত্তম ত চির ফকির রহিয়া গেলেন।

যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদিগের দেহেও যেন সাংসারিক সুখের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহ্নবাদেবী ভোজনান্তে "উষ্ণ-জলে" স্নান করিতেন, এক ব্রাহ্মণী পরিচারিকা "অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে" তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মুছাইয়া দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম বিলাস)। জাহ্নবাদেবী প্রেম ও ভক্তিরাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন, তাঁহার এই সংসারিক জীবনের সুখস্পৃহার আমরা বিশেষ নিন্দা করিতে পারি না। তিনি পতিত-পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর রমণী, তাঁহাকে সেবা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবার জন্য বহু শিষ্যের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক—এবং তিনি হয়ত তাহা এড়াইতে পারিতেন না। বৈষ্ণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন; গদাধর রাধিকা রূপ, সনাতন রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গ মঞ্জরী এবং কবিকর্ণপূর গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারিগুপ্ত হনুমান্ ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, * "পুরন্দর পণ্ডিত বন্দ্যো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥" (বৈষ্ণব বন্দনা)। *

সাংসারিক সুখ-তৃষ্ণা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নানারূপ বিকৃতি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে হ্রাস হওয়ায় এবং জীবনের আদর্শ ক্রমে খর্ব্ব হওয়ায় ভক্তগণ এইরূপে পৌরাণিক ভূত হইয়া পড়িলেন ও ধর্ম্মটিকে সাংসারিক নানারূপ সুখে চরিতার্থ করিবার উপযোগী করিয়া অধ্যাপকবৃন্দ 'সহজিয়া' প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। চৈতন্যপ্রভুর এত নির্ম্মল ও উন্মাদকর প্রেমধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যভিচার চলিতেছিল। নরোত্তম-বিলাসের এই লোমহর্ষণ অংশটি দেখুন— * "করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খড়্গ করে করয় নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥ সে সময় যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥ সবে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিৎ॥" (সপ্তম বিলাস)। * পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃতান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত[১], কিন্তু এইরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জন্য জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল।

অপর এক চিত্র।

এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের যে একটা ফর্দ্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া (আড়াই পয়সার কিছু বেশী) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,

বাজারের ব্যয়।

দুইখানি ধড়া (বোধ হয় নেংটি, ধড়া, ধটা হইতে ধুতি শব্দ আসিয়াছে)—	৫
পান	১
খয়ের	১
চূণ	॥ কড়া
মেটে সিন্দূর	১
খুঞ্যা (একরূপ বস্ত্র)	৪॥
মোট	১৩

১. ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥"—চৈ. ভা., মধ্য, ১৩ অ.।

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়েরও আর একখানি ফর্দ্দ দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে,—তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরীতকী মাত্র উপঢৌকন পাইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিবাহকে বৃন্দাবনদাস একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা এরূপ,— * "বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই। বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥ এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন॥" * বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ "আলিপনা" দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কয়েকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আহার করার কথা ছিল না ;—এ নিমন্ত্রণ "গুয়াপান" গ্রহণের। গুয়াপান ও মাল্যচন্দন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু * "ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাছে॥ আর বার আসি মহা লোকের গহলে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া যায় ছলে॥ সবাই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার। চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥* এই গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন যে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছেন তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,— * "সেই যদি প্রাকৃতলোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিয়া নির্ব্বাহ হয়॥" উপসংহারে "সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সবে বলে ধন্য ধন্য অধিবাস॥ লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে। হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মাল্য দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥—(চৈ. ভা., আদি)। * ভরসা করি, এখনকার কৃপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বিবাহের এই ব্যয়ের স্বল্পতা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, সকল শ্রেণীর লোকেরাই বিবাহে এইরূপ ব্যয় করিত। বেণেদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। মনসাদেবীর ভাসানসমূহে লক্ষীন্দরের বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় সোনা রূপার অসংখ্য খট্টা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির

হইত। বিদ্যুৎ বাজিকরদের বিস্ময়কর নিপুণতা, বরযাত্রীদের সাজসজ্জা ও মণি-মাণিক্যের ঘটা তৎকালের বণিক্‌সমাজের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিলাস ও সমারোহ হইতে দূরে থাকিয়া স্বীয় ধর্ম্মজীবনের আদর্শ রক্ষা করিতেন।

অসঙ্গত উপাধি।

সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত। এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা না থাকে এমন নহে, কিন্তু সে কালে লেখকগণ প্রকাশ্যভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, "খোলাবেচা শ্রীধর", "কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ", প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা "খঞ্জভগবান", "কালাকৃষ্ণদাস", "ভুঁড়ে শ্যামদাস", "নির্লোম গঙ্গাদাস" প্রভৃতি প্রশংসাপত্রযুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি মুখস্থ করিয়া থাকে—"কাণাকে কাণা বলিও না।" তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন না।

শাসন প্রণালী।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল—কাজির নীচে 'শিকদার' ও শিকদারের অধীন 'দেওয়ান' ছিল; কোটালের দায়িত্বই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারোগার কার্য্য ছাড়া রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিসদারোগার কাজ "নিশাপতি" দিগের দ্বারা করাইতেন; এই 'নিশাপতি' ও 'কোটাল' একই রূপ কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক যাতায়াত করিতে পারিত না; নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুঁতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। রাজাদিগের আদেশ-সম্বলিত "ডুরি" লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই "ডুরি" একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজগণ দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাম্বীর এইরূপ একজন দস্যুদলপতি ছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহুসংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ। হরিশ্চন্দ্র রায়, চাঁদরায়, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা একজন "মণ্ডল" গ্রামের একরূপ শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে দুরূহ শব্দার্থবোধক একটি তালিকা দিতেছি—

দুরূহ শব্দের তালিকা।

অতএব—অতএব, অথরু—অস্থির,—অবক—এইক্ষণ, অনুসঙ্গ—ইঙ্গিত, অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে, অরু—রক্তবর্ণ, আন—অন্য, আঁতর—অন্তর, উয়ল—উদিত হইল, উকি—অগ্নি, উঘার—ব্যক্ত, উমড়ি—উথলিয়া, ওখদ—ঔষধ, খেলা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলস, গারি—গালি, গীম—গ্রীবা, গেয়ান—জ্ঞান, গোরী—গৌরী, সুন্দরী, গোঙার—লম্পট, চোর ; ("হামি অবুঝ নারী তুহুঁ, গোঙার" বিদ্যাপতি) "অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া ॥"—(প· ক·)। চকেবা–চক্রবাক, চঞ্চুরী—চকট, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাশ্য, ছাতিয়া—বক্ষ। জনু—যেন, জয়তুর—জয়ঢাক, জীউ—জীবন, জীক—যাহার, তোড়ল—ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তোর—তোমাকে, দুগুলি—দুইযোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, দউ—দুই, ধড়ে—দেহে, দোতিক—দূতীর, ধম্মিল্ল,—খোঁপা, নিঙারিতে—নিষ্পীড়ন করিতে, নিয়ড়—নিকট, নুকি—লুক্কায়িত থাকা, পদুমিনী—পদ্মিনী, পতিয়ায়—প্রত্যয় করে, পুরুথ—পুরুষ পসারল—বিস্তৃত করিল, ফুয়ল–উন্মুক্ত, ফুলায়ল—প্রস্ফুট করিল, বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করে, বাউর—বাউল, বালি—বালিকা, বিছুরি–বিস্মৃত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—দুগ্ধ জাল দেওয়ার পাত্র, ভাঙ—ভ্রূ, ভাব ভাবি—ভাগ্য, ভাখী—ভাষা, ভিয়াইল—পাক করিল, ভোখিল—ক্ষুধার্ত্ত, মরু—আমার, শিঙ্গার–বেশ-ভূষা, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, সামাইল—প্রবেশ করিল, সঞে—সঙ্গে, সিহালা—শৈবাল, সিনান—স্নান।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে কি না ; হিন্দী শব্দসমূহের মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা, হর্ষ—হরিষ, মগ্ন—মগন, নির্ম্মাণ—নিরমাণ, গর্জ্জন–গরজন, নির্ম্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দ্দয়—নিরদয়, রত্ন—রতন, যত্ন—যতন, প্রকাশ—পরকাশ, দর্শন—দরশন, বর্ষা—বরিষা ইত্যাদি। এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবযুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্ত্তনের অনুকূল নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যাঁহা, তাঁহা কবহুঁ,

ভাষায় হিন্দী প্রভাবের স্থায়ী চিহ্ন।

যবহুঁ, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয় ; ঐ সমুদয় শব্দ যে সকল সংস্কৃতশব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই, যদ্দারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে। চন্দ্রাবিন্দু, 'ঞ' এবং 'ঙ' হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণবযুগের রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।[১] এখনও বঙ্গভাষায় আঁখি, কুঁড়ে, কুঁজ, কাঁক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি, কুটীর, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবগণ "শ্রী" শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে (ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ', 'শ্রীদর্শন', 'শ্রীহস্ত', 'শ্রীললাট', 'শ্রীপ্রসাদ' প্রভৃতির অধিক নাই ; সেই সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলির মধ্যে প্রায়ই পতাকীধারী সেনাপতির ন্যায় "শ্রী" গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা "মহোৎসব", "দশা", "লুট" (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। "বাঁকা" শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন "উৎকৃষ্ট" অর্থে ব্যবহৃত হয় ; শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়া থাকিবে।

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসার-ত্যাগী হইতেন ; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত। বহুসংখ্যক পিতামাতার স্নেহের হৃদয় ভগ্ন করিয়া, প্রফুল্লতার দীপটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘকেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা

শিরোমুণ্ডন।

১. "The same was the case in Bengali, four hundred years ago and the Chaitanya Charitamrita affords innumerable instances of its use in words like যাইঞা, খাইঞা for the modern যাইয়া, খাইয়া, &c."

—Indo-Aryans. Vol. II,, P. 320

তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য, পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধবের আশাচ্ছেদ বুঝাইত, এই জন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডন উপলক্ষ্যে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ন্যাস-গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল, এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বালকগণ পিতামাতার বর্ত্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না, কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন, বস্তুতঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদের কপালের সিন্দূর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়, তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল। আমরা বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ অধ্যায়ান্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানেও গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসোপলক্ষে তাঁহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকাকুল রাণীবর্গের মুখে "কার বোলে মহারাজা মুড়াইল কেশ" প্রভৃতি কাতরোক্তি শুনিয়াছি।

বৌদ্ধযুগের নিদর্শন।

বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায়। হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষ্যে "মায়ামোহিত" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গোফা' শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটি শব্দ "পাষণ্ডী"; ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন; হিন্দুর "ম্লেচ্ছ", মুসলমানের "কাফের", খ্রীষ্টানের "infidel" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণও "পাষণ্ডী" শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন; যথা—অশোকের আদেশ-লিপিতে,— * "দেবানম্ পিয়ো পিয়দসি রাজা সর্ব্বত ইছতি সবে পাসংডা বসেয়ু সবে তে সচ ভাবশুধিং চ ইতি।" (দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী—অশোকের নামান্তর) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে, পাষণ্ড (বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তিগণও) যেন সর্ব্বত্র নিরাপদে বাস করেন। * বৈষ্ণবগণ এই শব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া বিধর্ম্মীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন।

সুবুদ্ধিরায়।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা "সুবুদ্ধিরায়" সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। "সুবুদ্ধিরায়" "গৌড়ের অধিকারী" বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক রাজ্যে এই অজ্ঞাত "গৌড়াধিপ" মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ইঁহার কোনও খোঁজ পান নাই; আমার নিকট দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত

আছে তাহাতে— * "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় গৌড় অধিকারী" * স্থলে— * "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী" * এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু যখন বীরহাম্বীরের সভাসদ্ ব্যাসাচার্য্যের হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত, এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতও রক্ষিত বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তখন এবিষয়টির সহজে মীমাংসা হইতে পারে।

আমরা এখন "সংস্কারযুগের" সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। বৈষ্ণবযুগের অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও আদরের জিনিষ। যে দেবরূপী মানুষ বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাসে উজ্জ্বল করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্রু দ্বারা দেবার্চ্চনা শিখাইয়াছেন—যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্য-প্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধাসহকারে এইখানে সমাপন করিতেছি।

সাহিত্যে নবযুগ।

কিন্তু গীতিকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিনশত বৎসর পূর্ব্বের। এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর—দেখিলে প্রাচীন পর্ণকুটীরকেও সুন্দর বলিতে হইবে এবং কুটীরবাসিগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। সংস্কার-যুগের সাহিত্যে আমরা কাব্যের নির্ম্মল মুকুরে বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে গ্রাম্য দেবতারা আসর জম্‌কাইয়া বসিলেন! বৌদ্ধ-জনসাধারণ নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত নামের দেবতা পূজা করিতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বহু কাব্যে এই সকল দেবতার উল্লেখ আছে—বুড়ী, বুড়ী মা—কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি দেবতা এই শ্রেণীর। ইঁহাদের পূজা জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে আর্য্য দেবতার এক পংক্তিতে স্থান দিলেন এবং ইঁহাদের পূজার ভার নিজেরা গ্রহণ করিলেন। ডোম, কাপালিক, হাড়ি প্রভৃতি জাতীয় পুরোহিতের হাত হইতে পূজার মন্দিরের ভার ব্রাহ্মণেরা কাড়িয়া লইলেন, এখনও শীতলা পূজার পুরোহিত ডোম পণ্ডিতেরা। বাঙ্গালা দেশে কোন কোন কালী বাড়ীর পুরোহিত হাড়িরা। এমন কি চণ্ডী পূজার কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনও হাড়িদের সাহায্য স্বীকৃত হয়। এই অদ্ভুতনামা দেবগণকে হিন্দু দেব-সমাজে

পাংক্তেয় করিবার জন্য তাঁহাদের নাম সংস্কৃতভাবাপন্ন করা হইল এবং তাঁহাদের সঙ্গে হিন্দু দেব-দেবতার নানারূপ সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইল। এই দেবতাদের পূজার মণ্ডপে যে সকল আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইত, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাহাদের মধ্যে "মঙ্গল গান" লোকমনোরঞ্জনের জন্য বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই "মঙ্গল গান" কবিকঙ্কণের চণ্ডী, মাণিক রামের ধর্ম্ম-মঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত ইতিহাস হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকগুলি সংস্করণের দ্বারা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে। ছাত্র সমাজ, গবেষক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং সাধারণ পাঠক—সকলেই এর মূল্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন। ইতিহাস, সমাজ, ধর্মসম্প্রদায় ও বাঙালির চেতনালোকের গূঢ় সংবাদবাহী এই গ্রন্থ শুধু শুষ্ক পুঁথিপত্রের বিবরণীতে পর্যবসিত না হয়ে সুখপাঠ্য রচনাকর্মরূপে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। দীনেশচন্দ্রের আলোচনায় যুক্তি ও তথ্য যথেষ্ট আছে, জ্ঞানের কথাও সুপ্রচুর। কিন্তু সমস্ত আলোচনা আনন্দসঞ্চারী রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে, এখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের ছায়াধূসর অতীত ইতিবৃত্ত দীনেশচন্দ্রের রচনার গুণে যেন কায়া ধারণ করে পাঠকের মানসনয়নে আবির্ভূত হয়। সাহিত্যের ইতিহাস যে জাতির অন্তর্জীবনের মানচিত্র, তা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' থেকে বোঝা যায়।





বত্রিশ টাকা